সীরাতে-ওয়সী

(কোতবুল-ইরশাদ রাসুলেনোমা পীর সূফী
সাইয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়সী রহমাতুল্লাহর জীবন চরিত)



মুহাঃ মুবারক আলী রহমানী

‘সীরাতে-ওয়সী’

কুতুবুল ইরশাদ, রাসুলনোমা পীর, সুফী-সাইয়্যেদ
ফতেহ আলী ওয়সী রহমাতুল্লাহর
নির্ভরযোগ্য বিস্তারিত জীবন চরিত

আরও আলোকপাত করা হয়েছে ঃ—
হযরত শাহ-সূফী নূরমুহাম্মদ নিজামপুরী রহমাতুল্লাহর পীর কে ছিলেন?
হযরত সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলভী মুজাদ্দিদ ও পীর মুর্শিদের প্রমাণ
হযরত ওয়সী পীর প্রসঙ্গে পুস্তক পর্য্যালোচনা
হযরত ওয়সী পীরের জন্মস্থান প্রসঙ্গে প্রতিবেদন।

বহুগ্রন্থ প্রণেতা-
খাদেমুল মিল্লাত
মুহাম্মদ মুবারক আলী রহমানী
কোড়াপাড়া, থানা-বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগণা, পঃ বঃ
পিন কোড- ৭৪৩৪২৮, মোবাইল ঃ ৯৭৩৩৯৮৮৭০৭

'Sirate Waisi'

A Life Sketch Kutubul Irsad Sufi Fateh Ali Waisi (Rh.
Writen by Md Mubarak Ali Rahamani and Puplished by Rahamani Prakashani. Korapara, P.O. Sikra Kuling Gram. Pin-743428, North 24 Parganas, West Bengal, India.

প্রথম প্রকাশ ঃ-

২৮শে মার্চ-২০০৭ সাল।

দ্বিতীয় সংস্করণ -

১০ই অক্টোবর-২০১৭ খ্রীষ্টাব্দ

১৯ শে মোহার্রম-১৪৩৯ হিজরী

২৩ শে আশ্বিন-১৪২৪ সন।

প্রচ্ছদ ঃ- হযরত ওয়সী পীরের মাজার শরীফ ।

-ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ-

রহমানী প্রকাশনী
কোড়াপাড়া, পোঃ শিকড়া কুলীনগ্রাম,
উত্তর ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৪২৮,
পঃ বঃ, ভারত ।

মাজেদীয়া লাইব্রেরী
বসিরহাট মাওলানাবাগ,
উত্তর ২৪ পরগণা, পঃ বঃ

ফুরফুরা শরীফ ও সম্ভ্রান্ত
পুস্তকের দোকান।

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক—

১। ফুরফুরা শরীফের ইতিবৃত্ত
২। শান্তি প্রচারক দরগাহপুরী
৩। হায়াতে একরাম
৪। সেজলা হুজুরের জীবনী
৫। মকবুল আমালে জেন্দেগী
৭। চাঁদের ফজিলত ও এবাদত
৮। সীরাতে রুহল আমীন প্রভৃতি ।

বিনিময় ঃ ১৬০ টাকা মাত্র।
US @ -4

উৎসর্গ ঃ

যার তালীম তরবিয়তে যাত্রাপথের অগ্রগতি, পেয়েছি স্বীকৃতি, হয়েছি প্রতিষ্ঠিত, তিনিই আমার অন্যতম পীর ও মুর্শিদ শাইখুল মাশায়েখ, জোবদাতুল আরেফীন মুফতীয়ে বাংলা আসাম, হযরত আল্লামা, শাহ সূফী পীর আবু যাফর সিদ্দিকী আলকোরায়সী ফুরফুরাবী রহমাতুল্লাহির পাক রূহের কল্যাণ কামনায়

নগন্য গোলাম-

মুহাম্মদ মুবারক আলী রহমানী

সাং- কোড়াপাড়া, পোঃ- শিকড়াকুলীন গ্রাম, থানা- বসিরহাট,

জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত,

১০/১/২০১৭

বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের এডভোকেট, পীরযাদা সূফী মৌলভী সাইয়্যেদ আবদুস সালাম সাহেবের অভিমত—

ফুরফুরা শরীফের সিলসিলার প্রতিষ্ঠিত খলিফা, পশ্চিমবঙ্গের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক, বহু পুস্তকের স্বনামধন্য লেখক, খ্যাতনামা বোযর্গ, হযরত মাওলানা, হাফেয, আলহাজ্জ, সুফী মুহাম্মদ মুবারক আলী রহমানী বসিরহাটী সাহেব প্রণীত 'সীরাতে-ওয়সী' পুস্তকের পাণ্ডুলিপি (টীকা-টিপ্পনী সহ) আমি দেখেছি। ভারত উপমহাদেশের মাথারমণি তিন বোযর্গ, কুতবুল- আকতাব সুফী নুর মুহাম্মদ নযামপুরী, কোতবুল ইরশাদি, সূফী ফতেহ আলী ওয়সী ও মোজাদ্দেদে যামান আবু বকর সিদ্দিকী রহমাতুল্লাহি আলাইহিমার স্মৃতি বিজড়িত 'নূরীয়া-ফতেহীয়া সিদ্দিকীয়া ফাউণ্ডেশন' এর অন্যতম কর্ণধার। মানিকতলায় হযরত ওয়সী দরবারের যোগ্য প্রতিনিধি রূপে আঞ্জাম দিয়ে চলেছেন। রহমানী সাহেবের বলিষ্ঠ কলমে হযরত ওয়সী রহমাতুল্লাহর আদর্শ জীবন চরিত অতি সুন্দর ও সাবলীলভাবে বিকশিত হয়েছে।

শুধু তাই নয় নিপুনভাবে তত্ত্ব ও তথ্যের বিভ্রান্তি-প্রমাণে অপনোদন করেছেন। হকের খাতিরে কিছু অপ্রিয় সত্য কথা ও টীকায় প্রকাশ করেছেন। আমার বিশ্বাস এতদিনে হযরত ওয়সী রহমাতুল্লাহর নির্ভরযোগ্য বিস্তারিত জীবনী সমাজ উপহার পেল।

আশা করি আলোড়ন সৃষ্টিকারী পুস্তক 'সীরাতে ওয়সী' সমাজ সাদরে গ্রহণ করবে।

আমি আন্তরিকভাবে 'সীরাতে ওয়সীর বহুল প্রচার, লেখকের সুস্বাস্থ্য এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সর্বাঙ্গীন ভালাই কামনা করি। আল্লাহ হাফেয।

ইতি—

সাইয়্যেদ আবদুস সালাম,
এডভোকেট।
(মালিকতলা ১০/১০/২০১৭

২। যদুনাথ বসাক লেন,
রথখালা, ঢাকা
বাংলাদেশ

।। যাহা না বললে নয় ।।

পৌনে দুশত বছরের আগে যার জন্ম, মা, মাটি, স্বজনহারা তথা সর্বহারা মানুষ সম্বন্ধে আজকের দিনে সঠিক মূল্যায়ণ করা বড় কঠিন ও দুঃসাধ্য কাজ। তবে আঁধারে হাতড়ানোর প্রয়োজন হবে না। তাঁর ইন্তেকালের প্রায় ৫২ বছর পর তদ্বীয় অন্যতম খলিফা ফুরফুরা শরীফের পীর, মোজাদ্দেদে-যামান (রহঃ).জীবনীতে ১৯৩৯ সালে স্বনাম ধন্য পীর আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) তাঁর দাদাপীর সূফী ফতেহ আলী ওয়সী (রহঃ) জীবনী সন্নিবেশিত করে পথরেখা অঙ্কন করেছেন। ১৯৫৫ সালের ফুরফুরা সিলসিলার ঘরানা মাওলানা জয়নুল আবেদীন আখতারী রহঃ পৃথক জীবনী পুস্তক বাংলা ও উর্দ্দু ভাষায় প্রকাশ করেন, ফলে আমরা ড. মতিউর রহমান (পাটনা) থকে গবেষণা ধর্ম্মী 'আয়নয়ে-ওয়সী' বৃহৎ পুস্তক পেয়েছি'। ডক্টর সাহেব 'গাছের পরিচয় ফলে' এ মননশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর খলিফাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। তাতে বহু অজানা তত্ত্ব ও সন্নিবেশিত হয়েছে। আমরাও সেই পন্থা অবলম্বনে সীরাতে ওয়সী গ্রন্থের অবতারণা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, স্বনামধন্য পীর ও বোযর্গ, হযরত ওয়সীর উপর গবেষণা করে পি, এইচ, ডি করেছেন। সাইয়্যেদ আবদুল মাতীন শাহপুরী ও অন্যান্য লেখক ও প্রবন্ধকার তত্ত্ব জনৈক বিকৃত করেনি, কারও প্রতি অশ্রদ্ধা ও কৃপণতা প্রকাশ করেনি, কেবলমাত্র জনৈক লেখক ব্যতীত। উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে ফুরফুরা শরীফ সম্বন্ধে কৃপণতা প্রকাশ, অহেতুক বাড়াবাড়ি ও তথ্য বিকৃতির সঠিক জওয়াব দিতে গিয়ে জনৈক মুরীদের আকিদা ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে সমালোচনা করতে বাধ্য করিয়েছে, এজন্য মূলতঃ দায়ী উক্ত জনৈক লেখক।

রাসুল পাক (সাঃ) বলেন—যে ব্যক্তি বিদয়াতীকে প্রশ্রয় দেয় বা সম্মান করে তিনি দ্বীন ধ্বংকারী। 'মান ওক্কারা সাহিবা বিদয়াতিন ফা ক্বদ আওয়ানা আলা হাদিমুল ইসলাম।'

হক্কের সাথে বাতিলের সংমিশ্রণ কেবল নয়, উক্ত লেখক বাতিলকে বেশী বেশী প্রাধান্য দিয়েছে— তাই বাধ্য হয়ে বাতিলের স্বরূপ কিছুটা উদ্বঘাটন করা আবশ্যক হয়ে পড়ে— কালাম পাকের ঘোষণা—'যা আল হাক্ক ওয়া যাহাকার বাতিল ইন্নাল বাতিলা কানা জাহুকা।'

ফুরফুরা শরীফের পীর আবু বকর সিদ্দিকী আলকোরাইসী রহঃ মুজাদ্দিদে-যামান, আমীরুশ-শরীয়ত ও উলিল আমর ছিলেন। সে আলোক আমরা সত্যানুসন্ধান করে 'সীরাতে ওয়সী' উপহার দিলাম।

কে বিদয়াতী শরীয়তের দলীলে প্রমাণ, তথাপি ও আমরা ঐ সব বিষয় থেকে দূরে থাকবো, হযরত সূফী ফতেহ আলী ওয়সী ও তদ্বীয় পীর মুর্শিদ থেকে উর্দ্ধতন পীর-মুর্শিদ যে সব কাজকর্ম থেকে বিরত থেকেছেন এবং বিদয়াত বলেছেন।

কবর সিজদা, পীর সিজদা, ফুল চাদর চড়ানো, মেয়ে-পুরুষ সম্মিলিত ভাবে জিকিরের নামে নাচানাচি করা, গান বাদ্য করা, বদ আকীদা পোষণ করা, সাহেবে- কবরকে মূল্যায়ণ না করে কেবল মাজার নিয়ে বাড়াবাড়ি করা, নামায পড়বে না মসজিদে সিজদা দেবে না, কবরে সিজদা দেবে। দাড়ী রাখবে না অথচ লম্বা চুল রেখে পীরযাদা ইত্যাদি বিদয়াতীদের পরিচয়।

ধ্রুব সত্য যে হযরত ওয়সী রহঃ এর নেগাহকরমে তাঁর মত ও পথের বহিঃ প্রকাশ ও বিপ্লব ঘটিয়েছেন তদ্বীয় প্রাণপ্রিয় খলীফা মুজাদ্দেদে-যামান আমীরুশ শরিয়ত পীর আবু বকর সিদ্দিকী ফুরফুরাবী রহঃ। যেমন বিপ্লব ঘটিয়েছেন হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ রহঃ এর প্রাণপ্রিয় খলিফা মুজাদ্দেদে আলফে সানী হযরত শায়খ আহমদ ফারুকী সারহিন্দ রহঃ। তাঁর নামেই মোজাদ্দেদীয়া তরীকা নামকরণ, তদ্রূপ হযরত ওয়সী রহঃ এর প্রাণপ্রিয় খলিফা ফুরফুরা শরীফের পীরের নামকরণে 'সিলসিলায় ফুরফুরা শরীফ।'

প্রায় সাড়ে তিনশত তরীকা সন্নেবেশিত হয়েছে— চারি তরীকার মধ্যে অন্য তরীকা গুলোর বিলুপ্তি ঘটেছে তদ্রূপ হযরত ওয়সী রহঃ এর তামাম খলিফাদের হক দলের প্লাটফর্মে এক হয়ে একাত্ম হয়েছে 'সিলসিলায়ে ফুরফুরার' নামে। হক দলছুট খলিফারা অনেকেই বিলুপ্তির পথে, হাতে গোনা কয়েকজন ব্যতীত। আর বাতেল বাতেলই থাকে- 'আগাছার বাড় বাড়ন্ত' আলাদা। এ মননশীলতা নিয়েই 'সীরাতে-ওয়সী' পাঠকদের কাছে পেশ করছি।

প্রেসে বই ছাপার সময় ব্যরিষ্টার সাইয়্যেদ সাহেদ আলম সাহেব থেকে প্রাপ্ত শানে ওয়াইসী বইটি পীরজাদা সূফী সাইয়্যেদ আবদুস সালাম (এডভোকেট, ঢাকা) সাহেব থেকে ২০শে ফাগুন হাতে পেলাম। লেখক তাঁর জন্ম সন ও জন্মস্থান নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করেছেন। জন্মস্থান সম্বন্ধে 'সৈয়দ মহল্লার' সাইয়্যেদ সাহেবেরা জমির দলিল ও পর্চা দেখাতে পারেননি, কিন্তু 'মল্লিক ছোবহান'এর হাজীপাড়ার চৌধুরী সাহেবেরা কি জমির দলীল ও পর্চা দেখাতে পেরেছেন? তাহলে নিঃসন্দেহ হয়ে কি করে বলা যায় এ স্থানেই হযরত ওয়সীর জন্মস্থান? আর সৈয়দ পরিবার চৌধুরী হলেন কিভাবে? সুদীর্ঘ কালের মিথ্ ভাঙতে গেলে তো আপনাকেই সঠিক প্রমাণ পত্র দিতে হবে। প্রাচীন সমস্ত জীবনী পুস্তক ও প্রবন্ধে হযরত ওয়সী হযরতরা দু ভাই এক বোন দেখতে পাই। তিনি এখন তিন ভাই এক বোন কোথা থেকে পেলেন? আশরাফ আলীর নামে যদি মিল পাওয়া যায়, তাহলে তাদের বর্তমান পুরুষে সৈয়দ বা আলী নাম সংযোগে কারও নাম পাই না কেন? আর আশরাফ আলী সাহেবের পৌত্র আলহাজ্জ আবুল কাসেম চৌধুরী সাহেবের নামে 'সাইয়্যেদ' ও 'আলী' যোগ পাই না কেন? বড় কথা সাইয়্যেদ সূফী ফতেহ আলী সাহেবের ভাতিজার নাম সাইয়্যেদ আশরাফ আলী যদি হয় তা হলে তার পিতার নাম অর্থাৎ সূফী সাহেবের একালে পাওয়া ভাইয়ের নাম কি? লেখক

আবার হযরত ওয়সী একমাত্র পুত্র 'সাইয়্যেদ মোস্তাফা আলী' সাহেবের নাম-'সাইয়্যেদ গোলাম মোস্তাফা আলী লিখেছেন, 'গোলাম যোগ বেশ' 'গোলমেলে লোক মনে হলো। হযরত সাইয়্যেদো সাঈদা খাতুন ৬/৭ বছরের নাবালক সন্তান নিয়ে হজ্জে রওনা হয়ে ছিলেন, তেমন কথার প্রমাণ কি? আবার ১৮/২০ বছরের ছেলেকে নিয়ে হজ্জে রওনা দিলে পরবর্ত্তীতে তাঁর তালীম তরবিয়েত কোথায় কোথায় হয়েছিল এবং চাকরীর বয়স মিলাতে পারবেন কি? কাজেই তাঁর পিতার ইন্তেকালের ২/৫ বছর পর সম্ভবতঃ ১২/১৪ বছর বয়সের হযরত ওয়সীকে নিয়ে রওনা দিয়েছিলেন---- কাজেই তার জন্ম সন ১৮২৫ হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং যুক্তি সঙ্গত, যা ইতিপূর্বে সুধীমণ্ডলী উল্লেখ করেছেন।

আহলে-হালের মানুষ তো এখনও ২/১ জন পাওয়া যায়। আমরা তাদের ও বিদগ্ধজনদের রায়ে আমিরাবাদ সাইয়্যেদ মহল্লায় তার জন্মস্থান এবং এ বঙ্গে তার শিক্ষা দীক্ষা ও কর্মস্থল বিবেচনায় ১৮২৫ খ্রীঃ জন্মসন সমুচিত মনে করি। আল্লাহপাক বেহ্তার জাননেওয়ালা। আমাদের কাছে বেশী আশ্চার্য্য যে লেখক ফুরফুরা শরীফের শামসুল উলামা হযরত গোলাম সালমানী আববাসী রহঃ এর ঘরানার দাবীদার হয়ে বিদয়াতী বেশারাদের সম্বন্ধে বরং মৌন সমর্থন মনে হয়।

আমরা ২০০০ হাজার সনের এ ক্রান্তিলগ্নে হযরত ওয়সীর শিক্ষাদীক্ষা, তালীম-তববিয়াতের সঙ্গে তাঁর মাজার শরীফ কেন্দ্রীর বর্তমান সমস্যার দিকে সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সীমিত সময়ের মধ্যে 'সীরাতে ওয়সী' প্রকাশে যাদের অকৃত্রিম সহযোগিতা পেয়েছি, তাদের নাম নিয়ে খাটো করতে চাই না, তাদের সর্বাঙ্গীন কুশল কামনা করি। আর হযরত ওয়সীর মতাদর্শের বিপরীত ধারার মানুষদের জন্য দরবারে এলাহিতে হেদায়তের নিবেদন জানাই। আর যদি তারা হেদায়েত না হন তাদের সম্বন্ধে কি ফয়সালা, সে আমার আল্লাহপাকের ভালই জানা।

আমি মানুষ একটু তাড়াহুড়োর জন্য ত্রুটি বিচ্চ্যুতি আমার, আর ভালাইটুকু সুধীজনদের। তবে আমার ত্রুটি যুক্তি ও প্রমাণ সহ জানালে পরম খুশী হব এবং শুধরে নেওয়ার মওকা পাবো, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ উত্তম হেফাযতকারী। নবীপাকের তোফায়েলে, ওয়সী হুযুরের অসিলায়ে আর 'আল্লাহ' নামের বরকতে নাচিজের প্রয়াস কবুল ও মঞ্জুর করুন। ইয়া রাব্বাল আলামীন। ইয়া আর হামার রাহেমীন।

সাং- কোড়াপাড়া,
পোঃ- শিকড়া কুলিনগ্রাম,
উত্তর ২৪ পরগণা, পঃ বঙ্গ।

নিবেদন-
মুহাঃ মুবারক আলী রহমানী
১০/১০/০৭

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

মহান আল্লাহপাকের শাহী দরবারে লাখো কোটি শুক্‌রীয়া ও সজুদ এবং হাজারো কোটি দরুদ ও সালাম বিশ্বনবী দয়ার নবী করুণার ছবি হযরত মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। রাসুলপ্রেমিক সূফী ও ওয়সী চরিত- 'সীরাতে ওয়সী' দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপার মওকা পেয়ে রহমানী আপ্লুত।

এ মওকায় হযরত সূফী ওয়সী হুযুরের নিখুঁত সূফী চরিত্রের দিক নির্দেশনায় বিস্তারিত তথ্য উপাত্তা পাঠকের দরবারে পেশ করতে পেরে আবার আল্লাহপাকের শাহী দরবারে শোকরীয়া।

কোন লেখক 'হরকায়লা মার্কা' সূফী চরিত্রে লেপন করতে অপচেষ্টা করেছে, কেউ ভূয়া তথ্যের অযথা আমদানী করে উপহাসের পাত্র হয়েছে। তা অপনোদন করায় সচেষ্ট হয়েছি।

শাহ সূফী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরীর পীর কে ছিলেন?

মোজাদ্দেদ হযরত সৈয়দ আহমদ বেরলভী কি যোগ্য পীর ছিলেন?

হযরত সৈয়দ আহমদ মোজাদ্দেদকি অহাবী ছিলেন?

সূফী চরিত্র পস্ফুটিত হয় ভোগে না ত্যাগে?

এ সমস্যার সমাধান করতে হবে আপনাকেই তবে 'সীরাতে ওয়সী' পুস্তকের পরিশিষ্ট ১-৪ অধ্যায় অধ্যায়ণে।

রহমানী সমস্যা সমাধানে আপ্রান চেষ্টা ও যত্নবান হয়েছে, চিরকৃতজ্ঞ সবশক্তিমান মহান আল্লাহপাকের শাহী দরবারে কবুলিয়াতের নিবেদন পেশ করে। তুমি না কবুল করলে সব বেকার হয়ে যাবে, আয় আমার মহান আল্লাহ। আল্লাহ হাফেয। আমীন।।

নিবেদক-
মুহাম্মদ মুবারক আলী রহমানী
১৯/১/১৪৩৯ হিজরী

কোড়াপাড়া
থানা- বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগণা।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

'সীরাতে-ওয়সী'

কুতুবুল ইরশাদ, রাসুলনোমা পীর, সুফী-সাইয়্যেদ
ফতেহ্ আলী ওয়সী রহঃ

-ঃঃ আবির্ভাব ঃঃ-

আল্লাহপাকের শাহী দরবারে লাখো লাখো শুকরীয়া এবং বিশ্বনবী রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল-মুজনাবীন, আঁকা মওলা, হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহুতায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি হাজারো দরুদ ও সালাম।

আল্লাহপাকের আঠারো হাজার মখলুকাতের মধ্যে সৃষ্টির সেরা মানুষ, আর মানুষের সেরা মানুষ বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর উম্মতের মধ্যে যুগে যুগে, মহান আল্লাহ্ কিছু ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ সৃষ্টি করেছেন, যারা নবীপাকের উত্তরাধিকারী অর্থাৎ 'নায়েবে-নবী'।

এসব ক্ষণজন্মা মহাপুরুষদের দেশ ও সমাজে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের একক কৃতার্থ সর্বশক্তিমান, মহিয়ান, গরিয়ান, করুণানিধান মহান আল্লাহপাকের। পিতা-মাতা, সমাজ, দেশ, জাতী সে মহাত্মণের মহত্বে ভাগ বসাতে না পারে, সে ব্যবস্থা করেছেন যুগে যুগে মহান আল্লাহ।

আবহমান কাল থেকে অদ্যাবধি পৃথিবীর যশ্বয়ী ব্যক্তিত্ব, নবী রাসুল থেকে শুরু করে ধর্ম্মীয় নেতা, দেশ-নায়ক, বিদগ্ধজনদের জীবনে সে সবের দাবীদার রাখেননি সর্বশক্তিমান আল্লাহ। তাইতো দেখা যায়, ঐ সব মহামনিষীরা কেহবা, পিতামাতা বা স্বজনহারা, কেউ বা সমাজত্যাগী, ইতিহাস তার স্বাক্ষ্য। অকুলের-কুল যে তিনিই, সর্বহারাদের সর্বাধিকারী মহান আল্লাহ।

আজ থেকে প্রায় দুশত বছর আগে ঠিক এমন একজন মহামানবকে আল্লাহপাক পাঠিয়ে ছিলেন— তিনিই, হলেন, কোতবুল-ইরশাদ, রাসুলনোমা পীর শাহ-সূফী সাইয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়সী রহমাতুল্লাহ।

'সূফী'— তাঁর লক্‌ব। মূল নাম — 'ফতেহ আলী'।

'ওয়সী' তাঁর তাখাল্লুস।

'কোতবুল-ইরশাদ', 'রাসুল-নোমা' তাঁর পদমর্যাদা।

সূফী সাইয়্যেদ ফতেহআলী ওয়সী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবীখান্দানের মানুষ ছিলেন। আমি তাঁর বর্তমান সাইয়্যেদ খান্দান থেকে তার যে **'নসবনামা'** বা বংশ লতিকা জেনেছি— তাতে দেখা যায় তিনি হযরত বড় পীর, গওসে-সামদানী, মাহবুবে-

সোবহানী, সাইয়্যেদেনা মহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ এর বংশধর।

তাঁর পূর্বপুরুষ খুব সম্ভব ইরাকের বাগদাদ শরীফ থেকে আফগানিস্থান হয়ে দিল্লীতে আগমন করেন। তথা থেকে ইসলামাবাদ (চট্টগ্রাম) এর সাতকানিয়া থানার 'আমিরাবাদ' গ্রামের সাইয়্যেদ মহল্লায় তাঁর পূর্ব পুরুষরা বাসস্থান নির্বাচন করেন এবং তথায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে তাঁর পূর্ব পুরুষদের কবর বিদ্যমান।

বর্তমানে বৃহত্তর সাতকানিয়া আমিরাবাদ লোহাগাড়া উপজেলার অন্তর্গত সাইয়্যেদ মহল্লা। অনেক লেখক তাকে 'নিযামপুরী' বলে উল্লেখ করেছেন। আসলে নিযামপুর পরগণার মধ্যে আমিরাবাদ পড়ে না। নিযামপুর মীরশ্বরাই থানার অন্তর্গত।

বংশলতা

নসব নামা

রাসুলনোমাপীর শাহ সুফী সাইয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়সী রহমাতুল্লাহ

স্ত্রী হযরত সাইয়্যেদা ফাতেমা খাতুন রহঃ এর বংশ লতা

হযরত সৈয়দ হারেস আলীর পুত্র সাইয়্যেদ ওয়ারেস আলীর পুত্র হযরত সূফী ফতেহ আলী ওয়সী রহঃ হযরত সাইয়্যেদ ওয়ারেস আলীর দুপুত্র ও এক কন্যা—

পুত্র হযরত সাইয়্যেদ সালেহ আলী (রহঃ) সাইয়্যেদা সালেহা খাতুন

দ্বিতীয় পুত্র হযরত সূফী ফতেহ আলী ওয়সী রহঃ

পুত্র

হযরত সাইয়্যেদ মোস্তাফা ওয়সী রহঃএর
দুই পুত্র ও দুই কন্যা

১। হযরত সাইয়্যেদ মাসউদার রহমান রহঃ
২। হযরত সাইয়্যেদ জানে আলম রহঃ
৩। হযরত সাইয়্যেদা তামান্না খাতুন রহঃ
৪। হযরত সাইয়্যেদা ফাতেমা খাতুন রহঃ

১। হযরত সাইয়্যেদ মাসউদার রহমান রহঃ
এর তিন পুত্র ও তিন কন্যা

হযরত সাইয়্যেদ মাহফুজ আলী রহঃ
হযরত সাইয়্যেদ মাহবুব আলী রহঃ
হযরত সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আলী রহঃ
হযরত সাইয়্যেদা সাকিনা খাতুন রহঃ
হযরত সাইয়্যেদা সারা খাতুন রহঃ
হযরত সাইয়্যেদা হুসনেয়ারা বেগম রহঃ

২। হযরত সাইয়্যেদ জানে আলম রহঃ এর
এক পুত্র ও এক কন্যা

সাইয়্যেদ শাহেদ আলম বার এট ল
সাইয়্যেদ সেতারা বেগম বিবাহিতা
জাস্টিস সাইয়্যেদ আবদুর রহমান রহঃ

কন্যা

সাইয়্যেদা জোহরা খাতুন রহঃ এর
দুই কন্যা ও এক পুত্র সন্তান

১। হযরত সাইয়্যেদ এহসান আহমদ মাসুম রহঃ
তাঁর স্ত্রী সাইয়্যেদা ফাতেমা খাতুন রহঃ
২। হযরত সাইয়্যেদা সিদ্দিকা খাতুন রহঃ
৩। হযরত সাইয়্যেদা হাজেরা খাতুন রহঃ

হযরত সাইয়্যেদ এহসান আহমদ মাসুম রহঃ

৫। সাইয়্যেদা তামান্না খাতুন রহঃ এর
এক পুত্র ও তিন কন্যা

সাইয়্যেদ আমিন

৪। সাইয়্যেদা ফাতেমা খাতুন এর
স্বামী সাইয়্যেদ এহসান আহমদ মাসুম রহঃ
এর তিন পুত্র চার কন্যা

সাইয়্যেদ আব্দুল মাতিন রহঃ
সাইয়্যেদ ফিরদৌস রহঃ
সাইয়্যেদ আবুল বাসার রহঃ

সূফী ওয়সী রহঃ— ১৮৫২ - ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ।[১]

প্রকৃতপক্ষে জন্মস্থান — 'আমিরাবাদ', সাতকানিয়া থানা, বর্তমানে লোহাগাড়া উপজেলা, চট্টগ্রাম।

বাসস্থান — পুনাশী শরীফ, জেলা মুর্শিদাবাদ।

কর্মস্থল — কোলকাতা।

ইন্তেকাল-দাফন — মানিকতলা, (২৪/১, মুনশীপাড়া লেন) কোলকাতা। হযরত — বড় পীর সাহেবের বংশধর, সাইয়্যেদ খান্দান।

হযরত সূফী ফতেহ আলী ওয়সী রহমতুল্লাহ এর জন্ম ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে[২], বাংলা ১২৩২, হিজরী ১২৪১ সাল। তাঁর পিতার নাম হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ ওয়ারেস আলী শহীদ রহমতুল্লাহ ৭ই জামাদিয়াল উলা মুতাবিক ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে মুজাহিদে আযম, শাইখুল মিল্লাত, মুজাদ্দেদ সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলভী রঃ এর নেতৃত্বে ঐতিহাসিক বালাকোটের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। ইংরেজ সৈন্যদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে উভয়ে তথায় শাহাদতের অমীয় সুধা পান করেন। তখন তিনি (হযরত ওয়সী) মাত্র কয়েক বছরের শিশু। — ফুরফুরা শরীফের ইতিবৃত্ত - ৭৫ পৃঃ

ড. মতিউর রহমান সাহেব তাঁর গবেষণা মূলক গ্রন্থ "আয়নায়ে ওয়সী" (উর্দু) পুস্তকের ১৪৬ পৃঃ লিখেছেন —

"কুতবুল-ইরশাদ হযরত সূফী ফতেহ আলী ওয়সী রহঃ এর প্রথম জীবনের ঘটনাবলী জানা যায় না। তবে তাঁর ইন্তেকালের সময় বয়স ছিল ৬১ বছর বাংলা ১২৯৩, ২০ শে অগ্রহায়ণ। ৮ই রবিউল আওয়াল ১৩০৪ হিজরী, ৬ই ডিসেম্বর ১৮৮৬। মোতাবেক জন্ম তারিখ হয় - বাংলা ১২৩২, হিজরী ১২৪১ এবং ইররাজী ১৮২৫।

---

১) প্রফেসর ড. এ. আর. এম. আলী হায়দার কৃত গবেষণা পত্র।

২) ড. আহম্মদ আলী কৃত 'হযরত ওয়সী রঃ জীবন ইতিহাস' পুস্তকের ১৬/১৭ পৃষ্ঠায় তাঁ জন্ম সন ১৮১৬ সাল লিখেছেন। তা মোটেই গবেষণা লব্ধ নয় বরং তার অনুমান মাত্র। শ বছরের ইতিহাস বিকৃতির নামান্তর। ৮/১০ টি নির্ভরযোগ্য পুস্তকের সম্মিলিত মতামতে অনুমানের ভিত্তিতে উপেক্ষা করা সমুচিত নয়।

আমীরুল মুমেনীন হযরত সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহঃ এর সাথে তাঁর মহামান্য ওয়ালেদ সাহেব ৭ই জামাদিয়াল আওয়াল ১২৪১ মোতাবেক ১৭ই জানুয়ারী রায়বেরেলী থেকে জিহাদের উদ্দেশ্যে (১৮২৬-১৮৩১) যখন রওয়ানা হন, সে সময় তাঁর সাথী ছিলেন - হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ ওয়ারেস আলী শহীদ রহঃ। তখন তদ্বীয় সন্তান সূফী ফতেহ আলী ওয়সী কয়েক মাসের শিশু সন্তান।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যাপক ইসলামিক ষ্ট্যাটিক্সের চেয়ারম্যান, সার্যিনার প্রখ্যাত পীর মাওলানা আবু যাফর মোহাম্মদ সালেহ রহঃ এর সুযোগ্য জামাতা, কাশফ শক্তি সম্পন্ন পীরও বোযর্গ হযরত ওয়সী পীর রহঃ উপর গবেষক ডক্টর এ, আর, এম, আলী হায়দার এম, এ, পি, এইচ, ডি এম, এম, গোল্ড মেডালিষ্ট। তিনি তার থিসিসে বিভিন্ন জনের ভিন্ন ভিন্ন জন্ম তারিখ উল্লেখ করে চূড়ান্ত ফয়সলায় সূফী সাইয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়সী রহঃ জন্মসাল ইংরাজী ১৮২৫ নির্দ্ধারণ করেছেন।

হযরত মাওলানা আবদুল্লাহ সাহেব, এম, এ; (ট্রিপল) এম, ফিল; পি, এইচ, ডি;
অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়;-

— "তাঁর জন্ম তারিখ সাধারণতঃ ১৮২৫ খ্রীঃ বলেই ধরা হয়। সূত্র হলো - সৈয়দ আহমদ শহীদ শিখ শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদের উদ্দেশ্যে রায়বেরেলী থেকে যাত্রা করেন ১৮২৬ সাল ১৭ই জানুয়ারী। এই যাত্রার কয়েক মাস পূর্বেই সূফী ফতেহ আলী ওয়সীর জন্ম হয়। তাঁর জন্মের নিশ্চিত তারিখ অজ্ঞাত।

বিশিষ্ট গবেষক চট্টগ্রামের ভূমিপুত্র জনাব আহমদ মমতাজ কৃত:- "চট্টগ্রামের সূফী সাধক" পুস্তকের ৯০ পৃষ্ঠায় হযরত ওয়সীর জন্ম সন - ১৮২৫ খ্রীঃ লিখেছেন।

সূফী ফতেহ আলী ওয়সী বাংলা ১২৯৩ সালের ২০শে অগ্রহায়ণ মোতাবেক ১৮৮৬ সালের ৬ই ডিসেম্বর রোজ রবিবার ৬১ বছর বয়সে কলিকাতায় ইন্তেকাল করেন এবং মানিকতলায় ২৪/১, মুনশী পাড়া লেন (লালাবাগান) সমাহীত হন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেয়ুন।"[৩]

---

৩) ওয়সী স্মরণিকা-৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৯৮৬ (বিশেষ সংখ্যা) ওয়সী মেমোরিয়াল এ্যাসোসিয়েশন। সেখ আহমদ আলী সম্পাদিত।

অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম সাহেব প্রাক্তন, পরিচালক ঢাকা বিভাগ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ।

হযরত শাহ সূফী ফতেহ আলী রহমাতুল্যাহ ১৮২৫ খ্রীঃ চট্টগ্রামের ...... আমিরাবাদ জন্মগ্রহণ করেন।[৪]

ড. মুস্তাফা আবদুল কাইয়ূম সাহেব হযরত ওয়সী পীরের জন্ম সন, ১৮২৫-১৮৮৬ খ্রীঃ মৃত লিখেছেন।

তাঁর মহামান্য ওয়ালেদ সাহেব হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ ওয়ারেস আলী শহীদ রহমাতুল্লাহ মোজাহেদ-আযম, মোজাদ্দেদে, হযরত সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলভী শহীদ রহমাতুল্লাহ অন্যতম খলিফা ছিলেন এবং ১৮২৬-১৮৩১ সাল পর্যন্ত তদ্বীয় পীরের সাথে বিভিন্ন জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন ও পীরের সাথে ১৮৩১ সালে শাহাদাত বরণ করেন।

হযরত সাইয়্যেদ ওয়ারেস আলী 'বাঙ্গালী' নামে খ্যাত। তিনি মোজাহেদে আযম হযরত সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহমাতুল্লাহ থেকে চার তারিকায় খেলাফত প্রাপ্ত বোযর্গ পীর ছিলেন। হযরত সাইয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়সী রহঃ প্রপিতামহ ছিলেন - হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ হারেস আলী রহঃ। তিনি আরবী ফার্সী সাহিত্যে বিদগ্ধমহাজন ও বোযর্গ মানুষ ছিলেন।

হযরত সূফী ফতেহ আলী ওয়সী রহঃ মাতার নাম হযরত সাইয়্যেদা সাঈদা খাতুন রহঃ বিদুষী মহিলা, আবেদা জাহেদা এবং বড় দানশীল ও 'সাওমুদ্দাহর' ছিলেন।

হযরত সাইয়্যেদ ওয়ারেস আলী রহঃ তিন সন্তান। প্রথম কন্যা সন্তান, হযরত সাইয়্যেদা সালেহা খাতুন। দ্বিতীয় সন্তান পুত্র হযরত সাইয়্যেদ সালেহ আলী রহঃ এবং তৃতীয় সন্তানও পুত্র হযরত সাইয়্যেদ সূফী ফতেহ আলী ওয়সী রহঃ। এ বংশে বহু কোরআনে হাফেযের সন্ধান পাওয়া যায়।

---

৪) সেখ আহমদ আলী সম্পাদিত - ওয়সী পীর স্মরণিকা - ১৯৯০। আল্লামা রূহল আমীন রহমাতুল্লাহ জীবন ও কার্য - ৮৩ পৃঃ।

-ঃঃ তালীম বা শিক্ষা ঃঃ-

হযরত সূফী ফতেহ আলী ওয়সী রহঃ প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃলয়ে পেয়েছিলেন। কেননা ১৮২৬ সালে যখন তাঁর আব্বা জিহাদে সাড়া দিয়ে পীরের সাথে রওনা হয়ে ছিলেন, আর তাঁর ঘরে ফেরা হয়নি। ১৮৩১ সালে বালাকোটের যুদ্ধে শহীদ হন, তখন সূফী ওয়সী রহঃ বয়স প্রায় ৬ বছর। মায়ের যত্নে লালিত পালিত হন এবং ইবতেদায়ী শিক্ষা তিনি মায়ের থেকে পেয়েছিলেন। যেহেতু তাঁর আম্মাজান বিদুষী মহিলা ছিলেন।

কেহ কেহ বলেন — ১৮২৬ সালে তিনি তদ্বীয় পীর ও মুর্শিদ সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রঃ এর ডাকে রওনা দেন এবং ঐ বছরই জুন মাসে শিখ সমরে পাঞ্জাবের মর্দান জেলার উত্তর-পশ্চিমে পাহাড়ী ভূখণ্ডে শহীদ হন।[৫] তখন বয়স মাত্র এক বছর প্রায়।

হযরত সাইয়্যেদ ওয়ারেস আলী বাঙ্গালীর শাহাদাতের পর সংসারে বেশ অসচ্ছলতা দেখা দেয়; ফলে সাইয়্যেদা সাঈদা খাতুন নাবালক পুত্রকে নিয়ে মক্কা শরীফ হিজরতের উদ্দেশ্যে রওনা হন। কোলকাতার সন্নিকটে সমুদ্র উপকূলে জাহাজ ডুবিতে ইন্তেকাল করেন।[৬] আল্লাহপাকের অশেষ মেহেরবানী হযরত সূফী ফতেহ আলী ওয়সী জীবনে বেঁচে যান।

বিশেষ প্রণিধান যোগ্য যে হযরত সূফী ফতেহ আলী ওয়সী রহঃ জীবনী সর্বপ্রথম ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করেন - ভারত উপমহাদেশের অদ্বিতীয় পীর, মুহাক্কেক আলেমে দ্বীন, ফকিহ, মুহাদ্দিস, মুবাহিস, মুসান্নিফ, হযরত আল্লামা রুহল আমীন রহঃ (বশিরহাট), তদ্বীয় পীর ও মুর্শিদ, শাইখুল মিল্লাতে অদ্দীন, ইমামুল হুদা, পাক-ভারত উপমহাদেশের খ্যাতনামা পীর ও বোযর্গ, আমিরুশ শরিয়ত ও তরিকত, মুজাদ্দেদে-যামান, হযরত মাওলানা শাহ সূফী আবু বকর সিদ্দিকী আলকোরায়সী ফুরফুরাবী রহমাতুল্লাহির জীবনী পুস্তক,—"**হযরত পীর সাহেবের বিস্তারিত জীবনী**" গ্রন্থের ২৮-৪৩ পৃষ্ঠা ব্যাপী স্বতন্ত্র অধ্যায়ে -

---

৫) সাইয়্যেদ আবদুল মতিন জাহাঙ্গীর মুর্শিদাবাদী কৃত গওসে যামান দ্রঃ

৬) প্রাগুক্ত।

"হযরত কোতবোল ইরশাদ মাওলানা হযরত শাহ সূফী ফতেহ আলী সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী" শিরনামে। যা বাংলা ১৩৪৬ সালে, ইং ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত; ৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, মাজেদিয়া প্রেস থেকে মুদ্রিত।

নিশ্চয় তিনি তাঁর পীর ও মুর্শিদ, মুজাদ্দেদে-যামন রহঃ জবানী থেকে এবং বিশ্বস্থ সূত্রে পাওয়া তদীয় দাদা পীরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখেন এবং সে সময় হযরত ওয়সী রহঃ সাহেবযাদী দূর্রে-মাকনুন, মোহতারেমা যোহরা খাতুন জীবিত, হযরত সূফী ওয়সী রহঃ ও অন্যতম খলিফা মুর্শিদাবাদের পুনাশী শরীফের খ্যাতনামা পীর ও বোযর্গ শাহ সূফী সাইয়্যেদ একরামুল হক রহঃ সহ অনেক খলিফা হায়াতে ছিলেন। কাজে কাজেই আল্লামা রুহুল আমীন রহঃ তাহকিকে লেখা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। আমরা বিশ্বস্থতা ও প্রমাণ্য হিসাবে আল্লামা রুহল আমীন বশিরহাটী রহঃ পুস্তক থেকে সবটাই (হুবহু) পাঠকের উপহার দেব।

আল্লামা রুহুল আমীন রহঃ লিখেছেন — "হযরত মাওলানা সূফী ফতেহ আলি সাহেব চট্টগ্রামের বাশেন্দা ছিলেন, তিনি একবার নিজের ওয়ালেদা মাজেদাকে সঙ্গে লইয়া হজে রওয়ানা হন; কিন্তু পথিমধ্যে তাঁহার ওয়ালেদা মাজেদার ইন্তেকাল হইয়া যায়, এই হেতু তিনি হজে যাইতে পারেন না। তিনি মাওলানা রাশেদ মরহুম সহ ফুরফুরা শরীফে পড়িতে থাকেন। তৎপরে তাঁহারা উভয়ে হুগলী জেলার 'ঢশা' গ্রামে পড়িতে থাকেন।"[৭]

আল্লাহপাক যাদেরকে এ পৃথিবীতে মহৎ থেকে মহত্বর মর্যাদাবান করে থাকেন। তাদেরই প্রায় শতকরা নিরানব্বুই জনই শৈশবে পিতৃ-মাতৃ হারা, স্বদেশ ছাড়া। আল্লাহপাকের অপার কুদরতের মহিমা সে সব ইয়াতিম অসহায়, স্বদেশহারা শিশুদের তিনি অসংখ্য নিয়ামতে ভরপুর করে দিয়ে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

হযরত সূফী ফতেহ আলী ওয়সী রহমাতুল্লাহ মায়ের কোল থেকে পিতৃহারা, প্রায় ১০/১২ বছর বয়সে মাতৃহারা হন। বাড়ীতে প্রাথমিক তালীম পাওয়ার পর

---

৭) কেউ কেউ ধসা মাদ্রাসায় 'অধ্যায়ণ' করার স্থলে 'অধ্যাপনা' করার কথা লিখেছেন যা মারাত্মক ভ্রম।

মায়ের সাথে হজ্জ গমনের পথে দুর্ঘটনায়[৮] মহিয়সী আম্মাজান সাইয়্যেদা সাঈদা খাতুনের ইন্তেকালে স্বদেশ হারা - সর্বহারা হয়ে একাকী হায়াতে বেঁচে যান। সর্বহারাদের সহায় মহান আল্লাহযাল্লাশানুহু অকুলের কূল, তিনি খালিক ও মালিক।

সৌম্যকান্তি বালক সাইয়্যেদযাদা ফতেহ আলী সাহেবের সাথে কাকতলিয় ভাবে প্রায় সমবয়স্ক ফুরফুরা শরীফের বেলপাড়া নিবাসী মাওলানা রাশেদ সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ ঘটে। সে সময় ফুরফুরা শরীফে 'দহলজী মকতবে'র ব্যবস্থা ছিল। তথায় কিছুদিন তালীম হাসিল করে তাঁরা উভয়ে হুগলী জেলার 'ধসা' গ্রামে "পানাউল্লাহ মাদ্রাসায়" পড়তে থাকেন। তৎকালীন সময়ে "ধসা পানাউল্লাহ মাদ্রাসার যথেষ্ট সুনাম ছিল। উক্ত মাদ্রাসা থেকে তিনি আরবী, ফার্সি ভাষায় যথেষ্ট বুৎপত্তিলাভ করেন।[৯]

ড. মতিউর রহমান সাহেব 'আয়নায়েওয়সী' পুস্তকের ১৪৭ পৃঃ মাওলানা জয়নুল আবেদীন আখতারী সাহেবের হায়াতে ওয়সী ও চিঠির উল্লেখ করে লেখেন - 'জেলা হাওয়া, জগৎ বল্লভপুর থানার মুনশীরহাটের সন্নিকটে 'ধসা' একটি ঐতিহাসিক স্থান। উনবিংশ শতাব্দীতে সমৃদ্ধশালী জনপদ এবং উন্নতমানের দ্বিনীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে সুখ্যাত।'

আর এ ধসা শরীফে যুগখ্যাত সুবিখ্যাত আলেম-দ্বীন ও বোযর্গ, হযরত মাওলানা শাহ সূফী গোলাম কাদের রহমাতুল্লাহ[১০] ছিলেন- ধসা শরীফের প্রাণ-পুরুষ। ধসা শরীফের সূফী গোলাম কাদের ছিলেন হযরত গাজীয়ে-বালাকোট, হাজীউল হারামাইন, হযরত শাহ সূফী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী রহমাতুল্লাহির খলিফা । পরবর্ত্তীতে তাঁর থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে হযরত সূফী ফতেহ আলী ওয়সী রহঃ সূফী নিযামপুরী হযরতের কাছে বায়ত-শারফ হাসিল করেন।

---

৮) দুর্ঘটনা সম্বন্ধে কেউ কেউ জাহাজডুবি বা নৌকাডুবির কথা লিখেছেন, তখন কিন্তু স্থলপথ থেকে জলপথ ছিল প্রধান বা অন্যতম যোগাযোগ। তবে দুর্ঘটনা কোথায় ঘটেছিল সঠিক জানা যায়নি।

৯) ফুরফুরা শরীফের ইতিবৃত্ত — ৭৫ পৃঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ঢাকা, বাংলাদেশ - ২য় সংস্করণ - ১৯৯৫ ইং

১০) ফুরফুরা শরীফ নিবাসী মাওলানা সূফী গোলাম কাদের রহমাতুল্লাহ শ্বশুরবাড়ী ধসা গ্রামে বসবাস করতেন। তাঁর থেকেই ধসা পীরবংশ খ্যাত। ধসা ওয়াকফ ষ্টেটের বর্তমান মোতাওয়াল্লী আমাকে বলেন-হযরত সূফী ফতেহ আলী ওয়সী রহমাতুল্লাহ ধসা পানাউল্যাহ মাদ্রাসার কৃতী ছাত্র ছিলেন। এজন্য আমরা গৌরব বোধ করি। জনাব আবদুল কাদের ওরফে শাহ গোলাম কাদের রহমাতুল্লাহ ১২১৭ সালে ফুরফুরা শরীফে আব্বাসী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সূফী গোলাম কিরমানী রহঃ। ইনি উচ্চ শ্রেণীর আলেমেদ্বীন ও অলিয়েকামেল ছিলেন। — 'ফুরফুরা শরীফের ইতিবৃত্ত' - কোলকাতা, ৮৬ পৃঃ/ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-৬৪ পৃঃ।

এ ধসা শরীফ অবস্থান কালে হযরত নিযামপুরী সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত হন এবং নীবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। জাহেরী এলম শিক্ষার শেষে তাঁর থেকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা নিষ্ঠার সাথে হাসিল করেন। হযরত সূফী ফতেহ আলী ওয়সী রহঃ ও হযরত সূফী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী একই জিলা চট্টগ্রামের বাসেন্দা হলেও স্বদেশে না হয়ে প্রবাসে সম্পর্ক নীবিড় হয়। তখন সূফী নিযামপুরী কলিকাতায় অবস্থান করতেন।

প্রখ্যাত গবেষক, পীর ও বোযর্গ, অধ্যাপক ডক্টর এ, এম, আর আলী হায়দার পি, এইচ, ডি সাহেব ও অনুরূপ সমর্থনযোগ্য যুক্তি নিয়ে লিখেছেন—

"প্রখর ধীশক্তি সম্পন্ন ও স্মৃতিধর হযরত মাওলানা সূফী সাইয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়সী রহমাতুল্লাহ হাওড়া জেলার মুনসীরহাটের সন্নিকটে ধসা শরীফের মাদ্রাসা পানাউল্লাহ থেকে ব্যুৎপত্তি লাভ করে যথেষ্ট কৃতীত্বের সাথে ফারেগ হয়। অতঃপর তিনি তদ্বীয় সুহৃদ মাওলানা রাশেদ রহমাতুল্লাহ সহ কোলকাতা দমদম গোরাবাজারে চাকরী করতে থাকেন।"

এমতাবস্থায় হযরত সূফী সাহেবের জীবনে এক অলৌকিক ঘটনা সর্বসমক্ষে ঘটে যায়। তিনি যে কত বড়হাস্তি, তার পূর্বাভাষ আমরা পাই। বসিরহাটের আল্লামা রুহুল আমীন এর ভাষায়;—

"তৎপর উভয়ে কলিকাতার নিকট দমদম গোরাবাজারে চাকুরী করিতে থাকেন। উক্ত সূফী সাহেব, মাওলানা মুহাম্মদ রাশেদ মরহুম, ফুরফুরার পীর কেবলার ওয়ালেদ মাজেদ সাহেব ও উক্ত মাওলানা সাহেবের এক মামাতোভাই উপরোক্ত দমদমা মকামে থাকতেন। একদিন একজন অল্পবয়স্ক সুন্দর যুবক তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, তোমাদের এখানে যে একটি অল্প বয়স্ক ছেলে আছে, তাহাকে আমার নিকট আনয়ন কর। তাঁহারা প্রথমে উল্লেখিত মাওলানা সাহেবের মামাতো ভাইকে উপস্থিত করিলেন। ইহাতে তিনি বলিলেন, আমি ইহাকে দেখিতে চাহিনা। এ ছেলেটি অতি সত্ত্বর বেহেশতে চলিয়া যাইবে। সেই ছেলেটি ৭ দিবসের পর মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছিল। তৎপরে উক্ত সূফী ফতেহ আলী সাহেবকে আনা হইল তদ্দর্শনে তিনি বলিলেন, তুমি 'কিমিয়া' চর্চ্চা করিতেছ কেন? তোমার জাতই (অস্তিত্বই) 'কিমিয়া'। হজরত সূফি সাহেব

বাল্য জীবনে কিমিয়া চেষ্টা করিতেন। তৎপরে তিনি মাওলানা মোহম্মদ রাশেদ মরহুম সাহেবকে বলিলেন, 'তুমি সত্ত্বরই দমদম হইতে হুগলী মাদ্রাসায় বদলী হইয়া যাইবে এবং তোমার শরীরে খ্রীষ্টানের দুর্গন্ধ পাওয়া যাইতেছে, তুমি পৃথক পৃথক দুই ছেট পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিবে। যে ছেট দ্বারা উর্দ্ধতন খ্রীষ্টান কর্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিবে, চাকুরীর সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, সেই ছেটটী খুলিয়া রাখিয়া অন্য ছেট ব্যবহার করিবে।' পরে তিনি ফুরফুরার পীর সাহেবের ওয়ালেদ সাহেবকে বলিলেন— তুমি এমামত করিবে। তদুত্তরে তিনি বলিলেন - 'আল্লাহু-আকবর' বলিলেই আমি অচৈতন্য হইয়া যাই, এই হেতু এমামত করিতে পারি না। কোন গতিকে নিজের নামাজ পড়িয়া লইয়া থাকি। তখন তিনি তাঁহার শরীরে হাত বুলাইয়া বলিলেন, আর তোমার এইরূপ অবস্থা হইবে না।

আরও তিনি বলিলেন, তোমার ওয়ালেদা একটা কোরবানী মানসা করিয়াছিলেন, উহা আদায় করা হয় নাই; তিনি যেন উহা আদায় করেন। তৎপরে তিনি বলিলেন, আমার মামাতো ভাগ্নীর উপর জ্বেনের আছর আছে; তিনি মৃত্তিকার উপর বৃদ্ধা অঙ্গুলী চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, 'সেই জ্বেন দফা করিয়া দিলাম।' সেই হইতে জ্বেন দফা হইয়া গিয়াছিল। তিনি আরও বলিলেন, আমি গায়েব জানার দাবি করিতেছি না। আমি যাহা দেখিতেছি তাহাই বলিতেছি। এই অপরিচিত আগন্তুক ছিলেন— হজরত খেজের আঃ।''[১১]

ফুরফুরা শরীফের মসজিদে (মাদানী মসজিদ) হযরত খিজির আঃ সাথে দ্বিতীয় বার তাঁর যিয়ারত নসীব হয়।[১২]

কোন কোন পুস্তকে অতঃপর তারা উভয়ে হুগলীর মোহসেনীয়া মাদ্রাসায় উচ্চশিক্ষার কথা লিখেছেন— আমরা অস্বীকার করতে পারিনা, কিন্তু তেমন জোরালো যুক্তিসঙ্গতঃ প্রমাণ পাই না।

---

১১) হযরত পীর সাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী ২৮-৩০ পৃঃ কেউ কেউ ঘটনা থেকে ফুরফুরা শরীফের হযরত পীর সাহেবের নাম বাদ দিয়েছেন। বিশেষ মতলবে।

১২) ফুরফুরা শরীফের ইতিবৃত্ত - ৭৬ পৃঃ।

যেমন কেউ কেউ তাঁকে কলিকাতা মাদ্রাসা আলীয়ায় পড়াশুনা করার পর তথায় চাকরী করার কথা লিখেছেন, বস্তুতঃ সূফী সাহেবের জীবনের দিন-পঞ্জী সাজালে মাদ্রাসা আলীয়ায় পড়াও পড়ানো কখনই সম্ভব হয় না। ১৮৫৬-১৮৬৮ সাল পর্যন্ত তিনি পলিটিক্যাল পেনশান অফিসের সুপার, সেখান থেকে অবসর নিয়ে দ্বীনের মেহনতে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন এবং সফর করেন। এসব বিভ্রান্তি ইদানিং কালের কতিপয় লেখকদের কষ্টকল্পিত মত।

মাদ্রাসা আলীয়ার কাছে বিবি সালেটের মসজিদে অবস্থান করতেন, তাঁর খলিফারা মোদার্রেস, চাকরী করবেন আর তিনি আলীয়ায় চাকরী করবেন না, তা কি হয়! এ যেন তাদের ধারণা। ধারণা অনেক কিছু হতে পারে কিন্তু বাস্তব ঘটনার প্রমাণ ও যুক্তি দরকার। হযরত মাওলানা ওয়জিহ (রহঃ) সময়তো তিনি নওয়াব শাহ ওয়াজেদ আলীর প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন। তার আগে ছিলেন হাইকোর্টের ফার্ম বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা।

যিনি আধ্যাত্মিক চেতনায় উদ্ধুদ্ধ, হযরত খেজের আঃ এর জিয়ারত ও ইলমে লাদুন্নীপ্রাপ্ত; তাঁকে নিয়ে নিছক কাল্পনিক আলোচনার কি বা প্রয়োজন?

যদি ওয়সী পীর (রহঃ) ১৬/১৮ বছর বয়সে দুর্ঘটনায় আম্মাকে হারিয়ে কোলকাতায় আসতেন, তাহলে তিনি তাঁর জন্ম স্থান, বয়স, শিক্ষা সব পরিষ্কার বলতে পারতেন। কিম্বা স্ত্রী, পুত্র কন্যা এবং প্রাণপ্রিয় খলীফাও বিস্তারিত জানতে পারতেন। তাহলে এ বিভ্রান্তিতে কেউই পড়তো না। বিজ্ঞদের দৃঢ় ধারণা তিনি অল্প বয়সে পিতা-মাতা হারা হন। তাই চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার আমিরাবাদের জন্ম ইতিহাস বিস্তারিত বলতে সক্ষম নয়। পরিশিষ্ট-১ বিস্তারিত দেখুন)।

> যার তার বই পড়া ভালো নয়
> যার তার ওয়াজ শোন ভালো নয়
> —খলিফায়ে মোজাদ্দেদে যামান (রহ)

ধসা শরীফে অধ্যায়ণ কালে তথাকার বিখ্যাত পীর মাওলানা আবদুল কাদের ওরফে শাহ গোলাম কাদের আব্বাসী রহমাতুল্লাহ গুণ ও জ্ঞানে মুগ্ধ হন। তিনি ছিলেন—চট্টগ্রামের বিখ্যাত পীর ও মাশায়েখ সূফী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী রহমাতুল্লাহ এর খলিফা পরবর্তীকালে কোন এক শুভ মুহূর্তে সূফী ফতেহ আলী ওয়সী রহমাতুল্লাহ ও কুতুবেদওরান গাজীয়ে বালাকোট সূফী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী রহমাতুল্যাহির দস্তে বয়য়াত গ্রহণ করেন। সে সময় সূফী নূর মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ কোলকাতায় মিসরীগঞ্জে মৌলভী তৈয়ব সাহেবের মসজিদের কামরায় (কলিন স্ট্রীট) দীর্ঘদিন অবস্থান করতেন।

মিসরীগঞ্জ মসজিদ কলীন স্ট্রীটে অবস্থিত। মাদ্রাসা আলীয়া থেকে ট্রাম লাইন পার হয়ে পশ্চিমের গলিতে।

সে সুযোগে সূফী ওয়সী রহমাতুল্লাহ তাঁর থেকে আধ্যাত্মিক তালীম হাসিল করতে থাকেন এবং কিছুদিন ঢাকা আজিমপুর দায়েরা শরীফে সূফী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী রহমাতুল্যার খিদমতে আত্মনিবেদন করে বেলায়েত ও কামালিয়াত হাসিল করে খেলাফত প্রাপ্ত হন।[১৩]

হযরত সূফী সাহেব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রূহ থেকে নিসবত হাসিল করেছিলেন, এছাড়াও চারি তরীকার নিসবত উক্ত তরীকার মুল চারি হযরতের রূহ থেকে হাসিল করেছিলেন। আর জাহেরী ভাবে চারি তরীকার ফয়েজ হযরত সূফী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী থেকে তালীম প্রাপ্ত হন।

হযরত সূফী সাহেবেরে খলিফা মাওলানা আবদুল হক সিজগ্রামী এক পত্রে লিখেছেন - হযরত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট থেকে হযরত সূফী ফতেহ আলী ওয়সী সাহেবের উচ্চ সম্মান ও 'নিসবতেওয়সিয়া' লাভ হয়েছিল।

কোন কোন বোযর্গ হযরত নবী পাকের খেদমতে আরয করেছিলেন - সূফী সাহেবকে রূহানি ভাবে তালীম দেওয়ার। হযরত নবী পাক সঃ বলেছিলেন, আমি উহার ভার লইব'। তিনি আরও লিখেছেন একদিন আমি

---

১৩) মৎপ্রণীত ফুরফুরা শরীফের ইতিবৃত্ত - ৭৬ পৃঃ।

দেখলাম যে, আমার কলব লতিফা একটি নূরানী মসজিদে পরিণত হয়ে যেন উর্দ্ধগামী হচ্ছে, উহাতে একটি গম্বুজ ছিল তার মধ্যে মিম্বর স্থাপন করা হয়েছে - উক্ত মিম্বরের পাদদেশে হযরত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দণ্ডায়মান আছেন, তাঁর চারিধারে উলুল আযম নবী ছিলেন। আর ও খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দী, এমাম রব্বানী মোজাদ্দেদে-আলফে সানী রহমতুল্লাহ হযরত নবী পাকের সম্মুখে আছেন। আর হযরত সূফী ফতেহ আলী সাহেব তাঁদের পশ্চাতে আছেন। এ অবস্থায় তাঁরা ২৪ দায়রা পর্য্যন্ত উন্নীত হয়। আমার লতিফা গুলোও তাদের সাথে উন্নীত হয়। তৎপর হযরত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরবত পূর্ণ একটি সোরাহি হতে আমার মুখে শরবত ঢেলে দিয়ে বললেন - আরও পান করবে কি? আমি বললাম হ্যাঁ, ইয়া রাসুলে খোদা। অতঃপর উক্ত সুরাইটি উক্ত তিন হযরতের হাতে দিয়ে বললেন—'ওকে পান করাও।'

আরও উক্ত খলিফা সাহেব লিখেছেন - একদিন হযরত সূফী সাহেব আমাকে বললেন - তুমি লওহে মাহফুযের দিকে দেখে দুটি বিষয়ের অবস্থা তদন্ত কর। প্রথম সুলতানের জয় হবে কিনা? দ্বিতীয়, নিজের ওয়ালেদ মাজেদের নিসবতের অবস্থা। তার হুকুমে আমি লওহে মাহফুযে দৃষ্টিপাত করে সুলতানের জয় হবে এবং নিজ পিতার নাম হযরত আবু বকর সিদ্দিকীর বংশধরদের মধ্যে দেখতে পেলাম। হযরত গওসুল সাকালাইন বড় পীর সাহেবের নিসবত এবং অন্য একজন কামেল হতে দ্বিতীয় নিসবত তাঁহার বক্ষে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। এ থেকে হযরত সূফী সাহেবের দরজা অনুমান করে নিতে হবে। বিস্তারিত জীবনী ৩৭-৩৮ পৃঃ।

এ ছিল তাঁর জাহেরী 'বয়য়াত'। শরিয়তের দলিলে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আহলেহালের মহাত্মন ব্যক্তিরা 'বয়য়াত' গ্রহণকে ফরয পর্যায়ভুক্ত করেছেন। ইতিপূর্বে তিনি আধ্যাত্মিক ভাবে পীরানে তরীকত ও নবী খান্দান এবং খায়রুত্তাবেয়ীন হযরত ওয়ায়েস করনী রাঃ নিসবতে ওয়সীয়ার ফয়েযে ফয়যিয়াব হয়েছিলেন।

অধুনালুপ্ত প্রায় তিনশত কিম্বা সাড়ে তিনশত তরীকার সন্ধান পাওয়া গেলেও বর্তমানে সবগুলো চারিতরীকার মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে। ১০৪ খানা সহিফা কিম্বা আসমানী কেতাবের সন্ধান পাওয়া গেলেও চারিটি কেতাবের প্রাধান্য দিয়েছেন মহান আল্লাহ, আবার কোরআনুল কারীমের হুকুমত জারী রেখেছেন।

মাশায়েখে এজাম, বোযর্গানেদ্বীন হাক্কানী-রব্বানী আলেমেরা সমস্ত তরীকা গুলোকে চারি তরীকার মধ্যে সন্নিবেশিত করেছেন। আর মশায়েখে এজামদের

ইহাই সম্মিলিত (এজমা) মত। বর্তমানে চারি তরীকা যথা- তরীকায় আলীয়া ক্বাদরীয়া, তরীকায়ে আলীয়া চিশতীয়া, তরীকায়ে আলীয়া নকশাবন্দীয়া ও তরীকায়ে আলীয়া মোজাদ্দেদীয়া। মোজাদ্দেদে-যামান ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী রহমতুল্লাহ তদীয়পীর মুর্শিদ কুতবুল-ইরশাদ, রাসুলনোমা পীর হযরত সূফী ওয়সী রহমতুল্লাহ থেকে তালীম পেয়ে চারি তরীকায় কামেল ও মোকাম্মেল ছিলেন এবং মোজাদ্দেদীয়াতের হায়সিয়াতে চারিতরীকার বিশুদ্ধ উরুজ করেছিলেন।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হযরত সূফী ফতেহ্ আলী ওয়সী রহমতুল্লাহ যদি 'ওয়সী তরীকা'র পীর হতেন, তাহলে ফুরফুরা শরীফের পীর মাওলানা গোলাম সালমানী আব্বাসীর, ফুরফুরা শরীফের পীর মুজাদ্দেদে যামান, মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী রহমতুল্লাহ কুতুবুজ্জমান হযরত শাহ্ সূফী পীর সাইয়্যেদ একরামুল হক মুর্শিদাবাদী রহমতুল্লাহ প্রমুখ ওয়সীয়া তরীকায় তালীম পেয়ে প্রচার করতেন? প্রতিটি তরীকার নিজস্ব সিলেবাস বা দস্তুর আছে, তাতে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ত ভিন্ন ভিন্ন দরুদশরীফ আমরা দেখতে পাই। যারা ওয়সীয়া তরীকার পীর বলে দাবীদার তাদের থেকে আমরা ওয়সীয়া তরীকার সতন্ত্র দরুদ-নিয়েত বা সিলেবাস অদ্যাবধি দেখতে পাই না।[১৪] 'ওয়সীয়া তরীকা' নয় বস্তুতঃ হযরত সূফী ফতেহ্ আলী রহমতুল্লাহ 'নিসবতে-ওয়সীয়া'র ফয়েয প্রাপ্ত বিরল শ্রেণীর উচ্চ তবকার বোযর্গ ছিলেন। তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে- 'দিওয়ানে-ওয়সী'র ছত্রে ছত্রে ওয়সী নামে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন। ওয়সী তাঁর ছদ্মনাম বা তাখাল্লুস।

বিশুদ্ধতার মাফকাটিতে তিনি ছিলেন- খাঁটি দুধে ধোওয়া। তাইতো তাঁর ৬১ বছরের জীবনে 'ছন্দের লয়তান', বাদ্যযন্ত্রের একতান'তো দূরের কথা কবিতার ছন্দে 'সুর-তান' কখনই তাঁর কণ্ঠে শোভা পায়নি। তিনি ছিলেন হযরত ওয়ায়েস করণী রাঃ ন্যায় আত্মগোপনকারী আত্মনিবেদিত মহাপ্রেমিক। তাই "ওয়সী" তাঁর নামেই সত্যই মানানসই। তাঁকে নিয়ে অতিবাড়াবাড়ি অতিরঞ্জিত করা বড় বেমানান।

ওয়সীয়া আজ দিনোঈমা, ই-ক্বদর দানিমোবাস্
দ্বীনেমা ইশকে মুহাম্মদ, হুব্বে ঊ ঈমানেমা।

---

১৪) যারা পীরের কাছে থেকে সবক মশক করে তরীকা ত্বয় করেছেন, তাদের মত নয়। বরং যারা তরীকায় অনুপ্রবেশকারী সাজ্জাদনশীন, হুযরানশীনপীর নাম ধারীদের মস্তিষ্ক প্রসূত।

কতিপয় ব্যক্তি তাঁকে 'রাজা'র আসনে বসাতে চান। আমাদের সুচিন্তিত প্রামাণ্যমত তিনি 'রাজা' নন বরং, তিনি ছিলেন - 'রাজাধিরাজ' - 'কিং' (King) মেকার। ইতিপূর্বে আমরা বলেছি - তিনি 'রাজা' বনতে চাননি, 'রাজা' বানানেওয়ালা। নেপথ্যে থেকে তাঁর মহিমা বিকাশ, এ তাঁর জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

তিনি 'মোজাদ্দেদে-যামান' হননি; 'মোজাদ্দেদে-যামান' তৈরী করেছেন। কুতুবুজ্জমান হননি, কুতুবুজ্জমান বানিয়েছেন, আমীরুশ শরিয়াত হয়নি, আমিরুশ শরিয়ত বানিয়েছেন - বস্তুতঃ তিনি তো ছিলেন- এ সবরে অনেক অনেক উর্দ্ধে, **'কুতবুল-ইরশাদ'**।

'মেজাদ্দেদে-যামান' এর ফয়েয একশত বছরের আর 'কুতবুল-ইরশাদ' এর ফয়েয দুশত বছরের। শত বছরের মধ্যে বিশেষ গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি 'মোজাদ্দেদে-যামান' হন, সমসাময়িক যুগের বোযর্গ ও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা মনোনীত করেন। তেমনী বিশেষ গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি দুশত বছরে একজনই হয়ে থাকেন। 'কুতবুল-ইরশাদ' যাকে সে যুগের ও বিগত যুগের পীরানে তরীকত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বোযর্গানেরা মনোনীত করে থাকেন। ঢাক ঢোল পিটিয়ে কাগজে কলমে কেবল লিখে পরবর্ত্তীকালে বিগতদিনের কোন ব্যক্তিকে মোজাদ্দেদে-যামান বানানো যায় না, তেমনি কুতবুল-ইরশাদও বানানো যায় না।[১৫]

এক তারিখে ফুরফুরার হযরত পীর সাহেব স্বপ্নযোগে দেখেন যে, তিনি তাঁর মামাতো ভাই মুহাম্মদ ও অন্যান্য কয়েকজন লোকের সাথে হযরত মাওলানা সূফী ফতেহ আলী ওয়সী রহমাতুল্লাহর 'দরজা' সম্বন্ধে বাহাস হচ্ছে। অবশেযে সকলের মতে স্থিরীকৃত হল যে, তিনি "**কুতবুল-ইরশাদ**" ছিলেন।[১৬]

---

১৫) কতিপয় অপরিপক্ক জ্ঞান পাপীদের কাজ, তারা যেন তেন প্রকারে হযরত সূফী ওয়সী রহমাতুল্লাহ কে মোজাদ্দেদে যামান, তাঁর ২/১ জন খলিফাকে মোজাদ্দেদে যামান বানাতে চায়। এ যেন প্রফেসরকে বি. এ পাশ বলে, এবং পি. এইচ. ডি ডিগ্রীধারীকে এম. এ পাশ বলে পরিচয় করার মত। মনে রাখতে হবে 'মোজাদ্দেদে-যামান' কোন মরণোত্তর ডিগ্রি নয়। সমসাময়ীক কালের আলেম ও বুদ্ধিজীবিদের সম্মিলিত মতেই 'মোজাদ্দেদ' হয়।

১৬) বিস্তারিত জীবনী —৩৫ পৃঃ।

আল্লামা পীর রুহুল আমী রহমাতুল্লাহ কলমে 'কোতবুল-ইরশাদ' পদমর্যাদার বিবরণ শুনি;-

'কেহ কেহ বলেন (সুরা নাবা - ৭ম আয়াত) সপ্তম আয়ত উল্লিখিত 'আওতাদ' শব্দ দ্বারা প্রধান প্রধান বিশিষ্ট অলিউল্লাহগণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ তারা পর্বতমালার ন্যায় স্থায়ী থাকেন এবং তাদের দোয়ায় জগদ্বাসিগণ শান্তিতে থাকেন। এবনে আতা বলেন - যে অলিউল্লাহগণ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়ে একই পদে স্থায়ী থাকেন, তারাই 'আওতাদ' নামে আখ্যায়িত হন, জগতে চারিজন 'আওতাদ' আছেন। জগতের পর্বূ প্রান্তের রক্ষক আবদুল হাই নামে, পশ্চিম প্রান্তের রক্ষক আবদুল আলিম নামে, উত্তর প্রান্তের রক্ষক আবদুল মুরিদ নামে, ও দক্ষিণ প্রান্তের রক্ষক আবদুল কাদের নামে অভিহিত হয়ে থাকেন।

আর সাতজন 'আবদাল' নামীর অলিউল্লাহ আছেন, তাঁরা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন সপ্তাংশে (সাত একলিমের) রক্ষণা বেক্ষণ করেন, তাঁদের একজন মৃত্যুপ্রাপ্ত হলে, তন্নিম্নপদস্থ 'নজিব' নামক একজন অলিউল্লাহ তাঁর পদ অধিকার করেন এ পরিবর্তনশীলতার জন্য তাঁরা 'আবদাল' নামে অভিহিত হন। আর চল্লিশজন অলিউল্লাহ 'নযিব' নামে অভিহিত আছেন, আরও তিনশত অলিউল্লাহ 'নকিব' নামে আখ্যাত আছেন, তাদের মধ্যে 'কোতবুল আবদাল' ও 'কোতবুল ইরশাদ' নামক দু'জন শ্রেষ্ঠতম অলিউল্লাহ আছেন।

— তঃ রুহুল বয়ান, আমপারার তফসির - ১৪-১৫ পৃঃ।

'কোতবুল-ইরশাদ' পদের বোর্যগের (ফয়েয) দুশত বছর যামানা। হযরত ইমাম মাহাদি আঃ এর আবির্ভাব পর্যন্ত মিয়াদ — এরশাদে মাবুদিয়া - ১৯ পৃঃ।

কাহারও মতে "খোদাতায়ালা প্রত্যেক সময়ে চারি সহস্র অলিউল্লাহ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান তিনশত অলিউল্লাহ 'আখইয়ার' নামে অভিহিত হন। চল্লিশজন 'আবদাল' নামে, সাতজন 'আবরার' নামে, চারিজন 'আওতাদ' নামে, তিন জন নোকাবা নামে, আর একজন 'কোতব' ও 'গওস' নামে আখ্যান হন। ফতুহাতে বর্ণিত আছে যে, জগতের সপ্তাংশের প্রত্যেকাংশের এক একজন অলিউল্লাহ আছেন, খোদা তায়ালা তাঁদের দ্বারা জগতের রক্ষণা বেক্ষণ করেন, এ সাতজন আবদাল নামে অভিহিত হয়ে থাকেন।"— কাশফুল মাহযুব।

হযরত সূফী ফতেহ আলী ওয়সী 'কোতবুল-ইরশাদ' পদমর্যাদা প্রাপ্ত অলিউল্লাহ এবং 'গওস' ছিলেন। — রহমানী।

আল্লাহপাক যাকে ''জাতে-কিমিয়া'' বানিয়েছেন, তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা, ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ, নিয়ম-পদ্ধতি, স্বাতন্ত্র্য হবে তাতে আশ্চর্য্যের কি আছে। বাতেনী ইলম যেমন প্রকাশ্যভাবে হাজী গাজী সূফী নূর মহম্মদ নিযামপুরী রহমতুল্লাহ থেকে পেয়েছিলেন। তেমনিতরা জাহেরী ইলম তিনি হাওড়া জেলার মুনশীর হাটের 'ধসা শরীফের' পানাউল্লাহ মাদ্রাসা থেকেই পেয়েছিলেন। সে সময় 'ধসা' শরীফের মাদ্রাসার যথেষ্ট সুনাম ছিল। ধসা শরীফের প্রাণ পুরুষ তাকওয়া পরহেযগারীতে অনন্যা হযরত সূফী গোলাম কাদের রহমতুল্লাহ। ধসা শরীফের সাথে তাঁর আধ্যাত্মিক সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। সূফী গোলাম কাদের রহমতুল্লাহ ছিলেন— সূফী সাইয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়সী রহমতুল্লাহএর সিনিয়র পীর ভাই।

সে সময় বেসরকারী মাদ্রাসার মধ্যে - ধসা শরীফ ও সীতাপুর (থানা জগৎবল্লভপুর) মাদ্রাসা ছিল অন্যতম। ১৭৮১ সরকারী মাদ্রাসা কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসা এবং ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হাজী মুহাম্মদ মহসীন প্রতিষ্ঠিত হুগলী মোহসেনিয়া মাদ্রাসা। আর ঐ প্রতিষ্ঠানে চাকরী করার কোন অবকাশ নেই।[১৭]

১৭) সেখ আহমদ আলী লিখেছেন - 'সূফী ওয়সী রহমতুল্লাহ ধসা মাদ্রাসায় তিনি আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিতেন আর কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় পড়েছেন এবং পড়িয়েছেন।' কোন রেফারেন্স দিতে পারেননি। কাজেই অবাস্তব। এমন একজন সর্বহারা ছাত্রের জন্য বেসরকারী আবাসিক মাদ্রাসাই শ্রেয়ঃ। এ সব তার কষ্ট কল্পিত কাহিনীমাত্র। হেডমাওলানা ওজিহ রহমতুল্লাহ এর সমকালে হযরত ওয়সী রহঃ যে কলিকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেছেন তার কোন প্রমাণ নেই, অবান্তর দাবী। ধসা মাদ্রাসায় সূফী গোলাম কাদের রহমতুল্লাহ হযরত সূফী ওয়সী রহমতুল্লাহ, সিনিয়র পীরভাই। কাজেই 'আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিতেন' একথা অবাস্তব ও অবান্তর। এ সব অধুনা প্রকাশিত কতিপয় অপরিপক্ক লেখকের অনুমান মাত্র। ঘুরপথে (হয়তো বা) ডক্টরেটধারীদের অযোগ্যতার প্রমাণ।

সীরাতে ওয়সী

গাজীয়ে বালাকোট, কুতুবুজ্জামান,
সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী রহমাতুল্লাহ
(১৭৯০-১৮৫৮ খ্রীঃ)

ভারত উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারে সূফী-দরবেশদের অমর অবদান অনস্বীকার্য। সে সব সূফী দরবেশদের আগমন ঘটেছিল তাঁদের অধিকাংশ পশ্চিমাদেশ থেকে আগত। কুতুবুজ্জমান গাজীয়ে বালাকোট, সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী রহমাতুল্লাহ এর পূর্বপুরুষ গজনীর অধিবাসী ছিলেন।

গজনী থেকে এ দেশে আগমনের সুন্দর একটি বৃত্তান্ত অধিকাংশ জীবনী লেখক বর্ণনা দিয়েছেন —

গজনীর শাহী খান্দানে বখতিয়ার ওরফে কুতবুল আলম নামে এক যুবরাজ জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি পিতৃহারা হয়ে পড়েন। সে সময় তাঁর পিতা, প্রাণপ্রিয় পুত্র বখতিয়ারের দ্বায়ীত্বভার অর্পণ করে যান তাঁর এক মামার উপর এবং সমস্ত সম্পত্তির 'মুতাওয়াল্লী' নিযুক্ত করে "অসিয়ত' করে যান যে, "যুবরাজ বখতিয়ার বড় হইলে তাহাকে সব বুঝিয়া দিতে হইবে"।

গজনীর যুবরাজ বখতিয়ার মামার দায়িত্বে লালিত পালিত হতে থাকেন। বখতিয়ার ওরফে কুতবুল আলম বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে মামার কাছে নিজের পিতৃদত্ত সম্পত্তি ফেরৎ চাইলে, তিনি তা দিতে অস্বীকার করে বখতিয়ারের সাথে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেন এমন কি মামার যড়যন্ত্রে গজনী থেকে বিতাড়িত হন। ইতিমধ্যে বখতিয়ার বিবাহ করেন এবং তাঁর ঔরসে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। পুত্রের নাম ফিরোজ শাহ আর কন্যার নাম মায়মুনা। অবশেযে নিরুপায় হয়ে যুবরাজ বখতিয়ার স্ত্রী পুত্র, কন্যা এবং কতিপয় গন্যমান্য ব্যক্তিসহ গজনী পরিত্যাগ করতঃ ভারতের দিল্লীর শাহী দরবারে উপনীত হন। দিল্লীর সম্রাট তাদেরকে যথাযথ মর্যাদায় গ্রহণ করেন। সম্রাটের নেক নজরে বখতিয়ারের ভাগ্যাকাশ থেকে দুঃখ দুর্দশার অবসান ঘটে। বখতিয়ারের বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতায় মুগ্ধ হয়ে দিল্লীর সম্রাট তাঁকে 'গঢ়' নামক স্থানের শাসন-কর্তৃত্ব দান করেন। বখতিয়ার পূর্ণ দক্ষতায় উক্ত এলাকায় শাসন করতে থাকেন, কিন্তু বাদশাহের অদুরদর্শী নীতি ও সেচ্ছাচারিতার ফলে দিকে দিকে অরাজগতার সৃষ্টি হতে থাকে এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ফলে 'গড়'

এর অধিবাসীরা অশান্ত হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় সেখানে থাকা আর নিরাপদ নয় মনে করে তিনি হিজরত করার সংকল্প করেন, আবার গজনীতে ফিরে যাওয়া সমুচীন মনে না করে তিনি সপরিবারে এবং খান্দানের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নিয়ে পূর্ববাংলার নোয়াখালী জেলার 'দান্দীরা' গ্রামে উপনীত হন এবং সেখানে বসতি স্থাপন করে। অতঃপর নিজ ভগ্নি ময়মুনাকে আত্মীয় সুজায়াত খানের সাথে বিবাহ প্রদান করেন। বিবি ময়মুনার অন্যতম বংশধর হযরত সেখ পাশা ওরফে সেখ পানাহ্ কিম্বা ফানাহ রহমাতুল্লাহ এর সন্তান গাজীয়ে বালাকোট, কুতুবুজ্জমান, পীর, শাহ সূফী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী রহমাতুল্লাহ।

বংশলতা

কুতবে আলম ওরফে বখতিয়ার গজনবী

কন্যা ⇩ মায়মুনী ⇩ মিয়ামালেক ওরফে মানিক মিয়া ⇩ সেখ ইব্রাহীম ওরফে বিরাদহ ⇩

পুত্র ⇩ ফিরোজ শাহ

সেখ মুবারক

সেখ বুদ্দহ ওরফে সেখ বুড়ো ⇩ সেখ আমানুল্লাহ ⇩ সেখ নাসের মুহাম্মদ ⇩ সেখ মুহম্মাদ পাশা ওরফে পানাহ/ ফানাহ

সেখ সূফী নূর মুহাম্মদ গজনবী সুম্মা নিজামপুরী

হযরত সূফী সাহেব সাহেবের ওয়ালেদ কেবলা হযরত সেখ পাশা রহমতুল্লাহ ছিলেন সে সময়ের খ্যাতনামা সূফী ও মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী বিজ্ঞজন। তিনি তদীয় পুত্রের তালীম ও তরবিয়াতের প্রতি শৈশব থেকে অত্যন্ত যত্ন ও সাবধানতার সাথে শিক্ষা দিতে থাকেন। ফলে অতি অল্প বয়সে ইসলামী শিক্ষা ও আদব কায়দায় যোগ্য হয়ে ওঠেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য কলিকাতা মাদ্রাসা আলীয়ায় অধ্যায়ণ করেন। সে সময় কলিকাতা মাদ্রাসা আলীয়ার হেড মাওলানা ছিলেন, প্রসিদ্ধ ও বিজ্ঞা আলেম হযরত মাওলানা ওয়াজিউল্লাহ সাহেব। কিন্তু এ তথ্য সঠিক বলে মানা যায় না, কেননা-মাওলানা ওয়াজিহ রহমতুল্লাহ অধ্যাপনা কাল- ১৮৩৭-১৮৫৬। কেহ কেহ বলেন, অতঃপর তিনি কিছুদিন কলিকাতা মাদ্রাসা আলীয়ায় অধ্যাপনা করেন। বরং অধ্যাপনা কালে হেড মাওলানা ওয়াজিহ ছিলেন বললে ন্যায়সঙ্গত হয়।

হযরত সূফী সাহেব কেবলার প্রাথমিক আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রসঙ্গে ঢাকা রথখোলার বিখ্যাত বোযর্গ ও খ্যাতনামা মনিষী ১৯৭৫ সালের ১৫ই এপ্রিল তারিখের একটি চিঠির তাহকীক মোতাবেক ড. মতিউর রহমান সাহেব 'আয়নায়ে-ওয়সী' কেতাবের ১১৯/১২০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন- তাঁর প্রথম মুর্শিদ নকশাবন্দীয়া মোজাদ্দেদীয়া তরীকার খ্যাতনামা পীর হযরত মাওঃ শায়েখ যাহেদ দালুনবী ছিলেন। তিনি জিলা নোয়াখালির বাহমনীর বাসেন্দা। তিনি প্রখ্যাত বোযর্গ সূফী সৈয়দ মুহাম্মদ দায়েম রহমতুল্লাহ এর (দায়েরা আযমপুর, ঢাকা) খলিফা, সূফী সৈয়দ মুহাম্মদ দায়েম রহমতুল্লাহ হযরত সূফী বখতিয়ার মাহী সওয়ার রহমতুল্লাহ (বগুড়া) এর বংশধর এবং হযরত শাহ আমানাতুল্লাহ চট্টগ্রামী রহমতুল্লাহ এর খলিফা ছিলেন।

হযরত সূফী সাহেব জাহেরী তালীম সমাপ্ত করে নকশাবন্দীয়া মোজাদ্দেদীয়া তরীকায় কামিয়াবী হাসেল করতঃ এশায়াতে এসলামে যখন রত ছিলেন, **সে সময় তিনি একদিন স্বপ্নযোগে হযরত রেসালাত মায়াব ছরকারে দো আলম হযরত নবী পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাশারাত হয় "আমার সন্তান সৈয়দ আহমদ কলিকাতা এসেছেন। তুমি যেয়ে তাঁর হাতে বয়রত গ্রহণ কর।"** অতঃপর সূফী সাহেব কেবলা অতি সত্বর চট্টগ্রাম থেকে রওনা হয়ে

কোলকাতায় নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশমত আমীরুল মোমেনীন হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী রহমাতুল্লাহ এর দস্তমোবারকে বয়াত গ্রহণ করেন এবং তাঁর খেদমতে রত থাকেন। এ সময় ব্রেরেলভী রহঃ তাঁর প্রখ্যাত খলিফা ও আলেম হাফেয জামালুদ্দীন রহঃ এর সিন্দুরীয়া পট্টি মসজিদের কামরায় অবস্থান করছিলেন। হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ রহমাতুল্লাহ কোলকাতা থেকে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই হিজরী ১২৩৬ সনের ২০শে শওয়াল ৪৩০ জন সাথীসহ হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ শরীফ রওয়ানা হন। পথিমধ্যে কাফেলার যাত্রী সংখ্যা ৭০০ জনে পৌঁছে; এ কাফেলায় পীরের সাথী ছিলেন হযরত সূফী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী এবং হযরত মাওলানা এমামুদ্দীন সাদুল্লাহপুরী রহমাতুল্লাহ প্রমুখ ১২৩৭ হিজরীর সফর মাসে (১৮২২ খ্রীঃ) হযরত সৈয়দ আহমদ রহমাতুল্লাহ কাফেলা সহ হজ্জ শেষে কোলকাতায় ফিরে আসেন এবং তিন মাসকাল অবস্থান করেন।

সূফী সাহেব কেবলা ১৮২১ খ্রীঃ থেকে ১৮৩১ সালের ৬ই মে পর্য্যন্ত বোযর্গ পীর ও মোর্শেদ মোজাহেদে আযম হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ রহমাতুল্লাহ সোহবত এখতিয়ার করেন। এ সূদীর্ঘ সময়ে পিছন ফিরে অর্থাৎ ঘর সংসারের দিকে আর তাকান নাই। পীরগত প্রাণ হযরত সূফী সাহেব কেবলা অধিকাংশ জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি প্রধান সেনানীর দ্বায়িত্ব পালন করেন।

হযরত শহীদ সৈয়দ আহমদ রহমাতুল্লাহ ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী প্রায় ১২ হাজার মোজাহেদ সহ জিহাদে রওনা হন। উত্তর-পশ্চিম পাহাড় অঞ্চলে প্রবেশ করেন এবং কাবুল কান্দাহার হয়ে সিন্ধুনদীর মধ্যবর্ত্তী 'ইউসুফ জাই' এলাকায় প্রবেশ করেন। নওশেরার যুদ্ধে কোন সাফল্য পাননি। পরে পাঞ্জাতন কেল্লা দখল করেন।

১৮৩০ খ্রীঃ জুন মাসে জেনারেল আলর্ডের অধীন একদল শিখ বাহিনীকে আক্রমণ করে পরাজিত হন। পরবর্ত্তীতে ইয়ার মুহাম্মদ খাঁর উত্তরাধিকারী সুলতান খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পেশওয়ার দখল করেন। মোজাহেদে আযম হযরত সৈয়দ আহমদ বেরলভী রহমাতুল্লাহ দ্বীনের জন্য জেহাদের ডাক দেন। তাঁর

সে ডাকে সারা ভারতের অগণিত উলামা ও মাশায়েখে এজামদের সাথে বাংলার চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বর্দ্ধমান, ২৪ পরগণা, সিলেট, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি জেলার মানুষ শামীল হন। তন্মধ্যে মৌলানা এমামুদ্দীন সাদুল্লাহপূরীগাজী, মৌলানা সৈয়দ ওয়ারেস আলী শহীদ রহমতুল্লাহ) (ইনি কুতবুল-ইরশাদ, সূফী সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়সী রহমতুল্লাহ এর ওয়ালেদ কেবলা) ও হযরত মাওলানা সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী সক্রিয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর অবস্থান গৃহের অতি সন্নিকটে পশ্চিমের দুটি কামরায় মৌলানা সৈয়দ ওয়ারেস আলী বাঙ্গালী ও মৌলানা এমামুদ্দীন নূরী সাদুল্লাহপুরী থাকতেন এবং পঞ্চতর কেল্লার পূর্বদেয়াল থেকে যাওয়ার পথের উত্তরে মাওলানা সূফী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী বাঙ্গালী গাজী থাকতেন।

১৮৩১ খ্রীঃ বালাকোটের ময়দানে, রণজিৎ সিং এর নেতৃত্বে শিখ ও মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ হয়। রণজিৎ সিং প্রচুর টাকা পয়সা দিয়ে কিছু পাঠান মুসলমানকে বশ করেন। সৈয়দ সাহেব যখন রণ-কৌশল ঠিক করার জন্য গোপন স্থানে পরামর্শরত ছিলেন, সে সময় এক বিশ্বাস ঘাতক শের সিংকে গোপন পথ দেখিয়ে দেন। অতর্কিত আক্রমণে মুসলিম সৈন্যগণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। ১৮৩১ সালের ৬ই মে ১২৪৬ হিজরীর ২৪শে জিলকদ শুক্রবার মোজাহেদে আযম হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী, সৈয়দ ওয়ারেস আলী, মাওলানা শাহ ইসমাইল প্রমুখ শহীদ হন।

জেহাদে বহু বাঙ্গালী মোজহেদ শামীল ছিলেন - যথাঃ মাওলানা জহুরুল্লাহ, মাওঃ তালেবুল্লাহ, মাওঃ আবদুল কাদের, কাজী মাদানী, হাজী চাঁদ, মাওঃ আবদুল হাকীম, মাওঃ ফয়জুদ্দীন, মাওঃ আলীমুদ্দীন, মাওঃ লুৎফুল্লাহ, মাওঃ শরফুদ্দনী, সৈয়দ মোজাফফর হোসেন, মাওঃ আবদুস সোবহান (কয়া, থানা গাইঘাটা ২৪ পরগণা) মুনশী মোহাম্মদী আনসারী প্রমুখ।

১৮৩০ খ্রীঃ 'মাইয়ার' যুদ্ধে ফজলুর রহমান বর্দ্ধমানী শাহীদ হন এবং মাওঃ সূফী নূর মুহাম্মদ গাজী নিযামপুরী এবং ভ্রাতা হাজী চাঁদগাজী, কাজী মাদানী মৌলানা আবদুল হাকিম বাঙ্গালী প্রমুখ জখমী হন।

নওশাহের'র যুদ্ধে সূফী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী রহমাতুল্লাহ অন্যতম সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। প্রতিপক্ষের সহস্রাধিক সৈন্যের মোকাবেলা করেন। অসীম বীরত্ব ও সঠিক নেতৃত্বে সর্বোপরি আল্লাহর রহমতে মুসলমানগণ উক্ত যুদ্ধে জয়লাভ করেন। এ সব জেহাদে হযরত সূফী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী সাহেব বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন, যুদ্ধের পূর্বে তিনি একটি রুমাল ঘুরিয়ে সেনা বাহিনীর চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করেন এবং তিনি শত্রুপক্ষের নিক্ষিপ্ত তীর, বর্শা ইত্যাদি বিসমিল্লাহ বলে হাত দিয়ে ধরে ফেলতেন। অগণিত তীর, বর্শা ও বল্লমের আঘাতে তাঁর একখানি হাত অবশেষে পঙ্গু হয়ে যায়। তবুও সূফী সাহেব যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন নাই।

রণজিৎ সিংহের প্রাসাদের অদূরে তাঁবু খাটান হযরত সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী রহঃ তাঁর শিষ্যদের নিয়ে। নামাযের সময় হলে হযরত সৈয়দ সাহেব ঘোষণা করলেন — 'আজ ঐ ব্যক্তি আযান দেবেন যার জীবনে আসরের সুন্নত নামায ছুটেনি'। সে দিন শাহ-সূফী নূর মুহাম্মদ রহঃ দাঁড়িয়ে বললেন, - তিনিই সেই ব্যক্তি। সূফী সাহেবই আযান দেন। কথিত আছে - তাঁর আযানের সাথে সাথে রণজিৎ সিংহের রাজমুকুট খসে পড়ে এবং ঝড় শুরু হয়।

— চট্টগ্রামের সূফী সাধক - ৯৩-৯৪ পৃঃ।

বালাকোটের যুদ্ধে হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী ও হযরত মাওলানা শাহ ইসমাইল শহীদ হলে হযরত সূফী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সে সময় স্বাভাবিক কারণে মুসলিম মুজাহিদদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে, তখন হযরত সূফী সাহেব কেবলা সকলকে উৎসাহিত করার জন্য ঘোষণা করেন - "আমাদের এ যুদ্ধে সৈয়দ আহমদ বেরেলভী সাহেবের মনোরঞ্জনের জন্য নয়, এবং মাওলানা ইসমাইল শহীদ হওয়ায় আমাদের নিরাশ হওয়ারও কোন কারণ নাই। আমরা যুদ্ধ করছি, আল্লাহর জন্য, ধর্মের উদ্দেশ্যে। শুধু তারই সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য।" অতঃপর পরম বিক্রমে যুদ্ধ চললো, একা প্রায় দুহাজার শিখ সৈন্যকে হতাহত করেন; কিন্তু অবিরাম যুদ্ধ করার ফলে এবং খাদ্যের অভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। দেহের বহু স্থানে তীর বিদ্ধ ও বর্শার আঘাৎ লাগলো, রক্তের ধারা প্রবাহিত হলো, নিজের দুর্বলতা ও অক্ষমতার কথা বলে আল্লাহপাকের দরবারে ফরিয়াদ করেন —

বরছুরম আমদওলে বিছইয়ার জোদ আজমন গুণদাসত,
দৌলত তেজী কেমীন গৌইয়ান্দ শমশির তাবুয়াদ।

অর্থাৎ — হে খোদা আমার মাথার উপর অনেক তীর তরবারী-এসে পড়ে কিন্তু তাতে আমার কোন খবর ও হয় নাই, বরং তরবারী আমাকে উৎসাহ দেয় যুদ্ধ করার জন্য। আমি কিন্তু হীন ও দুর্বল হয়ে পড়েছি। যুদ্ধ করতে পারছি না।

বীরে মোজাহেদ, গাজীয়ে বালাকোট হযরত সূফী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী কেবলা ১৮৩১ খৃঃ মে মাসের পর থেকে সম্পূর্ণ বদলে গেলেন। নিরাশক্ত আবেদ-জাহেদ বনে গেলেন এবং কোলকাতায় প্রত্যাবর্তন করে মুনশী গোলাম রহমান সাহেবের মসজিদে নির্জনে এবাদাত বন্দেগীতে গভীরভাবে মগ্ন হলেন। খোশবু ঢেকে রাখা যায় না। অচিরে চারিদিকে তার বোযর্গীর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে, ফলে তাঁর ভক্ত ও মুরীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

ইংরেজ সরকার সূফী সাহেবের প্রভাব বৃদ্ধিতে প্রমাদ গণিতে লাগলেন। তাকে গেরেফতার করে কারাগারে বন্দি করার উদ্দেশ্যে একদিন এশার নামাযের জমায়তে শামীল অবস্থায় ইংরাজ সিপাহীরা মসজিদের চারিদিকে ঘিরে ফেলেন। নামায শেষে একে একে সকলে ঘরে চলে যান। একাকী সূফী সাহেব মসজিদের ভিতর মোরাকবায় মগ্ন থাকেন। সকলে মনে মনে চিন্তা করে ভীত হয়ে পড়েন, 'আজ আর সূফী সাহেবের রেহাই নেই'; কিন্তু সিপাইরা ভোর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেও তাকে বার হতে না দেখে ডাকাডাকি করতে থাকেন। কিন্তু মসজিদের কোথাও তাকে দেখা গেল না, ফলে সিপাইরা ভয় পেয়ে গেল। এদিকে সে সময় হযরত সূফী সাহেব কেবলাকে আসামে দেখতে পান। আসামের বহু মুসলমান তার সাক্ষ্য বহন করে।

হযরত সূফী সাহেব কেবলার নানাবিধ কারামত এমনিভাবে প্রকাশ হওয়ায় বহু পদস্থ সরকারী কর্মচারী (কোতোয়ালগণ) গোপনে মুসলমান হয়ে যায়। ফলে সরকার আরও ভয় পেয়ে যায় এবং তাকে হত্যা করার জন্য পথ অবলম্বন করেন। এমতাবস্থায় হযরত সূফী সাহেব কেবলা কোলকাতা ত্যাগ করার সংকল্প করেন।

আরও একটি অন্যতম কারণ — তাঁর ভক্ত ও মুরীদের সংখ্যা এমন ভাবে বাড়তে থাকে যে, তাঁর নিরিবিলি এবাদাত বন্দেগীতে বিঘ্ন ঘটতে থাকে এবং সুনাম সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। **তিনি সর্বদা অর্থ লিপ্সা ও সুখ্যাতিকে অধিকতর অপসন্দ করতেন।** এ মহা সুযোগে তিনি গোপনে কোলকাতা ত্যাগ করে চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই থানার নিযামপুর-মালিয়াস নদীর কূলে নিরিবিলি গ্রাম্য পরিবেশে আত্মগোপন করেন।

আরও জানা যায় সূফী সাহেব কেবলা একদিন কোলকাতা অবস্থানকালে মুনশী গোলাম রহমান সাহেবের মসজিদের নিকটস্থ লঙ্গরখানায় অবস্থান করছিলেন, সে সময় ইংরেজ সরকার চার পাঁচ জন গুপ্তচর লাগিয়ে তাঁর পাহারার ব্যবস্থা করেন এবং সময় সুযোগ মত গেরেফতার করার পরিকল্পনা করেন কিন্তু মহান আল্লাহর কুদরতের মহিমা এবং তাঁর অলি বান্দার কারামত, সে চার পাঁচ জন গুপ্তচর পাহারাদার হযরত সূফী সাহেব কেবলার অলৌকিক কারামত দেখে মুসলমান হয়ে যান। তাদেখে ইংরেজগণ আরও বেশী ভয় পেয়ে যায় এবং তাঁকে হত্যা করার পন্থা অবলম্বন করে।

চট্টগ্রাম জেলার মিরশ্বরাই উপজেলার নিযামপুর পরগণার মলিইয়াস গ্রামে তিনি হিজরত করে চলে আসেন। উল্লেখ্য শেরশাহ শূর এর আমলে তাঁর ভাই নিযাম শাহ শূর এর নামানুসারে এই পরগণার নাম নিযামপুর রাখা হয়।

আল্লামা রুহুল আমীন রহমতুল্লাহ আরও লেখেন —

সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী হাজী খোদাবক্স সাহেব বলেছেন—একদিন একটি দাড়ী শ্মশ্রুহীন সুন্দর যুবক রেশমী কাপড় পড়ে মিসরীগঞ্জের মৌলভী তৈয়ব সাহেবের মসজিদে সূফী সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে। সূফী সাহেব আস্তে আস্তে তার সাথে কথা বলতে থাকেন। যুবকটি চলে গেলে আমি তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় সূফী সাহেবে বলেন—'এ যুবক জ্বিন বাদশার পুত্র, বাদশা আমার মুরীদ, এ ছেলেটির আগামী কল্য বিয়ে। এ জন্য আমাকে দাওয়াত করতে এসেছিল তুমি কল্য জ্বিনের দেশে আমার সাথে যাওয়ার ইচ্ছা করলে, ফজরে এ মসজিদে উপস্থিত হবে।' আমি ফজরে তথায় উপস্থিত হলে, সূফী সাহেব আমাকে চোখ বন্ধ করতে বললেন। কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ

করে থাকার পরে তিনি চোখ খুলতে বলেন, আমি চোখ খুলে দেখি যে, আমরা উভয়ে জ্বিনের দেশে উপস্থিত হয়েছি। সূফী সাহেব উক্ত যুবকের বিয়ে পড়িয়ে দিলেন, অতঃপর আমাকে পুণঃ চক্ষু বন্ধ করতে বলেন, কিছুক্ষণ পরে চোখ খুলে দেখি, আমি মৌলভী তৈয়ব সাহেবের মসজিদে বসে আছি।

অনেক বিশ্বাসী লোকের মুখে শোনা গিয়েছে, সিপাহী বিদ্রোহের সময় পুলিশ প্রহরীরা সূফী সাহেবের চারধারে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু তিনি সে রাতেই অদৃশ্য ভাবে চট্টগ্রাম নচেৎ সিলহেট উপস্থিত হয়েছিলেন।

—বিস্তারিত জীবনী—২৬/২৭ পৃঃ।

হযরত সূফী সাহেব কেবলা কোলকাতা থেকে নিযামপুরের মলিয়াশ গ্রামের বর্তমান বাড়ীতে আসেন ঠিক মগরীবের সময়। বাড়িতে ছিলেন একজন বৃদ্ধা মহিলা। তিনি তাকে বললেন—বুড়িমা আমাকে দয়া করে নামায পড়ার জন্য বিছানা বা একটু জায়গা দিন। তিনি মগরীবের নামায সমাপন করে অযিফা পড়ে মোরাকাবায় নিমগ্ন হলেন। সুদীর্ঘ সময় মোরাকাবা মোশাহাদায় নিমগ্ন থেকে এশার নামায পড়ে আবার অযিফা পড়ে ধ্যানস্থ হলেন। বুড়িমার বাড়ীতে মেহমান দারীর মত কিছুই ছিল না। এমতাবস্থায় একজন যুবক বাড়ীর দরজায় এসে বুড়িমাকে ডেকে বললেন—বুড়িমা আপনার বাড়ীতে আজ কোন মেহমান আছেন? বুড়িমা বললেন হ্যাঁ, দুজন মেহমান আছেন। যুবকটি বললেন—মেহমানদের জন্য খানা এনেছি, তাদেরকে দিবেন। কুদরতের মহিমায় হযরত সূফী সাহেব কেবলা এবং তদ্বীয় সাথী পালক পুত্র আবদুল্লাহ ওরফে আনোয়ারুল্লাহ সহ খানা খাওয়ার পর ও একজনের মত খাদ্যদ্রব্য ছিল। সেখাদ্য বুড়িমার পক্ষেই যথেষ্ট হয়ে যায়।

সকাল বেলাতেও ঠিক তেমনি ভাবে একজন অপরিচিত ব্যক্তি নাস্তা নিয়ে আসেন এবং সূফী সাহেব কেবলা ও পালকপুত্র এবং বুড়িমা সহ তিন জনকে খাওয়ালেন।

এমনি ভাবে চারিদিকে সূফী সাহেব কেবলার মহিমা ছাড়িয়ে পড়ায় দিন দিন লোকজনের জমায়েত হতে থাকে, কেউবা তদবীরের জন্য কেউবা মুরীদ হওয়ার জন্য। এলাকার মানুষ যখন বুঝতে পারলেন, ইনি এ জামানার একজন

কামেল ওলী, তখন তারা বুড়িমার কাছ থেকে কিছু জমি জায়গা খরিদ করে, এবাদাত খানার জন্য ফীসাবিলিল্লাহ্ তাকে ওয়াকফ করে দেন। হযরত সূফী সাহেব কেবলা আজীবন সেই বাড়ীতে পালক পুত্র সহ বসবাস করতেন এবং বর্তমানে যে মসজিদটি আমরা দেখতে পাই তিনিই তার প্রতিষ্ঠাতা।

যে বাড়ীতে হযরত সূফী সাহেব কেবলা অবস্থান করতেন সে বাড়ী 'দরগাহ বাড়ী' নামে পরিচিত। উক্ত বাড়ীতে সূফী সাহেব কেবলার বোন আমিনা বিবির সাথে জনাব সেখ নজমুদ্দীন ভুইয়ার বিবাহ হয়। এই বোন সূফী সাহেব কেবলাকে আমৃত্যু খেদমত করেন। তাঁদের নাতী সেখ আবদুল গণির পাঁচ ছেলে।

সন্তানদের মধ্যে মৌলভী সেখ আবদুল আযীয রহমতুল্লাহ ছিলেন অন্যতম এবং জিয়াউল হক সাহেব তাঁর সন্তান।

হযরত সূফী সাহেব কেবলার পালকপুত্র আবদুল্লাহকে মলিয়াশ গ্রামে বিবাহ করিয়ে দেন এবং তার সন্তানাদি সহ অবস্থান করতে থাকেন। সূফী সাহেব কেবলার ইন্তেকালের পর তাঁর বাড়ীতে উক্ত পালকপুত্র সন্তানাদি সহ অবস্থান করতে থাকেন এবং তিনি উক্ত মসজিদের এমাম ছিলেন।

হযরত সূফী সাহেব কেবলার ইন্তেকালের পর এক সময় প্রবল বন্যা হয়েছিল, সমুদ্রের প্রবল বন্যার পানিতে অধিকাংশ লোকজন পশুপাখী, গরু ছাগল মারা যায়। পশ্চিমদিক থেকে সমুদ্রের তুফান আসতে থাকে তখন লোকজন পাহাড় পর্বতের দিকে ছুটাছুটি করতে লাগল, কিন্তু আবদুল্লাহ তার সন্তানাদিদের নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে রইলেন এবং বলতে থাকেন আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপায় নেই। তিনি যদি রক্ষা করেন এ ঘরের মধ্যেই রক্ষা করবেন। এ প্রবল বন্যার পানিতে ঘরের মধ্যে তাঁরা সবাই মারা যান, কিন্তু আল্লাহপাকের মর্জি কেউ বুঝতে পারে না। তাঁদের লাশ মুবারকের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বন্যার দুমাস পর সূফী সাহেব কেবলার মাজার শরীফের পার্শ্বে আবদুল্লাহর লাশ পাওয়া যায়। তাঁর পরিধানে যে কাপড় ছিল সে কাপড়ই রয়ে গেছে। কাপড়ের কোন জায়গায় কোথাও ময়লা দাগ পড়ে নাই এবং দেহের মধ্যে কোন রকমের ক্ষত বা দূর্গন্ধ হয় নাই। আবদুল্লাহর মৃতদেহ সকলেই চিনতে পেরে তাঁকে সূফী সাহেব কেবলার মাজার শরীফের কাছে দাফন করা হয়।

হযরত সূফী সাহেব কেবলা (মাজার শরীফ সংলগ্ন) মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করে যান তিনি নিজে। পরবর্ত্তীকালে উক্ত মসজিদ প্রথম সংস্কার করেন এলাকার একজন স্বনামধন্য জমিদার আলহাজ্জ গোলাম সুলতান চৌধুরী পাকা ঘর করেন। ১৯৬৩ খ্রীঃ ঝড়ে মসজিদের টিনের ছাউনী উড়ে যায় এবং মসজিদের বেশ ক্ষতি সাধন হয়। তখন জন সাধারণের একান্ত সাহায্য ও সহানুভূতিতে মসজিদের ছাদ নির্মাণ করা হয় এবং পরবর্ত্তিতে মুসল্লীদের জায়গা সংকুলান না হওয়ায় দ্বিতল করা হয়।

একসময় উক্ত মসজিদের ঘরটি চট্টগ্রামের বিখ্যাত জমিদার আবদুল্লাহ খাঁ সাহেব মসজিদের জন্য কিছু জমিদারী ওয়াকফ করে দিতে চেয়ে ছিলেন এবং নিজ কন্যাকে সূফী সাহেব কেবলাকে বিবাহ দিতে চেয়েছিলেন। তিনি কিছুতেই রাজী হন নাই। কেননা মসজিদ আল্লাহর পবিত্র ঘর; কিন্তু জমিদারের অধিকাংশ হারাম টাকা পয়সা দ্বারা উপার্জিত হয়ে থাকে, কাজেই হারাম মাল দিয়ে আল্লাহর ঘর নির্মাণ করতে শরিয়তে নির্দেশ নেই। আর বিয়ের ব্যাপারে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে বলেন — 'বিয়ে করা যে বয়সে দরকার, আমার সে সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, এখন আর সে বয়স নেই। এ সময়ে যারা আমাকে স্ত্রী পুত্রের বন্ধনে আবদ্ধ করতে চায়, তারা আমার সত্যিকার শুভাকাঙ্খী নয়।' সূফী সাহেব সারা জীবন অকৃতদার ছিলেন।

হযরত সূফী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী রহমাতুল্লাহ ছিলেন, নবী আদর্শের মূর্ত প্রতীক। তিনি মানুষকে রহমতের দরজা মনে করতেন। বাল্যজীবন থেকে আমৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি কোন দিন হাসি ও খেলতামাশায় লিপ্ত হন নাই। শেষ জীবন অবধি জ্ঞান চর্চা থেকে বিরত হন নাই। বস্তুতঃ এ দেশে হাদীস ও তফসিরের উচ্চ পর্যায়ের তালীম তাঁর থেকে শুরু হয়। "আনওয়ারুন নিয়্যারাইন" পুস্তকের ভাষ্য মোতাবেক জানা যায় এতদ অঞ্চলের বড় বড় দীনি প্রতিষ্ঠান তারই প্রচেষ্টার সুফল।

তিনি সাদাসিধা জীবন যাপন করতেন। কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বা পাক ছাফ এর দিকে তার লক্ষ্য ছিল অপরিসীম। তাকওয়া পারহেযগারীতে তিনি ছিলেন অনন্যা। নিজ হাতে তিনি নিজের কাজ করতেন। এমন কি নিজের

হাতেই নিজের জামায় তালি দিয়ে ব্যবহার করতেন। অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ সূফী সাহেব গরীব দুখীদের জন্য সর্বদা খেয়াল রাখতেন, সাহায্য করতেন। কোন দুখীজনকে কখনও বিমুখ করেন নাই। প্রয়োজনে তিনি নিজে অপরের খেদমত বা দরকার মিটাতেন। ভুলেও কখনও আল্লাহপাকের কাজের প্রতি অবজ্ঞা বা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন নাই।

নামাযের তিনি ছিলেন অত্যান্ত পাবন্দ। এক ওয়াক্ত নামায পড়ে অন্য ওয়াক্তের নামাযের জন্য তিনি বসে বসে তসবিহ্ তাহলীল পড়ে পড়ে কাটাতেন। শারিরীক অসুস্থতা বা দূর্বলতার কারণে কোন সময় ঘুমিয়ে পড়লে বা বিশ্রাম নিলে, জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে লোকদের কাছে প্রথমেই নামাযের আযান দিয়েছে কি না জিজ্ঞাসা করতেন।

তিনি মগরীব নামাযের পর নিয়মিত অযিফা পড়তেন এবং একই বৈঠকে এশার নামায পড়তেন। এশার নামায বাদ অযিফা এবং কোরআন পাকের নির্দ্দিষ্ট সুরা যেমন সুরায়ে মোলক। সুরায়ে মোজাম্মেল, সুরায়ে ইয়াসীন সুরায়ে আর রহমান ইত্যাদি পড়তেন। তারপর কিছু সময় বিশ্রাম নিতেন। শেষ রাতে উঠে তাহাজ্জদের নামায আদায় করতেন এবং মোয়াজ্জনের আযান শুনে তিনি মসজিদে যেয়ে জামায়তে নামায আদায় করে এশরাকের সময় পর্যন্ত অযিফা বা যিকির মগ্ন থাকতেন এবং চাশতের নামায পড়তেন। জুময়ার দিনে ভোর থেকে প্রস্তুতি নিতেন এবং নামায না পড়ে কিছুই ভক্ষণ করতেন না। জানাজার খবর পেলেই তিনি তথায় যোগদান করতেন সে দূরে হলেও। তিনি শুক্রবারে জুময়ার নামায কে অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন ফলে তার অবদান পরবর্ত্তীতে কারামতে পরিণত হয়েছে - মলিয়াশে হযরতের মসজিদে অধ্যাবধি জুময়ার দিনে দূর দারাজ থেকে লোকেরা নামাযের জন্য সমবেত হয় এবং চাউলের একরকম 'পায়েস' নিয়ে আসে, যেন মনে হয় প্রতি জুময়া ঈদ উৎসব। বিশেষ বিশেষ মনস্কামনা পূরণের উদ্দেশ্যে আগমনও সফল হয় ইন্‌শাআল্লাহ।

তাঁর পোষাক ছিল সাদা চাদর ও পাগড়ী। শীতকালে তিনি একটি জুববা ও একটি ছদরীয়া ব্যতিত অন্য কোন গরম পোষাক ব্যবহার করতেন না। তাঁর এ অনাড়ম্বর জীবন যাপন দেখে লোকেরা সত্যিই অভিভূত হয়ে পড়তেন এবং একজন শ্রেষ্ঠতম কামেল বোযর্গ বলে সকলেই স্বীকার করতেন।

হযরত সূফী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী (রহঃ) এর মৃত্যু তারিখ 'আনওয়ারুল নিরাইন' কিতাবে ১২৭৫ হিজরী ১৮৫৮ ইংরাজী, মৃত্যুকালে তাঁর পালক পুত্র আবদুল্লাহ্ শয্যাপার্শে ছিল। তাকে অসিয়ত করে যান - আমার কবর পাকা গুম্বয ওয়ালা করিও না। কবরে অযথা ব্যায় করিও না। তাঁর জানাজার নামাযে মাওলানা আক্রাম আলী সাহেব এমামতী করেছিলেন।

অদ্যাবধি মাজার শরীফ ছাদবিহীন অবস্থায় আছে - এবং সবুজ খেড় বা কেসি ঘাসে সর্বদা আচ্ছন্ন দেখতে পাই। ইদানিং কয়েকটি ফুল ও পাতাবাহার গাছ লাগানো হয়েছে, ফলে সুদীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ঘাসের আচ্ছাদন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

শিরক বিদয়াত মুক্ত এ মহান অলির মাজার শরীফ জিয়ারতের জন্য অসংখ্য মানুষ আসেন। উক্ত মাজার শরীফ জনাব আবদুল্লাহ খাঁর তৈরী। সদা সর্বদা আতর ও মেশক আম্বরের খোশবু পাওয়া যায়। অপূর্ব সুধাপানে জায়েরীনদের হৃদয়মত পরিতৃপ্ত হয়ে যায়। শুক্রবারে বহুদূর দারাজ থেকে উক্ত মাজার শরীফ মসজিদে নামায পড়তে ও জিয়ারত করতে এসে থাকেন। এত বেশী পরিমাণ লোক সমাগম হয় যে ঈদের জমায়েত মত মসজিদ ছাড়িয়ে ময়দান ভর্ত্তি হযে যায় এবং বহু লোক পায়েস বা ক্ষীর নিয়ে আসে। স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্ররা পরীক্ষার সময় দোয়ার জন্য মাজার শরীফ জিয়ারতে প্রভুত ফল পেয়ে থাকে।

কাশফ ও কারামত অলি আল্লাহগণের মাফকাটী না হলেও একটি বিশেষ অঙ্গ বা অঙ্গভূষণ। আমরা তাঁর কতিপয় কারামত উল্লেখ করছি:- জেলা চট্টগ্রামের প্রখ্যাত জমিদার হামীদুল্লাহ খান ইসলামাবাদী ছিলেন সে যুগের খ্যাতনামা বিজ্ঞজন। মহামূল্যবান মারেফত রত্ন লাভের আসায় দেশ-বিদেশ কামেল পীরের সন্ধানে ঘুরতে থাকেন। হযরত সূফী সাহেব কেবলার কামালিয়াতের খ্যাতি শুনে তাঁর খেদমতে হাজির হন। তাঁর বোযর্গী ও শরীয়তের পাক্কা পাবন্দ দেখে অবশেষে তাঁর দস্ত মুবারকে মুরীদ হওয়ার আরজু পেশ করেন, কিন্তু সূফী সাহেব কেবলা তাঁকে মুরীদ করতে রাজী হলেন না। খান সাহেব নিরাশ মনে ভরাক্রান্ত হৃদয়ে যখন ফিরে চললেন, তখন তার

মলিন মুখখানা দেখে জিজ্ঞাসা করেন, ''সত্যিই কি তুমি আমাকে পীরের উপযুক্ত মনে কর? তখন খান সাহেব সরাসরি উত্তর না দিয়ে একটি ফার্সি কবিতা আবৃত্তি করে তাঁর প্রতি অগাধ আস্থা প্রকাশ করে মুরীদ হওয়ার প্রবল আকাঙ্খা এজহার করেন।

খান সাহেবের আযীযী ও দৃঢ়প্রত্যয় দেখে সূফী সাহেব কেবলা মৃদুহাস্য করে সান্তনা দিয়ে বলেন - এখন চলে যাও, রাতে শোয়ার সময় ''আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদিনিন নাবিয়িল উম্মিয়ী ও আলিহীওয়া সাল্লেম'' এ দরুদশরীফ পড়ে শুয়ে পড়বে, অতঃপর নিদ্রিত অবস্থায় যা কিছু দেখবে আগামী কল্য ভোরে এসে আমাকে জানাবে।

সূফী সাহেবের নির্দেশমত তখন খান সাহেব বিদায় নিয়ে চলে এলেন। রাতে এশার নামাযের পর পাক বিছানায় মহব্বতের সাথে দরুদশরীফ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে গেলেন। অতঃপর স্বপ্নে দেখেন যে, এক স্থানে একটি অতি মনোরম উদ্যান, উদ্যানের মাঝখানে একটি চমৎকার মহল আর একজন দ্বাররক্ষী মহলের দ্বারদেশে পাহারারত। তিনি দ্বাররক্ষীকে জিজ্ঞাসা করলেন - এ বাগানের মালীক কে? আর এ প্রাসাদে কে বাস করেন? দ্বাররক্ষী বলল— এতো বেহেস্ত।

অতঃপর দরওয়ান মহলের একটি দরজার দিকে ইঙ্গিত করে খান সাহেবকে বললেন—যান, ঐ দিকে যেয়ে স্বচক্ষে মহলের শোভা দর্শন করে আসুন।

মহলের ভিতরের সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করার ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়ে সে দিকে অগ্রসর হয়ে খান সাহেব দেখতে পেলেন, হযরত সূফী সাহেব মহলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। কয়েক মুহুর্ত্ত পরে তিনি দেখেন যে, হযরত সূফী সাহেব দোযখের দিকে হাত বাড়িয়ে একজন গুণাহগারকে সেখান থেকে উঠিয়ে বেহেস্তে আনলেন। এ অবস্থা দেখে খান সাহেব আর স্থির থাকতে না পেরে সূফী সাহেব কেবলাকে জিজ্ঞাসা করেন— হুযুর ব্যাপার কি?

হযরত সূফী সাহেব কেবলা বললেন—আমি আল্লাহপাকের মহান দরবারে বহু কান্নাকাটি করে কিছু সংখ্যক গোনাহগার লোককে জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্ত করার অনুমতি লাভ করেছি। তাই এই লোকটিকে দোযখ থেকে

টেনে বার করে বেহেস্তে তুলে নিলাম। এ পর্য্যন্ত দেখার পর খান সাহেবের নিদ্রাভঙ্গ হয়ে যায়। বাকী রাত টুকু খান সাহেব ব্যকুলভাবে কাটিয়ে অতি ভোরে সূফী সাহেব কেবলার দরবারে হাজির হলেন। সে সময় হযরত সূফী সাহেব কেবলা জামায়াতের সাথে ফজরের নামায আদায় করছিলেন। নামায সমাপন করে এবার তিনি খান সাহেবকে বললেন—হ্যাঁ, এবার এস। তোমাকে মুরীদ করছি। খান সাহেব নিজের হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাঁর হাত ধরে মুরীদ হলেন।

অতঃপর সুফী সাহেব কেবলা খান সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন গতরাতে স্বপ্নে কি দেখেছো ? খান সাহেব স্বপ্নের বৃত্তান্ত সব খুলে বললেন। তখন সূফী সাহেব বললেন বাস্তবিকই মোমেন বান্দার অন্তর থেকে যখন পর্দা সরে যায়। অর্থাৎ আল্লাহপাকের নূরে অন্তর আলোকিত হয়ে উঠে তখন আল্লাহপাকের রহস্যময় জগতের বহু রহস্য অন্তর্দৃষ্টিতে সম্মুখে ভেসে উঠে। আর তুমি আমার মত যাকে দেখেছো, তিনি কোন অলী আল্লাহ্ হবেন।

একথা বলার উদ্দেশ্য নিজেকে গোপন করা। মানুষের নিকট নিজের কামালিয়াতের কথা গোপন করা, খাটি অলি আল্লাহদের আদত হলো— গোপনীয়তা অবলম্বন করা, আর সূফী সাহেব কখনও রহস্য বা কারামত প্রকাশ করতেন না।

২) একদিন হযরত সূফী সাহেব কেবলা গভীররাতে প্রতিদিনের অভ্যাস মত তাহাজ্জদ নামায পড়ছিলেন। সে সময় তাঁর প্রতিবেশীর মধ্য হতে এক ব্যক্তি অসুস্থ্য হয়ে পড়ে, তাদের একব্যক্তি পানি পড়ার উদ্দেশ্যে পানির পাত্র নিয়ে তাঁর এবাদাত গাহের দরজায় এসে দেখেন যে, ঘরটি একটি অত্যুজ্জ্বল আলোকপিণ্ডে পরিণত হয়ে আছে এবং সে আলোর ছটায় তার চোখ ঝলসিয়ে দিচ্ছে। লোকটি এ বিস্ময়কর ঘটনা দেখে ভীতিবিহ্বল চিত্তে চিৎকার করে সূফী সাহেব কেবলাকে ডাকতে থাকেন। সূফী সাহেব কেবলা শব্দ শুনে বার হয়ে এসে এতরাতে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। সে ব্যক্তি নিজের আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলে, তিনি পানি পড়ে দিলেন - সে ব্যক্তি বিদায়ের প্রাক্কালে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন - হুজুর আপনার ঘরটি এমন আলোকময় হয়েছে কিসের

আলোকে? তিনি বললেন - এ হচ্ছে 'আল্লাহর নূর'। দেখ, অদ্য তুমি যা দেখে ফেললে এ কথা কারও নিকট প্রকাশ করিও না। কিন্তু সে লোকটি বেশী দিন এ কথা গোপন রাখতে পারে নাই। সাধারণেতো প্রকাশ করে দিল।

৩) বর্ধমান জেলার পুরুলিয়া গ্রামে মোল্লা ইউসুফ নামে একজন মস্তান ফকীর ছিলেন। তিনি পোষাক পরিচ্ছেদের ধার ধারতেন না। সর্বদা উলঙ্গ থাকতেন। চারিদিকের লোকেরা তাকে বড়দরের দরবেশ বলে বিশ্বাস এবং ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন। একদিন ঘটনাক্রমে হযরত সূফী সাহেব কেবলা সে ফকীরের বাড়ীর ধার দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। এ সংবাদ জানতে পেরে মস্তান ফকীর নিজের শিষ্যদের আদেশ করলেন, শীঘ্র আমার জন্য পরিধেয় কাপড় নিয়ে এস। তাড়াতাড়ি কাপড় এনে তাকে পরিয়ে দেওয়া হল। অতঃপর তিনি নিতান্ত আদব কায়দার সাথে সূফী সাহেব কেবলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। পরস্পরের মধ্যে আলাপ আলোচনার পর ফকীর মস্তান নিজের আস্তানায় ফিরে আসলেন শিষ্যগণ তাঁকে সূফী সাহেব কেবলার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বলেন - "ইনি হচ্ছেন বর্তমান জামানার শ্রেষ্ঠ কুতুব। "বর্তমানে ইনার সমকক্ষ অলিআল্লাহ এদেশে নাই।"

৪) একদা হযরত সূফী সাহেব কেবলার বাড়ীতে চোর চুরি করার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করে, কিন্তু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করার পূর্বেই চোরটি অন্ধ হয়ে যায়। তখন তো চুরি করা দূরের কথা প্রাণ বাঁচানোর জন্য পথ খুঁজতে থাকে, কিন্তু কোন পথই খুঁজে পায় না। অগত্যা ভয়ে আড়ষ্ট ও দিশাহারা হয়ে করুণভাবে চিৎকার করা শুরু করে দেয়। সে সময় হযরত সূফী সাহেব কেবলা মহান আল্লাহপাকের এবাদতে তন্ময় হয়ে অমৃতসুধা পানে বিভোর ছিলেন। চোরের করুণ আর্তনাদে তিনি ঘর থেকে বের হয়ে এসে তাঁকে তওবা পড়িয়ে কিছু টাকা কড়ি দিয়ে বিদায় করে দিলেন।

৫) হযরত সূফী সাহেব কেবলা কোলকাতায় মুনশী গোলাম রহমান সাহেবের মসজিদের অদূরে একটি লঙ্গরখানায় কিছুদিন অবস্থান করে ছিলেন। সে সময় কোলকাতায় ভীষণভাবে কলেরা মহামারী দেখা দেয়। অন্যান্য মহল্লায় দৈনিক ২/৫ জন মৃত্যু গামী হলেও সূফী সাহেব কেবলার অবস্থানরত

মহল্লায় কোন লোক কলেরা রোগে আক্রান্ত না হওয়া দেখে সকলের ধারণা হয় সূফী সাহেব কেবলা অত্যান্ত উচ্চ দরজার অলিআল্লাহ এবং তাঁরই জন্য মহল্লাবাসীদের প্রতি আল্লাহ্ পাক রহমত করে মহামারী থেকে হেফাযত করেছেন। তখন অন্যান্য মহল্লার মানুষেরা হযরত সূফী সাহেব কেবলার কাছে দোয়াপ্রার্থী হন। তখন তিনি বলেন— "তোমরা যদি আমার কাছে ওয়াদা কর জীবনে আর কোন গোনাহ্ করবো না। তাহলে আমি তোমাদের জন্য দোয়া করতে পারি। তৎশ্রবণে মহল্লা বাসীরা যাবতীয় পাপকার্য থেকে দূরে থাকার প্রতিশ্রুতি দিলে, তিনি তাদের বিপদ মুক্তির জন্য দোয়া করলেন। তাঁর দোয়ার পর সে বছর কোলকাতা শহরে আর কলেরায় একটিও মানুষ মারা যায় নাই।

৬) হযরত সূফী সাহেব কেবলা বালাকোটের ময়দান থেকে ফিরে কোলকাতায় জনাব গোলাম রহমান সাহেবের মসজিদের অদুরে এক লঙ্গর খানায় অবস্থান কালে ইংরেজের গুপ্ত চরেরা এক সুযোগে আক্রমণ করতে উদ্যত হন। তিনি তখন অসহায় অবস্থায় তাদের প্রতি একটি বার তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকাতেই তাদের শরীরে কম্পন শুরু হয়ে যায়। কাঁপতে কাঁপতে তাদের হাত থেকে অস্ত্র খসে পড়ে। তখন তারা তাঁর পায়ে জড়িয়ে ধরে ক্ষমা ভিক্ষা চায়। তিনি দয়াপরবশ হয়ে তাদের ক্ষমা করে দেন। হুযুরের কারামত ও মহানুভবতা দেখে তারা মুগ্ধ হয়ে সেই মজলিসে তাঁর হাতে তওবা বয়য়ত পড়ে ইসলাম কবুল করেন।

৭) হযরত সূফী সাহেব কেবলার মলিয়াশ অবস্থান কালে প্রায় ১০ মাইল দূরে একটি জরুরী কাজে তার যাওয়া খুবই আবশ্যক ছিল। সময়টা ছিল বর্ষা কাল, আবার কয়েকদিন যাবত অনবরতঃ বৃষ্টি হওয়ায় ঐ দশ মাইল পথ পায়ে হেঁটে যাওয়া তাঁর পক্ষে খুবই দুঃসাধ্য ছিল, তখন তিনি তাঁর এক শাগরেদকে সেখানে যাওয়ার জন্য আদেশ করেন। মুর্শিদের আদেশ শিরধার্য্য করে বর্ষা মাথায় শাগরেদ রওনা দিলেন, চলতে চলতে পাহাড়ের অরণ্য এলাকায় পৌঁছালে হঠাৎ একস্থানে একটি বাঘ এসে তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। তখন তিনি নিরুপায় হয়ে আল্লাহ পাকের শাহী দরবারে করুন

ফরিয়াদ করেন, "ইয়া আল্লাহ। তোমার একজন প্রিয় বান্দার আদেশ পালনার্থে আমি বৃষ্টিবাদল মাথায় গৃহত্যাগ করে চলেছি; তুমি তাঁর অসিলায় আমাকে এই হিংস্র জন্তুর আক্রমণ থেকে রক্ষা কর।" তার এ মুনাজাত শেষ হতে না হতেই বাঘটি তাঁর নিকট থেকে অন্যদিকে চলে গেল। শাগরেদ যথারীতি কাজ সমাধা করে ফিরে এসে সূফী সাহেব কেবলাকে সব কিছু বিবৃত করলে, তিনি তাকে তা প্রকাশ করতে মানা করেন। তাঁর জীবদ্দসায় উক্ত ঘটনা তিনি প্রকাশ করেননি। সূফী সাহেব কেবলার ইন্তেকালের পর উক্ত ঘটনা সাধারণে প্রকাশ হয়ে পড়ে।

৮) এক সময় একজন সওদাগর বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিতেছিল। কিছুপথ যাওয়ার পর হঠাৎ প্রবল বেগে ঝড় তুফান শুরু হয়ে যায়। বাণিজ্য তরী ৩০/২০ ফুট তরঙ্গমালায় আছড়াতে থাকে। বেগতিক দেখে সওদাগর আল্লাহপাকের দরবারে সূফী সাহেব কেবলার অসিলা ধরে করুণ ফরিয়াদ করে বলেন— আয় আমার মেহেরবান আল্লাহ! ঝড়ের কবল থেকে আমাকে বাচাও, যেন আমি শেষ বারের মত হযরত সূফী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী সাহেবের মাজার শরীফ জিয়ারত করতে পারি। তার দোয়ার পরক্ষণেই ঝড় তুফান বন্ধ হয়ে যায় এবং সে ব্যক্তি নিরাপদে স্বীয় গন্তব্যে পৌঁছে যায় এবং জিয়ারত করে ধন্য হয়।

৯) বহুল প্রচারিত ঘটনা;— একদিন হযরত সূফী সাহেব মসজিদের পার্শ্বে পুকুর পাড়ে বসে অজু করছিলেন-হঠাৎ তিনি ওজুর বদনাটি সজোরে পুকুরের মাঝখানে নিক্ষেপ করলেন। ঐ সময় তাঁর এক শাগরেদ হুযুরের দরবারে আসার পথে জঙ্গলের মধ্যে বাঘে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। সে ব্যক্তি সূফী সাহেবের অসিলায় আল্লাহ্ পাকের কাছে দোয়া চায়। সঙ্গে সঙ্গে দেখলেন — একটি উড়ন্ত বদনা সজোরে হা করা বাঘের মুখে নিক্ষিপ্ত হলো। বাঘটি বদনার ঘা খেয়ে আ আ করে পালিয়ে গেল। মুরীদ সাহেব উক্ত নিক্ষিপ্ত বদনাটি সূফী সাহেবের চিনতে পেরে, নিয়ে সূফী সাহেবের খেদমতে নিরাপদে হাজির হয়ে উক্ত ঘটনা ব্যক্ত করেন। জানা যায় উক্ত বদনায় বাঘের দাঁতের আঘাত চিহ্ন বিদ্যামান ছিল।

চট্টগ্রাম শহরের নেসারীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হযরত আল্লামা মোজাফফর আহমদ সাহেবকে নিজামপুরী রহমতুল্লাহ এর বার্ষিক ঈসালে সওয়াব মাহফিলে ২৮/১০/৯৭ বুধবার বাদ আসর ময়দানে বলতে শুনেছি-

গাজীয়ে বালাকোট হযরত শাহ সূফী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী রহমতুল্লাহ এর দরবারে

ফুরফুরা শরীফের পীর কেবলা, মোজাদ্দেদে যামান, মাওলানা শাহ্ সূফী আবু বকর সিদ্দিকী রহমাতুল্লাহ নিযামপুর মাজার শরীফে বার্ষিক ঈসালে সওয়াব মাহফিল করতেন। তিনি ষ্টেশন থেকে পালকী যোগে এসে নিযামপুর গ্রাম পাওয়ার আগেই পালকী থামাতেন এবং পালকী থেকে নেমে নিজের জুতা জোড়া বগলে নিয়ে খালি পায়ে হুযুরের দরবারে আসতেন।

১৯৩৯ সালে মুজাদ্দেদ-যামান রহমাতুল্লাহ ইন্তেকালের পর ঈসালে সওয়াবের গুরু দায়িত্ব কাকে দিয়ে সম্পন্ন হয় চিন্তা করে অবশেষে সূফীয়া নূরীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ, মুজাদ্দেদে-যামান রহমাতুল্লাহ এর খলিফা মাওলানা আবদুল গণি রহমাতুল্লাহ কে দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনি শর্ষিনার পীর কেবলা, মুজাদ্দেদে-যামান রহমাতুল্লাহ এর অন্যতম খলিফা হযরত মাওলানা নেসারউদ্দীন আহম্মদ রহমাতুল্লাহ কে দাওয়াত করেন।

শর্ষিনার পীর কেবলা ও নিযামপুরে খালি পায়ে, হুযুরের দরবারে আসেন- আমরা তখন সূফীয়া মাদ্রাসার ছাত্র। সূফীয়ার হযরত আমার উস্তাদ মাওলানা আবদুল গণি রহমাতুল্লাহ এবং শর্ষিনার পীর কেবলা উভয়ে হুযুর সূফী সাহেব কিবলার মাজার শরীফ যিয়ারতে যান। আমরা কয়েকশত ছাত্ররাও ছিলাম।

হুযুররা যিয়ারত করে মাজার থেকে ঘুরে পশ্চিম দিকে ফিরে দোয়া করলেন, হঠাৎ করে তিনি মাজার শরীফের দিকে কবরের মধ্যে হাত দুখানা ঢুকিয়ে দিলেন এবং দোয়া খায়ের করে উভয়ে চলে গেলেন। রাস্তায় গিয়ে দুদিকে দুজনে চলে গেলেন। হযরত মাওলানা আবদুল গণি রহমাতুল্লাহ কিছুদুর যেয়ে দাঁড়ালেন এবং বললেন তোমরা হয়তো মনে করছো, হুযুর দোয়া করতে করতে কেন ফিরে কবরের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলেন ?

দোয়া করার সময় তিনটি কাইফিয়াত হয়। শেষ কাইফিয়াত হলো, হুযুর কবর থেকে দুহাতে ফয়েয বিতরণ করছেন, তাই থাকতে না পেরে কবরের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম।

তিনি আরও বলেন—

"মোজাদ্দেদে-যামান রহমাতুল্লাহ এর খলিফা বাঁশখালীর মাওলানা আবদুল জব্বার রহমাতুল্লাহ তখন ফুরফুরা শরীফের পীর কেবলার কাছে, তালীম পেতেন, তিনি ফুরফুরা শরীফ থেকে বাড়ী আসতে চাইলে, মোজাদ্দেদে-যামান রহমাতুল্লাহ বলেন—বাবা, মাওলানা তুমি প্রথমে বাড়ী না যেয়ে আমার দাদা পীরের মাজার জিয়ারত করবে,

তিনি সরাসরি সেগত ফুরফুরা শরীফ থেকে নিযামপুরে হুযুরের যিয়ারতে আসেন, প্রথমদিন যিয়ারতে ফয়েয না পেয়ে দ্বিতীয় দিন ও থাকেন। এমনি করে চারদিন একইভাবে তার নিযামপুরে হুযুরের মাজার শরীফে কেটে যায়, চার দিনপর বাদ মগরিব সুন্নত নামাযের পর পরই তিনি ফয়েয প্রাপ্ত হন। এমন টান মারেন যে, এশা পর্য্যন্ত ঐ হালাতে তার চলে যায়। এশার নামায বাদ আবার এমন টানদেন যে ফজর পর্য্যন্ত একই হালে চলে যায় ফজর নামায বাদ তাঁর হালের পরিবর্তন হয়। সে সময় সূফী সাহেব কেবলা এরশাদ করেন "মাওলানা আবদুল জব্বার, আমি বুধবারে ফয়েয বিতরণ করতে ভালবাসী।"

বাহারুল উলুম আল্লামা আলহাজ্জ হযরত মাওলানা শাহ-সূফী নূর মোহাম্মদ গজনবী সুম্মা নিযামপুরী রহমতুল্লাহ গাজীয়ে বালাকোট সাহেব মিরশ্বরাই থানার নিযামপুর পরগণার মলিইয়াশ বর্তমান নাম মিঠানালা গ্রামে ২৪শে রবিউল আওয়াল ১২৭৫ হিজরী, ১লা নভেম্বর ১৮৫৮ ইংরেজী, ১৩ই কার্ত্তিক ১২৬৬ বাংলা সনে ইন্তেকাল করেন।

ফুরফুরা শরীফের খলিফা ঢাকা রথখোলার পীর মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল বাসার মুহাম্মদ বসিরুদ্দীন রহমতুল্লাহ নিজ দ্বায়িত্বে ১৩ কার্ত্তিক বার্ষিক মাহফিল হযরতের মসজিদে কায়েম করেন। তার 'কায়েম মোকাম' পীরজাদা সূফী সাইয়্যেদ আবদুস সালাম এডভোকেট সাহেব প্রতি বছর ৩/৪ টি মাইক্রো সহ নিজ খরচে দ্বায়িত্বে উক্ত ১৩ কার্ত্তিক ঈসালে সওয়াব মাহফিল করে থাকেন। সে কাফেলায় এপার বাংলা থেকে আমি রহমানী ও কাজী আবদুল্লাহ বহুদিনের সাথী। মিরেশ্বরাই থেকে মলিয়াস পর্য্যন্ত যাওয়ার পথের দুধারে বাটার টোস্ট ও অমৃত মিষ্টি তাবারুক লওয়ার জন্য বাচ্চাদের গ্রহণ দৃশ্য অতি অপূর্ব, যা বর্ণনার ভাষা পাই না। আর সাইয়্যেদ সাহেব, গোপনদাতা সাইয়্যেদ ফিরোজ আহমদ সাহেব (ঢাকা) বাথরুম, শানের ঘাট, মসজিদ, গেট ইত্যাদিতে প্রচুর দান করেন। পরিবার পরিজন সহ তিনি 'রুহানী পিকনিক' মনে করে সব এন্তেজাম করেন, সাইয়্যেদ নাঈম, কাজী আবু সালেহ, মাওলানা এজহারুল হক নিযামী রহঃদের অবদান স্মরণীয়। আর সকলকে নিয়ামপুরী হুযুরের ফয়েযে ফয়যিয়াব করুন এবং বার বার যিয়ারত নসীব করুন।

বাহারুল উলুম আল্লামা আলহাজ্জ হযরত মাওলানা
শাহ-সূফী নূর মুহাম্মদ গজনবী সুম্মা নিযামপুরী রহমাতুল্লাহ গাজীয়ে বালাকোট মোজর্রত) সাহেবের
এক বোন ছিলেন, তাঁর নাম বিবি আমেনা রহমাতুল্লাহ হযরত বিবাহিতা ছিলেন।
বিবি আমেনার পুত্র সেখ আবদুর রহমান মুন্সী,
তাঁর পুত্র সেখ আবদুল গণি মুন্সী, তাঁর পাঁচ পুত্র

সেখ নূর আহম্মাদ
এর ছয় পুত্র
১। সেখ মজিবল হক (নিঃসন্তান)
২। সেখ সৈয়দুল হক
৩। সেখ মাওঃ বজলুল হক
৪। সেখ আবুল কাসেম
৫। সেখ আবুল বাসার
৬। সেখ আবু নসর ।

সেখ আবদুর রফ মাষ্টার
এর দুই পুত্র
সেখ জহরুল হক
সেখ তাজুল ইসলাম

সেখ মাওঃ আজীজ
এক পুত্র
সেখ জিয়াউল হক

সেখ মোহাম্মদ মিয়া
এর চার পুত্র
সেখ নুরুল মোস্তফা
সেখ আবদুল সালেক
সেখ মাওঃ নূর আলম
সেখ মোরশেদ মিয়া

সেখ সিদ্দিক আহম্মদ।
এর তিন পুত্র
সেখ খয়রুল আলম
সেখ শহিদুল্লাহ
সেখ সানাউল্লাহ

৩। সেখ মাওঃ বজলুল হক
এর এক পুত্র
সেখ মহাম্মদ নূরুল হুদা

৫। সেখ আবুল বাসার
এর তিন পুত্র তিন কন্যা
সেখ রেজাউল করীম
সেখ বাবুল
সেখ আবু জাফর

৬। সেখ আবু নসর ।
এর তিন কন্যা

২। সেখ সৈয়দুল হক
এর দুই পুত্র
সেখ মাওঃ এজহারুল হক নিযামী
সেখ মাওঃ জয়নুল আবেদীন

৪। সেখ আবুল কাসেম
এর দুই পুত্র দুই কন্যা
সেখ জাফরুল্লাহ খান
সেখ আলী আক্কাস

-ঃঃ কর্মজীবন ঃঃ-

কুতবুল-ইরশাদ হযরত শাহ্ সূফী সাইয়্যেদ ফতেহ্ আলী ওয়সী রহঃ পিতৃ-মাতৃ ও স্বদেশ হারা হয়ে হযরত মাওলানা রাশেদ মরহুম (বেলপাড়া-ফুরফুরা) এর সাথে পড়াশুনা করে কোলকাতা দমদম গোরাবাজারে অবস্থান কালে চাকরী করতে থাকেন। তিনি কিছুদিন কোলকাতা হাইকোর্টের ফার্ম বিভাগের কর্মকর্তা ছিলেন। রাষ্ট্রীয় কাজ কারবার, অফিস, আদালতে তখন ফার্সি ভাষা সরকারী ভাবে স্বীকৃত ছিল। আর হযরত ওয়সী রহঃ ফার্সি ভাষায় 'মাহের' ছিল। তখন তাঁর বয়স প্রায় ৩০/৩১ বছর।[১৮]

১৮৫৬ সালে নবাব ওয়াজেদ আলী শাহকে কোলকাতা ফোর্টউইলিয়ামে অন্তরীন করেন। অতঃপর তাকে খিদিরপুর এলাকায় গার্ডেন রীচ থানার মেটিয়াব্রুজ অন্তরীন করে রাখেন।[১৯] সে সময় তিনি নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ এর একান্ত সচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[২০]

অনুমান ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত হযরত সূফী ওয়সী রহঃ পলিটিক্যাল পেনশন অফিসের সুপারিনটেন্ডেন্ট পদে সমাসীন ছিলেন। এ ভাবে কর্মময় জীবনে তিনি ১২/১৪ বছর প্রায় কাটিয়ে প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন।[২১]

এলমে তাসাউফের হকিকত ও মারেফাতের সমন্বয় সাধন উচ্চমার্গের বুযর্গ মহান ব্যক্তিত্বদের প্রতিবিম্ব স্বরূপ। সাদা চোখে যেমন সবকিছু দেখা যায় না, তেমনি সাধারণ জ্ঞানে সবকিছু বুঝা যায় না। অসাধারণ মানুষদের জীবন বৃত্তান্ত রহস্যে মোড়া, অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ হবে। হযরত সূফী ওয়সী রহমাতুল্লাহ সে স্তরের প্রথম পর্যায়ের ছিলেন। সবর, শোকর তাঁর ইতিপূর্বে 'ত্বয়' হয়েছিল। ইতিমধ্যে কানায়ত, তসলিম, রেযা ও তাওয়াক্কাল মাকামে কামিয়াবী হাসিল করার সাথে সাথেই পরিপূর্ণ দ্বিনী খেদমতে জীবনের বাকী ১৮/১৯ টি বছর 'তরকে

---

১৮) আয়নায়ে-ওয়সী - ১৫২ পৃঃ।

১৯) হায়াতে ওয়সী (উর্দ্দু) - ১১ পৃঃ। অযোধ্যার শেষ নবাব শাহ ওয়াজেদ আলি ২৬শে সফর ১২৬৩ হিজরী মোতাবেক ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৮৪৭ সালে সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। লর্ড ডালহৌসির সময় ৩১শে জানুয়ারী ১৮৫৬। ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৮৫৬ চিপ কমিশনার অযোধ্যা দখল করে নেন। ১২ লাখ টাকা পেনসিয়ান ধার্য্য করেন। নওয়াব ওয়াজেদ আলি শাহকে ৫ই রজব ১২৭২ হিজরী মোতাবেক ৩রা মার্চ ১৮৫৬ লখনৌ থেকে রওনা দিয়ে ১৩ই মে ১৮৫৬ মেটিয়াব্রুজ পৌছান, ২৬ মাস ফোর্ট উইলিয়মে বন্দী রেখে ৯ জানুয়ারী ১৮৫৯ মুক্তি পান। ৩রা মহর্রম ১৩০৫ মোতাবেক ২১শে ডিসেম্বর ১৮৮৭ নওয়াব ইন্তেকাল করেন। মেটিয়াব্রুজ এমাম বাড়ায় তাকে দাফন করা হয়। আয়নায়ে ওয়সী ১৫১ পৃঃ।

২০) গাজীয়ে বালাকোট সূফী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী রহমাতুল্লাহ জীবনী কৃতঃ- প্রিন্সিপাল মাওঃ এ, বি, এম আবদুল মান্নান চৌধুরী মুজাহেদী।

২১) হায়াতে-একরাম। আয়নায়ে-ওয়সী- ১৫২-১৫৩ পৃঃ ফুরফুরা শরীফের ইতিবৃত্ত- ৭৫ পৃঃ।

দুনিয়া' ও ফানাফির রাসুলে আত্মনিমগ্ন হয়ে যান। সূফী ফতেহ আলী সাহেব সূফী সাইয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়সী'তে রূপান্তরিত হয়ে রাসুল প্রেমে একাত্ম হয়ে যান। "দিওয়ানে-ওয়সী" এ অবস্থার বাস্তব প্রতিফলন। ফতেহ আলী বাবে আলী আল্লাহলিকা অস্তিত্ব বিলীন হয়ে কেবল আমরা দেখতে পাই - ওয়সী-ওয়সী-ওয়সী। দিওয়ানে ওয়সীর রচনাকাল ১৩০০ হিজরী সনে। ইদানিং 'দেওয়ানে ওয়ায়ছী' বা হুযে রাসুল পুস্তক মোকাম্মাল বঙ্গানুবাদ করেছেন ছারছীনা দারুচ্ছুন্নত লাইব্রেরী থেকে প্রায় হাজার পৃষ্ঠার বই।

হযরত ওয়সী রহমতুল্লাহ কোলকাতায় বিবি সালেটের মসজিদে (এমদাদ আলী লেন) এবং কড়েয়া রোডের আহমদ কসাই সাহেবের মসজিদে অবস্থান করতেন। বেগবাগানরো এ স্বপরিবারে থাকতেন।

বরাবর তিনি ছিলেন অত্যান্ত শরীফ মেজাজের মার্জিত রুচির মহাজন। তাকওয়া পরহেযগারী ছিল তাঁর অঙ্গভূষণ। প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর কর্মজীবনে। তাইতো আমরা দেখতে পাই - হযরত ওয়সী ছুটির দিনগুলির এমনকি লেট টাইমেরও (বিলম্বে যোগদান) বেতন গ্রহণ করতেন না। ইবাদাত বন্দেগীতে কঠোর মেহনত ও রিয়াজত ছিল তাঁর দৈনন্দিন রুটিন কর্মসূচী।

তাঁর খেদমতে যে সব মুরীদ মোতাকেদ অবস্থান করতেন, তিনি তাদের সকলের ব্যায়ভার নিজে বহন করতেন।

হযরত শাহ সূফী সাইয়্যেদ একরামুল হক মুর্শিদাবাদী রহঃ বলেন - আমার বোযর্গ পীর ও মুর্শিদ যে খোরাকির পয়সা দিতেন, তাতে আমার মাসান্তে পয়সা বেঁচে যেত।[২২]

রাসুলনোমা, কোতবুল-ইরশাদ, গওসে সামদানী, পদমর্যাদা প্রাপ্ত ব্যক্তি আর আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারেন না। দায়িত্ব প্রাপ্তিতে তিনি স্বাধীন ভাবে তবলীগেদ্বীন প্রচারে প্রবিষ্ট হন। আত্মগোপন তিনি পছন্দ করতেন, তাই তিনি অলখ্যে বনাঞ্চলে অজানায় ছায়ের করতেন। সেখানকার মানুষ ধরা পেলে সেথা থেকে অন্যত্র চলে যেতেন। 'ছায়ের-এলাল্লাহ' কামিয়াবি সামিল করে তালীম তরবিয়াতে অধিকতর মনোনিবেশ করেন।

---

২২) হায়াতে-একরাম - ৫০ পৃঃ।

এসব ছিল তাঁর নবীয়ানা যিন্দেগীর বাস্তব নমুনা মাত্র। নায়েবে নবীদের বাস্তব অভিজ্ঞতার নিরীখে সার্থক জীবন গড়ে ওঠে। ফলে সর্বস্তরের মানুষের ব্যথা বেদনা, সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ অনুভব করে দরদভরা হৃদয়ে প্রতি বিধান দিয়ে থাকতেন। দক্ষিণ বঙ্গের ২৪ পরগণা থেকে উত্তর রংপুর জেলা ও সুদুর ভুটান পর্য্যন্ত ছিল তার কর্মস্থল। সুদুর মক্কা মদীনা মনোয়ারা পর্যন্ত তাঁর ফয়েজ পৌঁছে গিয়েছিল। খোরাসান ও বঙ্গ আসামের ১৫/১৬ টি জিলায় তাঁর খলিফাদের পরিচয় পাই।

গাছের পরিচয় ফল, উস্তাদের পরিচয় শাগরেদ, পীরের পরিচয় খলিফা। সে দিকে তিনি ছিলেন 'সফল পীর'। তাঁর খলিফাদের তালিকায় — শামসুল উলামা, শামসুল-আরেফিন, মোজাদ্দেদ -যামান, আমিরুশ-শরিয়ত, পীর মাশায়েখ, কুতুবুজ্জমান, হেকীম, সুফী দরবেশ প্রভৃতি পাওয়া যায়।

মহিশূরের নওয়াব টিপু সুলতানের বংশধরদের সাথে-হযরত ওয়সী রহঃ নীবিড় সম্পর্ক ছিল বলে জানা যায়। টিপু সুলতানের পরিবার পরিজনেরা তাঁকে মুরুব্বীর ন্যায় সম্মান বা শ্রদ্ধা করতেন। ধর্ম্মতলা টিপু সুলতান মসজিদের ওয়াকফনামা হযরত ওয়সীর মুক্তাক্ষর দিয়ে সাজানো। বিদগ্ধ সুধী সমাজে ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে হযরত ওয়সীর একটি বিশেষ মর্যাদা ছিল। সময় কালে হযরত ওয়সীর সান্নিধ্য পাওয়া মানুষ সৌভাগ্য বা গৌরব বোধ করতেন। তাঁর গুণের কথা আলোচনা করে শেষ করা যায় না। ফল কথা তাঁর উজ্জ্বল জীবন-চরিত ছিল বৈচিত্রে ও সুষমায় ভরা। বহুগুণের সমন্বয়ে ফলগুধারা।

পশ্চিমবঙ্গ, বাংলা, আসাম, আজমগড়, আলীগড়, তথা ভারত উপমহাদেশের অধিকাংশ হাক্কানী রব্বানী পীর মাশায়েখ, আলেম, উলামা, গদ্দিনশীন, সাজ্জাদানশীন, হুযরানশীন হযরতেরা কুদওয়াতুস্ সালেকীন, জুবদাতুল-আরেফীন, রাসুলেনোমা পীর, শাহ সূফী আল্লামা, সাইয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়সী রহমাতুল্লাহির উজ্জ্বল রত্ন ও সোনালী ফসল।

সাইয়্যেদ খান্দানই বিপ্লবের উৎস। স্বাধীনতা সংগ্রামী তদ্বীয় পিতা সাইয়্যেদ ওয়ারেস আলী শহীদ রহঃ সুযোগ্য পুত্র হযরত সূফী সাইয়্যেদ ওয়সী রহঃ'র ধমনীতে সে বিপ্লব রক্তধারা অব্যাহত ছিল বলে তিনি সরকারী লোভনীয় চাকরী ত্যাগ করে স্বাধীন সত্ত্বার বিকাশ সাধনে নওয়াব ওয়াজেদ আলী শাহ, টিপু সুলতান প্রমুখ দেশ প্রেমিকদের সাথে নিয়ত থেকেছেন।

-ঃঃ শাদী মুবারক ঃঃ-

হযরত সূফী সাইয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়সী রহঃ সম্ভবতঃ কোলকাতা অবস্থানকালে বিবাহ করেন - মুর্শিদাবাদ জেলার পুনাশী গ্রামের সম্ভ্রান্ত বংশীয় বিদুষী মহিলা মোহতারেমা বিবি ফাতেমা খাতুনের সাথে। বস্তুতঃ বিবি ফাতেমা খাতুন পিতৃহারা ছিলেন খাড়েয়া গ্রামের বাসিন্দা।

বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহাকুমা ও মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহাকুমার মধ্যখানে 'পুনাশী' গ্রাম। কাটোয়া-সালার রেলপথে 'ঝামটপুর বহরান' রেল ষ্টেশনের সন্নিকট- 'সরকার শরীফ আবাদ' ২৬ পরগণার অন্তর্গত পুনাশী শরীফ। তার পূর্ব নাম ছিল 'মনোহর পুর'।[২৩]

১৫৭৩ সালে গৌড় ধ্বংসের পর বহু সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যক্তি, আলেমেদ্বীন, পীর বোযর্গ ব্যক্তিরা বিভিন্ন স্থানে হিজরত করেন। সে সময় শাহ কড়ক রহমাতুল্লাহ বংশধর হযরত শাহ সূফী পীর সাইয়্যেদ আবদুল আযীয রাসুলনোমা, কোতবুল-ইরশাদ, গওসে সামদানী, পদমর্যাদা প্রাপ্ত ব্যক্তি আর আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারেন না। দায়িত্ব প্রাপ্তিতে তিনি স্বাধীন ভাবে তবলীগেদ্বীন প্রচারে প্রবিষ্ট হন। আত্মগোপন তিনি পছন্দ করতেন, তাই তিনি অলখ্যে বনাঞ্চলে অজানায় ছায়ের করতেন। সেখানকার মানুষ ধরা পেলে সেথা থেকে অন্যত্র চলে যেতেন। 'ছায়ের-এলাল্লাহ' কামিয়াবি সামিল করে তালীম তরবিয়াতে অধিকতর মনোনিবেশ করেন।বোযর্গ মনোহর পুর অধুনা পুনাশী গ্রামে আগমন করে বসতি স্থাপন করেন। সাইয়্যেদ আবদুল আযীয শাহ বুড়নীর পীর বা জিন্দাপীর নামে বিখ্যাত।[২৪]

হযরত বুড়নীর পীর চিল্লাকশি করতেন। মায়ের তৈরী নিমের নাড়ু বা সামান্য আহার্য্য নিয়ে চল্লিশদিন মাটির নীচে গর্ত্তের মধ্যে অবস্থান করতেন। বলা ছিল গর্ত্তের উপরে দড়ির চূড়া থাকবে, চল্লিশ দিন অন্তর তিনি লোকালয়ে একবার আত্মপ্রকাশ করে মায়ের দেওয়া আহার্য্য নিয়ে আবার চিল্লায় চলে

---

২৩) হায়াতে-একরাম - ৯-১০ পৃঃ আয়নায়ে-ওয়সী - ১৫৬ পৃঃ।

২৪) হায়াতে-একরাম - ১০-১৪ পৃঃ।

যেতেন। চিল্লা থেকে বেরিয়ে যে দিকে তাকাতেন, সেদিকের সবুজ তাজা ঘাস গাছপালা সব পুড়ে ঝলসে যেত। এমনকি কাঁচা হাড়ী পাতিল রাখলে তাঁর নজরের তীক্ষ্ণ তেজে কাঁচা জিনিস পুড়ে পাকা হয়ে যেত। তাঁর নির্দেশ ছিল - দড়ির চূড়া যে দিন টেনে নোব সে দিন থেকে আর আমাকে কেউ চিল্লার গর্ত্ত থেকে তোলার চেষ্টা করবে না। এক পর্যায়ে তিনি দড়ি টেনে নেন, সে অবধি তিনি চিল্লায় অবস্থান করছেন। সেজন্য তাকে জিন্দাপীর বলা হয়। ' মৎপ্রণীত হায়াতে একরাম' পুস্তকে বিস্তারিত পাবেন।

এ বংশে হযরত শাহ সূফী পীর সাইয়্যেদ খন্দকার একরামূল হক মুর্শিদাবাদী সুম্মা হলদীবাড়ী জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি হযরত সূফী সাইয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়সী রহমাতুল্লাহ এর অন্যতম খলিফা। পরবর্ত্তীকালে হযরত ওয়সী রহমাতুল্লাহ এর পৌত্র হযরত মাসউদার রহমান সাহেবের কন্যা সাইয়্যেদা হুসনে আরার সাথে হযরত সাইয়্যেদ একরামুল হক সাহেবের সেজ সাহেবযাদা হযরত মাওলানা খন্দকার সিরাজুল হক সাহেবের বড় সাহেবযাদা খন্দকার জিয়াউল হক সাহেবের সাথে বিবাহ হয়। তারা উভয়ে হযরত ওয়সী রহমাতুল্লাহ বসতবাড়ীতে অদ্যাবধি বসবাস করছেন।

এ বাড়ীর ভিত্তি ইট হযরত সূফী ওয়সী রহমাতুল্লাহ নিজ খলিফা সূফী একরামূল হক সাহেবকে দিয়ে করিয়েছিলেন। এ বাড়ীর অঙ্গনে হযরত সূফী ওয়সীর নিজ হাতে লাগানো আমগাছ এখনও বিদ্যমান, এ গাছের তলায় তাঁর কন্যা বিবি যোহরা খাতুন কোন কোন সময় যিকির ও মোরাকাবা করতেন।

বাড়ীর দক্ষিণে পুকুর পাড়ে পুনাশীর মসজিদ। এ মসজিদে হযরত ওয়সী পীর মোরাকাবা করতেন—ভিতরে খলিফা সূফী একরামূল হক, বাহিরে আমগাছের তলায় কন্যা যোহরা বিবি। সে ছিল এক মধুর সময়।

-ঃ পরিবার পরিজন ঃ-

'কোতবোল-ইরশাদ' সূফী সাইয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়সী রহমাতুল্লার ঔরসে এবং মোহতারেমা ফাতেমা খাতুনের গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

হযরত ওয়সী রহঃ একমাত্র সাহেবযাদার নাম শাহসূফী সাইয়্যেদ মোস্তাফা আলী রহঃ এবং একমাত্র সাহেবযাদীর নাম সাইয়্যেদা যোহরা খাতুন।

হযরত সাইয়্যেদ মোস্তফা আলী রহমাতুল্লাহ * আরবী, ফার্সী, উর্দ্দু ও ইংরাজী ভাষা ভালোভাবে জানতেন। তিনি 'মোসলেম ক্রনিক্যাল' (ইংরাজী) সংবাদ পত্রে অধিক সময় প্রবন্ধ লিখতেন।

হযরত ওয়সী রহমাতুল্লাহ অবসর গ্রহণের পর উক্ত পলিটিক্যাল পেনশন অফিসে কাজ করতেন। তিনি মুর্শীদাবাদের পুনাশী শরীফ বসবাস করতেন।

সাইয়্যেদ মোস্তাফা আলী সাহেব পুনাশী গ্রামের খন্দকার নেজাবত হোসাঈন সাহেবের সাহেবযাদী বেগম আম্মাতুল বতুল সাহেবার সাথে বিয়ে হয়। তার গর্ভে দু পুত্র ও দু কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। (১) সাইয়্যেদ মাসউদার রহমান সাহেব, (২) সাইয়্যেদ জানে আলম সাহেব। কন্যা - (১) সাইয়্যেদা তামান্না খাতুন, (২) সাইয়্যেদা ফতেমা খাতুন।

হযরত সাইয়্যেদ শাহ সূফী মোস্তফা আলী রহমাতুল্লাহ ও তাঁর মহিয়সী আম্মাজান সাইয়্যেদা ফাতেমা খাতুনের মাজার শরীফ পুনাশী শরীফের 'বুড়নীর পীর' আস্তানায় অবস্থিত। আর তাঁর বুযর্গ আব্বাজানের মাজার ২৪/১, মুনশী পাড়া লেন, মানিকতলা কোলকাতায় দিল্লীওয়ালা কবরস্থানে বিদ্যমান।

হযরত মাওলানা আলহাজ্জ সাইয়্যেদ মাসউদার রহমান সাহেব উচ্চশিক্ষিত মার্জিতরুচির মানুষ ছিলেন। তিনি-প্রথমে কোলকাতায় মোসলেম বেরিয়াল বোর্ডে কর্মরত ছিলেন, এবং পুনাশী শরীফে বসবাস করতেন।

কোলকাতার আলীপুরে এক সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশীয় সাইয়্যেদ গোলাম মহিউদ্দীন সাহেবের সাহেবযাদী সাইয়্যেদা মনোয়ারা বেগমের সাথে তাঁর বিবাহ সুসম্পন্ন হয়।

---

*জনৈক গ্রন্থকার 'গোলাম মোস্তফা আলী' লিখেছেন, তা সঠিক নয় বরং নাম বিভ্রাট বলে।

—রহমানী।

সাইয়্যেদা মনোয়ারা খাতুন ১৯৩৪ সালে ইন্তেকাল করেন, এবং তার মাজার মানিকতলায় দিল্লীওয়ালা কবরস্থানে নিজদাদা শ্বশুর হযরত সাইয়্যেদ সূফী ওয়সী রহমাতুল্লাহ মাজার মোবারকের পশ্চিম পার্শ্বে নিজ দাদাজান সাইয়্যেদ আবদুল আজীজ রহমাতুল্লাহ (১৯২১ মৃত্যু) কবরের কাছেই অবস্থিত। ঐখানেই আবার সাইয়্যেদা মনোয়ারা খাতুনের ছোটবোন সাইয়্যেদা সাকিনা খাতুন ও মদফুন হন। বড়ই পরিতাপের বিষয় হযরত সূফী ওয়সী রহমাতুল্লাহ মাজার সংস্কারের সময় উক্ত কবরগুলো ভেঙ্গে সমতল করে চাতান করেছে, যা ক্ষমার অযোগ্য।[২৫]

সাইয়্যেদ আবদুল আযীয মরহুমের তিনপুত্র; প্রথম - সাইয়্যেদ গোলাম মহিউদ্দীন, দ্বিতীয়- সাইয়্যেদ মঈনুদ্দীন আহমদ।[২৬] তৃতীয় সাইয়্যেদ গিয়াস আহমদ।

সাইয়্যেদ গোলাম মহিউদ্দীন মরহুমের অপর কন্যার বিয়ে হয় ফুরফুরা শরীফের পীর মোজাদ্দেদে-যামান হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী রহমাতুল্লাহ এর দৌহিত্র আলহাজ্জ কাজী মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ সাহেবের সাথে, ইন্সপেক্টর জেনারেল রেজিস্ট্রেশন। বস্তুতঃ পীরের পোতা ও মুরীদের দৌহিত্র আপনাভায়রাভাই।

আলহাজ্জ সাইয়্যেদ মাওলানা মাসউদার রহমান সাহেবের দুপুত্র ও দু'কন্যা রেখে ইন্তেকাল করেন। তাঁর 'কবর' পুনাশী শরীফে 'বুড়নীর পীর' আস্তানায় আব্বা ও আম্মার কাছে অবস্থিত।

---

২৫) মোজাদ্দেদে যামান দাদা হুযুর পীর রহমাতুল্লাহ তৈরী হযরত সূফী ওয়সী রহঃ মাজার ভেঙ্গে এনায়েত পুরী ওয়সী মেমোরিয়াল এ্যাসোসিয়েশনের সহযোগীতায় করেছে। ইতিপূর্বে মাজারে কোন শিরক বিদয়াত কার্য্যকলাপ হতো না; কিন্তু ঐ সময় থেকে শিরক বিদয়াত শুরু হয়েছে। আবার ২০০৫ সালে ওয়সী মেমোরিয়াল এ্যাসোসিয়েশন সুরেশ্বরের বেদাতী পীরের সহযোগীতায় সব ভেঙ্গে আবার মাজার শরীফ বানাতে কাজ শুরু করেছিল। আমরা আইনের সাহায্যে বন্ধ করে দিয়েছি।

২৬) সাইয়্যেদ মঈনুদ্দীন আহম্মদ সাহেবের তিনজন পুত্র ৩) হযরত হাফেয মাওলানা আলহাজ্জ আবুল বাসার মুহাম্মদ বসিরুদ্দীন রহমাতুল্লাহ, ইনি আলিপুর থেকে হিজরত করে ঢাকা ২ নং যদুনাথ বসাক লেন, রথখোলা ঢাকা অবস্থান করছেন। তাঁর চারজন পুত্র সন্তান। তন্মধ্যে মেজ সাহেবযাদা বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের এডভোকেট, স্বনামধন্য বোযর্গ আলহাজ্জ সাইয়্যেদ সূফী আবদুস সালাম সাহেব, মানিকতলা-নিযামপুর-চট্টগ্রাম ও ফুরফুরার সঙ্গে নীবিড় সম্পর্ক। এ বংশের পিতা পুত্র সকলেই ফুরফুরা শরীফের পীর আবু বকর সিদ্দিকী রহমাতুল্লাহ খলিফা।

প্রথম পুত্র সাইয়্যেদ মাহফুজ আলী সাহেব, দ্বিতীয় পুত্র-সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আলী সাহেব। তাঁরা উভয়ে পাকিস্থানের করাচি গমন করেন। অতঃপর তারা উভয়ে বাংলাদেশে ফিরে চট্টগ্রাম বসবাস এখতিয়ার করেন।

প্রথমা কন্যা সাইয়্যেদা সারাহ খাতুন একই বংশের পুনাশী গ্রামের খন্দকার মহিউদ্দীন সাহেবের সাথে বিয়ে হয়। তিনি স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন। পরে উভয়ে ঢাকা বসবাস এখতিয়ার করেন।

তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা সাইয়্যেদা হুসনেআরা সাহেবার শাদী মুবারক হযরত সূফী ওয়সী রহমতুল্লাহ-র পুনাশী শরীফের অন্যতম খলিফা কুতুবুজ্জমান, শাহসূফী পীর সাইয়্যেদ একরামুল হক রহমতুল্লাহ পৌত্র মাওলানা খন্দকার জিয়াউল হক সাহেবের সাথে। তাঁরা উভয়ে পুনাশী শরীফের হযরত ওয়সী রহমতুল্লাহ নিজ বাড়ীতে অবস্থান করছেন। তাদের চার পুত্র ও চার কন্যা বিদ্যমান। ১ম পুত্র খন্দকার মনিরুল হক সাহেব, ২য় পুত্র-খন্দকার রুম্মানূল হক, ৩য় পুত্র খন্দকার মিরাজুল হক, ৪র্থ পুত্র খন্দকার আশরাফুল হক। কন্যা - ১) মোছাম্মৎ আখতারী বাণু, ২) মোসাঃ নিলুফা বেগম, ৩) মোসাঃ জুলেখা খাতুন, ৪) মোসাঃ শাকিলা বানু।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে কুতবুল ইরশাদ শাহ সূফী সাইয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়সী রহঃ পুনাশী শরীফে আগমনের অন্যতম প্রধান ভূমিকা যার ছিল, তিনি সূফী ওয়সী রহমতুল্লাহ বন্ধুজন জনাব খন্দকার মোহাঃ এমদাদুল হক সাহেব। কলিকাতা তালতলায় একটি ইসলামী জলসায় তার সাথে পরিচয় ঘটে। খন্দকার নেজাবত হোসেন সাহেবের আত্মীয়া খাড়েয়া গ্রামের মোহতারেমা ফাতেমা খাতুনের সাথে সূফী ওয়সীর বিবাহ হয়। তাঁর শ্বশুরের উক্ত কন্যা ব্যতীত কোন সন্তান ছিল না। তাঁর স্ত্রীর নানার বাড়ী 'পুনাশী শরীফ' তথায় উভয়ে বসবাস করতেন।[২৭]

হযরত সাইয়্যেদ মোস্তাফা আলী রহমতুল্লাহ সাহেবযাদী সাইয়্যেদা তামান্না খাতুনের শাদী জনাব মুহাম্মদ মোবিন সাহেবের সাথে সুসম্পন্ন হয়। তারা উভয়ের রাজশাহী বসবাস করেন। অপর সাহেবযাদী সাইয়েদা ফাতেমা

---

২৭) হায়াতে-একরাম - ৪৬-৪৭ পৃঃ।

সাহেবের শাদী আপন ফুফাতো ভাই শাহ পুরের সাইয়্যেদ এহসান আহমদ সাহেবের সাথে হয়।

আলহাজ্জ মাওলানা মোস্তাফা আলী রহঃ দ্বিতীয় সাহেবযাদা হযরত সাইয়্যেদ আলহাজ্জ মুহাম্মদ জানে আলম সাহেব-এম,এ,বি-এল। ২৯ নম্বর ওয়ারী, ঢাকা বসবাস করতেন। তিনি ঢাকা সুপ্রীম কোর্টের স্বনামধন্য সিনিয়র এ্যাডভোকেট ছিলেন। সাইয়্যেদ জানে আলম সাহেব ফার্সিভাষার অত্যন্ত সুদক্ষ ছিলেন। (ফার্সিতে এম,এ) তিনি শেষ জীবনে হযরত ওয়সী রহঃ কর্তৃক রচিত "দিওয়ানে ওয়সী" বঙ্গানুবাদ করে বঙ্গভাষা ভাষীদের বিশেষ উপকার করেছেন।

তিনি শাদী করেন - মুর্শিদাবাদের ভরতপুর মহাকুমার জনাব খানবাহাদুর খন্দকার ফযলে হক (ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট) সাহেবের সাহেবযাদী সাঈদা বেগম এর সাথে। যিনি বাংলাদেশের প্রভাবশালী মন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন সাহেবের চাচাতো বোন।

সাইয়্যেদ জানে আলম সাহেবের এক পুত্র ও এক কন্যা। তাঁর একমাত্র পুত্র সাইয়্যেদ শাহেদ আলম সাহেব বার এট-ল, সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশ, ঢাকা। তাঁর কন্যা সাইয়্যেদা সেতারা বেগম বি, এ, সাহেবার শাদী বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অনারেবল মিঃ আবদুর রহমান চৌধুরী সাহেবের সাথে।

সাইয়্যেদা সেতারা বেগম এর ২ কন্যা ও ২ পুত্র সন্তান। সকলেই সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। তন্মধ্যে-রোহেলী রহমান চৌধুরী সাহেবার মাতাহাতে চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার পদুয়ার মল্লিক সোবহান গ্রামে 'সূফী ফতেহ আলী ওয়াইসি মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেন। হযরত 'ওয়সী স্মরণে প্রথম মহিল মাদ্রাসা' প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা শামসুদ্দীন মাঃ জিঃ। *

---

* হযরত মাওলানা শামসুদ্দীন সাহেব মোহাক্কেক আলেমেদ্বীন ও গারাংঙ্গীয়ার হযরত মাওলানা শাহ সূফী পীর আবদুল মজিদ (বড় হযরত) এর ছোট ভাই হযরত মাওলানা শাহ সূফী পীর সাহেবের বিশিষ্ট মুরীদ। ২০০৮ সালে বাঁশের বেড়া ও টিনের চাল বিশিষ্ট মহিলা মাদ্রাসায় আমার মত গোনাহগারকে নিয়ে দুয়া করিয়েছেন। নিজে সঙ্গে করে গারাংগীয়া ও বিভিন্ন স্থানের পীর বুযর্গ ও স্বাধীনতা সংগ্রামী হযরতদের মাজার শরীফ যিয়ারতে নিয়েছেন।
২০১৬ সালের ২৫শে অক্টোবর মিরেশ্বরাইয়ে নিজামপুরের মলইয়াশ শরীফে সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী রহঃ (২৯শে অক্টোবর) মাহফিলের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ আগমন করলে

জনাব সাইয়্যেদ শাহেদ আলম সাহেব মহানগরী ঢাকা বসবাস করেন, এবং তিনি বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের লব্ধ প্রতিষ্ঠ আইনজীবি। তিনি বিবাহ করেন সিলেটের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব, বিচারপতি চৌধুরী এ, এস, ফয়জুল ইসলাম সাহেবের কন্যা বেগম নাসিমা চৌধুরীর সাথে। তাদের ছেলে সাইয়্যেদ সাকিব আলম, ব্যরিষ্টার। মেয়ে সাবরিনা আলম বি-বিএ করার পর গ্রামীণ ফোনে চাকুরী রতা।

হযরত সূফী ফতেহ আলী ওয়সী রহমাতুল্লাহ একমাত্র কন্যা শামসুল বাযেগাতুর দাহর, আরেফায়ে মোকাম্মলা, রাবেয়াতুলঅছের, আফজালুজ্জামানীয়া, হযরত বানু যোহরা খাতুন রহমাতুল্লাহ। তিনি পিতার একান্ত সান্নিধ্য পেয়ে সমস্ত তরীকার সলুক সমাপ্ত করে খেলাফত লাভে অলিয়ে কামেলা হয়ে ছিলেন।[২৮]

মুর্শিদাবাদের টিয়া স্টেশনের বিলপার 'শাহপুর' নামক গ্রামের হযরত সাইয়্যেদ মহাম্মদ হোসেন শাহপুরীর সাথে বিবাহ সম্পন্ন হয়। শাহপুর পুনাশী থেকে ১৩ কি.মি.। সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমীর হুসাঈন বলখ (আফগান) থেকে দিল্লী আসেন। তার আওলাদ সাইয়্যেদ মুহাম্মদ ফিদা হুসাঈন রহমাতুল্লাহ দিল্লী থেকে বঙ্গে এসে মুর্শিদাবাদ জেলার শাহপুর গ্রামে বসবাস এখতিয়ার করেন। সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হোসাঈন রহমাতুল্লার খান্দানকে 'মুনসীবাড়ী' নামে খ্যাত।[২৯]

বিবি সাইয়্যেদা যোহরা খাতুনকে মোজাদ্দেদে-যামন, ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী রহমাতুল্লাহ বাংলার 'রাবেয়া বাসরী' বলতেন।[৩০] তিনি অত্যন্ত উচ্চ দরজার আরেফা ছিলেন, বাংলার বহু আলেম ও আবেদ এমন কি হযরত ওয়সী রহমাতুল্লাহ অনেক খলিফা তাঁর থেকে ফয়েয হাসেল করতেন।

---

২৮) হায়াতে-একরাম - ৪৪ পৃঃ। ২৯) আয়নায়ে-ওয়সী - ১৮৯-১৯০ পৃঃ। ৩০) হায়াতে-একরাম - ৪৪ পৃঃ।

---

* জনাব মাওলানা শামশুদ্দীন বিশেষ আহ্বানে পদুয়ায় মল্লিক সোবহান গ্রামে উক্ত সূফী ফতেহ আলী ওয়সী মহিলা মাদ্রাসায় বিশেষ দুয়ার মাহফিলে খাকছার রহমানীকে বিশেষ সংবর্দ্ধনা জ্ঞাপন ও মানপত্র প্রদান করে কৃতার্থ করেন। এ সংবর্দ্ধনা সভায় আলহাজ্ব আবুল কাসেম চৌধুরী, প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা সোলাইমান কাসেমী প্রমুখ উলামা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত থেকে মানপত্র দুটি পাঠ করেন। মাওলানা শামশুদ্দীন সাহেব বলেন—ফুরফুরা শরীফের সিলসিলার অতন্দ্রপ্রহরী, রাসুল নোমা পীর সূফী ফতেহ আলী ওয়সী রহঃ এর জীবনী 'সীরাতে ওয়সী'র লেখক হযরত মাওলানা মুবারক আলী রহমানী সাহেবকে এ ক্ষুদ্র তোহফা।- সামসুদ্দীন।

সুফী ফতেহ আলী ওয়াইসী মহিলা মাদ্রাসার চারতলা 'সেতারা বিল্ডিং মোহতারেমা রাহলী রহমান সাহেবদের একক অবদান—রহমানী।

এক সময় হযরত সূফী সাহেব ও তার কন্যা হযরত যোহরা খাতুন পৃথক পৃথক পাল্কীতে যাচ্ছিলেন। একস্থানে উভয় পাল্কী নামান হলো। হযরত যোহরা খাতুনের পাল্কী হযরত সূফী সাহেবের পাল্কী থেকে একটু দূরে নামান হয়েছিল। তিনি পাল্কীতে হাত মেরে সূফী সাহেবকে বললেন - আব্বা, এস্থানে গাঁজার দুর্গন্ধ বার হচ্ছে। আমি সহ্য করতে পারছি না। এখান থেকে পাল্কী সরাতে বলুন। সূফীসাহেব সেখান থেকে পাল্কী সরাতে আদেশ করে তদন্ত করতে লাগলেন, লোকেরা বলল - বহু বছর আগে এ স্থানে একজন গাঁজাখোর লোক থাকত। এঘটনা উল্লেখ করে আল্লামা রুহুল আমিন রহমতুল্লাহ লেখেন - যারা আহলুল্লাহ হন, তাঁদের দৃষ্টিশক্তি এরূপ প্রবল হয়ে থাকে। ইহাকে কাশফ বলে।

তাঁরা এক সাহেবযাদা এবং দু'সাহেবযাদী রেখে ইন্তেকাল করেন। তাঁদের উভয়ের মাজার শরীফ শাহপুর বড় পুকুরের উত্তর পাড়ে হিফাযতের সাথে বিদ্যমান।

বিবি সাইয়্যেদা যোহরা খাতুনের পুত্র সাইয়্যেদ এহসান আহমদ মাসুম ও কন্যা দুজন (১) সাইয়্যেদা বিবি হাযেরা (২) সাইয়্যেদা বিবি সিদ্দিকা।

হযরত ওয়সী রহঃ দৌহিত্র সাইয়্যেদ এহসান আহমদ সাহেবের বিবাহ হয় আপন মামাতো বোন সাইয়্যেদা ফতেমা খাতুনের সাথে। তাদের তিনজন পুত্র এবং পাঁচ কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। (১) সাইয়্যেদ আবদুল মাতীন, (২) সাইয়্যেদ ফিরদৌস, (৩) সাইয়্যেদ আবুল বাসার, কন্যা - (১) সাইয়্যেদা সালেহা বানু, (২) সাইয়্যেদা হালিমা বানু। (৩) সাইয়্যেদা এলডিশ বানু (৪) সাইয়্যেদা নাসিমা বেগম (৫) সাইয়্যেদা আঙ্গুরা বেগম।

সাইয়্যেদ ফিরদৌস ও সাইয়্যেদ আবুল বাসার সাহেব বাংলাদেশ (রাজশাহী) এবং সাইয়্যেদা সালেহা বানু ও সাইয়্যেদা হালিমা বানু নিজ স্বামীদের সাথে বাংলাদেশে থাকেন। সাইয়্যেদা হালিমা বানু স্বামী মৌঃ ফয়েয আহমদ সাহেব, 'হক লিল্লাহ', কল্যাণপুর, মহম্মদ পুর, ঢাকা-৭।

সাইয়্যেদ আবদুল মাতীন শাহপুর গ্রামে অবস্থান করতেন। তিনি কিছুদিন নানার বাড়ী পুনাশী শরীফও ছিলেন। তিনি খালাতো বোন সাইয়্যেদা হাশমত

আরা বেগমকে শাদী করেন। তাদের চার পুত্র ও তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করে। সাইয়্যেদ আবদুল মাতীন জাহাঙ্গীর সাহেব হযরত ওয়সী পীরের একটি সুন্দর জীবনী বাংলা ভাষায় ১৯৭৩ সালে লেখেন।

সাইয়্যেদা যোহরা খাতুনের মেয়ে সাইয়্যেদা বিবিহাযেরা বানুর শাদী মুবারক পুনাশী শরীফের খন্দকার আব্দুল হাফিয সাহেবের সাথে সুসম্পন্ন হয়। তাদের এক পুত্র ও চার কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

আর অপর মেয়ে সাইয়্যেদা সিদ্দিকা খাতুনের শাদী মুবারক হয় মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার বিনোদিয়া গ্রামে খন্দকার ফজলে করীম সিদ্দিকী সাহেবের সাথে।

সাইয়্যেদা সিদ্দিকা খাতুনের পুত্র খোন্দকার গোলাম মাহবুব সিদ্দিকী, খোন্দকার গোলাম মাহবুব সিদ্দিকী রহমতুল্লাহ কন্যা বাজেগা খাতুন, (মিহিদানা) ঢাকা, পুত্র খোন্দকার গোলাম মহিউদ্দীন সিদ্দিকী ওরফে (হীরা মিয়া) পোস্ট মাস্টার, শিক্ষিত ও মার্জিত রুচির মানুষ, বিনোদীয়া গ্রামে বসবাস করছেন। পোঃ ও গ্রাম ঃ- বিনোদিয়া, থানা- ভরতপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ, পঃ বঙ্গ।

জনাব খোন্দকার গোলাম মহিউদ্দীন হীরা মিয়ার ছয় পুত্র ও দু'কন্যা (১) খোন্দকার গোলাম মঈনুদ্দীন, (২) খোন্দকার সালাহউদ্দীন, (৩) খোন্দকার মিনহাজউদ্দীন, (৪) খোন্দকার নিজামউদ্দীন, (৫) খোন্দকার সামসুদ্দীন ইলিয়াস, (৬) খোন্দকার নুরুদ্দীন। কন্যা - (১) মোছম্মেৎ গোলেমনজিলা বানু, (২) সিরাজমমুনীরা শাহীনা বানু।

বে-পর্দা বিহারীনি মেয়েদের জন্য কবর যিয়ারত করা জায়েয নয়।

-ঃঃ রাসুলনোমা ঃঃ-

ফানাফির-রাসুল, হযরত সূফী ফতেহ আলী ওয়সী ছিলেন-রাসুলনোমাপীর। এমন আহলেহালের বুযর্গ পীরের সংখ্যা বিরল। আয়নায় প্রতিবিম্বর মতো এ সব পীরেরা আঁকা মাওলা হজরত মুহাম্মদ মোস্তাফা সল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখে থাকেন এদের মধ্যে যারা অন্যকে মুহুর্ত্তে নবীপাকের যিয়ারত করিয়ে থাকেন - বস্তুতঃ তাঁকেই রাসুলনোমা পীর' নামে আখ্যায়িত করা হয়।

কাশফ শক্তি সম্পন্ন পীর ও বোযর্গ, আল্লামা রুহুল আমীন রহঃ স্বীয় পীরের জীবনী (১৯৩৯ সালে প্রকাশিত) পুস্তকে লেখেন;

"আমি আমার চাচা পীর ও মেহেরবান ওস্তাদ সূফী সাহেবের খলিফা হযরত মাওলানা গোলাম সালমানী সাহেবের মুখে শুনিয়াছি, এক দিবস কলিকাতা মাদ্রাসার মোদার্রেস মাওলানা সায়াদাত হোসেন[৩১] সাহেব হযরত সূফী সাহেবের নিকট বসিয়াছিলেন, হযরত সূফী সাহেব একটি হাদিস সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ছিলেন, তখন মাওলানা সায়াদাত হোসেন সাহেব বলিলেন, হুজুর! এই হাদিসটা সহিহ নহে। হযরত সূফী সাহেব বলিলেন - না মাওলানা সাহেব, ইহা সহিহ হাদিস। মাওলানা সাহেব ইহা অস্বীকার করিতে ছিলেন। এমতাবস্থায় হঠাৎ তিনি অচৈতন্য হইয়া গেলেন। হযরত সূফী সাহেব মাওলানা গোলাম সালমানী সাহেবকে বলিলেন - বাবা! তুমি মাওলানার মস্তকে পানি ঢালিয়া দাও। পানি ঢালিবার পর মাওলানা সাহেব চৈতন্য লাভ করিয়া

---

৩১) ফুরফুরাশরীফের ইতিবৃত্ত - ৭৬/৭৭ পৃঃ তালতলা অলিউল্লাহ লেনের বিবিসালেটের মসজিদে উক্ত ঘটনায় হযরত মাওলানা সায়াদাত হোসেন সাহেবের নাম উল্লেখ আছে। সর্বপ্রথম বসিরহাটের আল্লামা রুহুল আমীন রহমাতুল্লাহ বিস্তারিত জীবনী পুস্তকে ড. মতিউর রহমান আয়নায়ে ওয়সী পুস্তকে এবং ডঃ এ. আর. এম. আলী হায়দার সাহেব তার থিসিসে উক্ত মাওলানা সায়াদাত হোসেন সাহেবের ঘটনা লিখেছেন। তিনি খায়ের পুর কবির পুর ওরফে কাহটা KAHTA নামক বিখ্যাত স্থানের অধিবাসী ছিলেন। থানা - সিলাও (Shilao) জেলা নালান্দা বিহার শরীফ। ১৮৮৩-৮৬ ইংরাজী সময়ের মধ্যে উক্ত ঘটনা ঘটেছিল। ১৯১৪ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। কাহটায় সিলাও মসজীদে তাঁর মাজার বিদ্যমানহায়াতে-একরাম-৩১ পৃঃ।

সেখ আহমদ আলী 'হযরত ওয়সীর রাঃ জীবন ও ইতিহাস' পুস্তকের ৩৮ পৃঃ নাম বিকৃতি করেছেন। টাইপ ভূল নয় পাঁচ স্থানে মৌলানা সাহাদাৎ হোসেন নাম উল্লেখ করেছেন। কলিকাতা মাদ্রাসা আলীয়ার মোদার্রেস মাওলানা সায়াদাত হোসেন কিভাবে সাহাদাৎ হোসেন হলো? খোদা জানে কেমন গবেষক?

বলিলেন - হাঁ সূফী সাহেব, হাদিসটা নিশ্চয় সহিহ। মাওলানা সাহেব চলিয়া গেলে, ইনি হযরত সূফী সাহেবকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ ইহাতে হযরত সূফী সাহেব বলিলেন — ইনি একটি হাদিসের সহিহ হওয়া অস্বীকার করিতে ছিলেন। এই হেতু আমি তাঁহার উপর এস্তেগরাকের ফয়েয নিক্ষেপ করতঃ হযরত নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জিয়ারত করাইয়া দিলে; হযরত নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে সায়াদাত হোসেন! ইহা আমার সহিহ হাদিস।"

ইহা শুনিয়া মাওলানা সাহেব উক্ত হাদিসের সহিহ হওয়া স্বীকার করিয়া লইবেন।[৩২] আল্লামা পীর রুহুল আমীন রহমতুল্লাহ আরও বলেন —

"আমি আমার চাচা পীর হযরত মাওলানা শাহ একরামোল হক মুর্শীদাবাদী সাহেবের মুখে শুনিয়াছি — পাঞ্জাবের নকশাবন্দীয়া তরিকার গদ্দিনশীন পীর এক সময় কড়েয়ার আহমদ কশাইয়ের মসজিদে হযরত সূফী সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন, ইহাতে ইনি তাহাকে কলিকাতা আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে তিনি বলেন, আমি আমার শাগরেদ দুই মাওলানার নিকট আপনার একটি কথা শুনিয়া কয়েক বৎসর হইতে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করার আকুল আকাঙ্খা হৃদয়ে পোষণ করিতে ছিলাম; কিন্তু দারিদ্রতা হেতু আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে এত দেরী হইয়াছে। হযরত সূফী সাহেব বলিলেন, সে কি কথা? উক্ত পীর সাহেব বলিলেন, আমার দুই শাগরেদ মাওলানা এক সময় আপনার খেদমতে এই মসজিদে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে, আপনি মুরীদগণকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিয়ারত করাইয়া দিয়া থাকেন।

আমার শাগরেদদ্বয় আপনাকে বলেন— আপনি নাকি মুরিদগণকে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জিয়ারত করাইয়া দিয়া থাকেন? তদুত্তরে আপনি বলিলেন, হ্যাঁ, আপনারা যদি ইচ্ছা করেন, তবে আমার 'অসিলা ধরিয়া নিয়ত' করিয়া বসুন। কিছুক্ষণ পরে আপনি তাঁদের উভয়কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা কি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিয়ারত লাভ করিতে পারিয়াছেন? তাঁহারা বলিলেন, না। তখন আপনি সজোরে বলিয়াছিনেন, কি হৃদয় কাঠিন্য। অমনি উভয়ে হযরত নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

৩২। হযরত পীর সাহেবের বিস্তারিত জীবনী-

এর জিয়ারত লাভ করেন। আমি তাহাদের এই কথা শুনিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অতিশয় আগ্রহশীল ছিলাম। খোদার অনুগ্রহে আমার দীর্ঘ দিনের বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। এক্ষণে আপনি বয়য়ত করুন। হযরত সূফী সাহেব বলিলেন, আমি আপনাদের দরবারের একটি নগণ্য গোলাম, ইহা আমি বেআদবি ধারণা করি। তিনি ১৬ দিবস পরে একদিন খাওয়ার সময় বিনীত ভাবে বলিলেন, আমি যে উদ্দেশ্যে আসিয়া ছিলাম, তাহা কি পূর্ণ হইবে না? তখন হযরত সূফী সাহেব ঝুটা হাত তাহার পৃষ্ঠের উপরে দিয়া বলিলেন— আচ্ছা আমি আপনাকে আমার সিলসিলায় দাখিল করিয়া লইলাম। তিনি বলিলেন—আমি দরিদ্র মানুষ, হয়তো আপনার খেদমতে আর আমার আসার সুযোগ নাও হইতে পারে। কি করিয়া আপনার জিয়ারত লাভ করিব? হযরত সূফী সাহেব বলিলেন- আপনি যখন ইচ্ছা করিবেন, তখনই আমার সাক্ষাৎ পাইবেন। (ইনশাআল্লাহ)"[৩৩]

হযরত সূফী সাহেব ফুরফুরার পীর সাহেবকে সমধিক কাশফ শক্তি সম্পন্ন ধারণা করিতেন। "এক দিবস তিনি ফুরফুরার হযরতকে বলিলেন, বাবা, তুমি আমার অসিলা দিয়া হযরত নবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যিয়ারাতে বসিয়া থাক এবং তাঁহার সহিত যিয়ারত হইলে অমুক বিষয়টি জিজ্ঞাসা করিও। ফুরফুরার হযরত পীর সাহেব হযরত নবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যিয়ারত লাভ করিয়া সেই বিষয়টির উত্তর জানিয়া লইলেন।"[৩৪]

কুতুবুজ্জমান শাহসূফী একরামূল হক রহঃ মুর্শিদাবাদী বলেন — "আমার পীর ও মুর্শিদ হযরত সূফী ফতেহ আলী ওয়সী রহমাতুল্লাহ আলাইহির হালাত ও মেজাজ যখন খোশ থাকত, তখন তিনি আমাকে তাঁর পিছনে মুরাকাবায় বসিয়ে চারি তরীকার পীরগণের ও হযরত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যিয়ারত করাতেন।"[৩৫]

---

৩৩) হযরত পীর সাহেবের বিস্তারিত জীবনী - ৩১-৩৩ পৃঃ।

৩৪) প্রাগুক্ত ঃ- ৩৩ পৃঃ। ফুরফুরা শরীফের ইতিবৃত্ত - ৭৮ পৃঃ।

৩৫) হায়াতে-একরাম - ৪১ পৃঃ ফুরফুরা শরীফের ইতিবৃত্ত - ৭৮

এক সময় একজন লোক বিবি সালেটের মসজিদ হযরত সূফী সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলেন - হুযুর! আমি দরুদ শরীফ পড়িয়া থাকি, হযরত নবী ﷺ ছায়া দেখতে পাই, কিন্তু তাঁর আকৃতি দেখতে পাই না, এর কারণ কি? তিনি বলেন - 'দরুদ শরীফ কিভাবে পড়ে থাকেন?' লোকটি বলেন আমি 'আল্লা হুম্মা সাল্লিআলা মোহাম্মাদিন' পড়ে থাকি। হযরত সূফী সাহেব বলেন - 'আল্লাহুম্মা স্বল্লিআলা সাইয়্যেদিনা মোহাম্মাদিন' বলে আমার অসীলা ধরে চোখ বন্ধ করে দরুদ শরীফ পড়ুন। তিনি তদ্রুপ করা মাত্রই হযরত নবী করিম ﷺ যিয়ারত নসিব হয়। সুবহানাল্লাহ।

এহেতু তিনি 'রাসুলনোমা' পীর নামে অভিহিত হন। এমন রাসূল-নোমা পীর পাওয়া দুর্লভ। পীরগণের জীবনী পাঠে জানা যায় কতক পীর এমন 'রাসুলনোমা' ছিলেন।[৩৬] এমন রাসুলনোমা পীরগণের কিঞ্চিত পরিচয় পরিশিষ্টে-২ আলোচনা করেছি।

৩৬) হযরত পীর সাহেবের বিস্তারিত জীবনী ৩৩-৩৪ পৃঃ ফুরফুরা শরীফের ইতিবৃত্ত - ৭৯।

কাশ্‌ফ ও কারামত

কাশফ ও কারামত ‘অলি-উল্লাহ’ হওয়ার মাফকাঠি নয়। তবে কাশফ কারামত ‘বরহক’। নবী-রাসুলগণের ‘মোজেজা’ অভ্রান্ত। অলিউল্লাহদের কাশফ-কারামত অভ্রান্ত নয়। নবী রসুলদের মোজেজা প্রকাশ করা ওয়াজেব আর পীর বোযর্গদের কাশফ কারামত গোপন করা ওয়াজেব। তাই তো হাক্কানী পীর বোযর্গরা কাশফ কারামতের কায়েল নয়, তারা গোপন করতে চায় কিন্তু অজান্তে ছিটেফোঁটা বেরিয়ে পড়ে। ঘরের ভিতরের আলোকছটা দরজা জানলার ফাঁক দিয়ে যেমন বেরিয়ে যায়।

মায়ের সাথে মহাসফরে বেড়িয়ে পড়ে - স্বদেশ ও স্বজন হারা মানুষটির সারাটি জীবন কাশফ ও কারামতে ভরা। তাঁর বড় কারামত শরিয়তের তিনি ছিলেন পূর্ণ অনুসারী, সুন্নতে-নবাবীর সার্থক উত্তরাধিকারী নফল-মোস্তাহাব, মোস্তাহাসান গুলোকেও তিনি কখনও অবহেলা করেননি। কোলকাতার মত শহরে থেকে সে যুগে ‘সূফী’ খেতাবে ভূষিত হওয়া হযরত ওয়সী রহমাতুল্লাহ মস্তবড় কারামত।

আর এ কাশফ কারামতের বাড়াবাড়িতে অনেক পীর বোযর্গদের জীবন চরিত কালিমাময় করেছেন কিছু লেখক। আমরা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিশ্বস্ততার ভিত্তিতে সংক্ষেপ আলোচনা করছি, বর্ণনা কারীর বর্ণনাকে সত্য মনে করে।

কোলকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী সেখ খোদা বকস সাহেব থেকে আল্লামা রুহল আমীন রহমাতুল্লাহ বর্ণনা করেন — হযরত সূফী সাহেবের জনৈক মুরীদ তাঁকে বলতে থাকেন, হুযুর! আমি এত পরিশ্রম করি কিন্তু আমার ‘কলব’ জারি হচ্ছে না। তিনি বলেন — তুমি কি কোন সুদখোরের যিয়াফত খেয়ে থাক? সে ব্যক্তি বলল, হ্যাঁ, আমার জামাই সুদ খোর, তার দাওয়াত খেয়ে থাকি। তিনি বলেন, এ জন্য তোমার কলব জারি হচ্ছে না, অতঃপর তিনি তাকে লক্ষ্য করে বলেন— ‘তুমি এই বিছানার দিকে লক্ষ্য কর।’ তাঁর তাওয়াজ্জহ প্রদানে উক্ত বিছানাটি বিকম্পিত হতে থাকে।

সূফী সাহেব বলেন বিছানা আল্লাহতায়ালার নামের ফয়েযে বিকম্পিত হচ্ছে, কিন্তু হারাম ভক্ষণে তোমার হৃদয় এমন কলুষিত যে, কম্পিত হলো না।[৩৭]

'তাকওয়া পরহেজগারী' সূফীদের অঙ্গভূষণ, 'হালাল রুযী' সূফীদের অলঙ্কার। সত্যবাদীতা' সূফীদের মুকুটমণি, লজ্জা তাদের চোখের পর্দা।

একদিন সূফী সাহেব পাল্কীতে যাওয়ার সময় বিহারাকে সাপে দংশন করে। তিনি বলেন, কোনভয় নেই, তোমরা চলতে থাক। সূফী সাহেব কুওয়াতের ফয়েয দ্বারা বিষ আকর্ষণ করে জমিতে দাফন করে দিলেন, অমনি বিহারা সুস্থ হয়ে যায়।

আল্লামাপীর রুহল আমীন রহমাতুল্লাহ বর্ণনা করেন— খুলনা জেলার শোলপুর যুগিহাটী গ্রামের মরহুম মৌলভী সায়েম[৩৮] সাহেব থেকে লেখেন— একদিন মগরিবের নামাযের পর এক মসজিদে হযরত সূফী সাহেবের কাছে মোরাকাবা শিক্ষা করতাম। মসজিদে আলো জ্বালা ছিল না। এ অন্ধকারের মধ্যে একজন তালেবকে কে যেন চপেটাঘাত করে। পার্শ্বের লোকটি মেরেছে ধারণায়, মোরাকাবার শেষে সূফীসাহেবের খেদমতে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে; কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি অস্বীকার করতে থাকে।

হযরত সূফী সাহেব এরশাদ করেন— একটি জ্বিন আমার কাছে তাওয়াজ্জুহ গ্রহণ করছিল, আর তুমি তার শরীরে পা রেখেছিলে এজন্য সেই জ্বিনটি রেগে চপেটাঘাত করেছে।

হযরত সূফী সাহেব কেবলার বহু সহস্র জ্বিন মুরীদ ছিল। কেহ জ্বিনগ্রস্ত রোগীর জন্য তাঁর কাছে উপস্থিত হলে, তিনি বলতেন, আমার সালাম তাকে বলে দাও, এতেই জ্বিন একেবারেই চলে যেত।

তার রোগ 'সলব' করার অত্যান্ত শক্তি ছিল, তিনি আঙ্গুল ইশারা করলে, লোকের পীড়া আরোগ্য হয়ে যেত।[৩৯]

---

৩৭) প্রাগুক্ত - ৩৩-৩৪ পৃঃ প্রাগুক্ত - ৭৯।

৩৮) হযরত ওয়সীর রাঃ জীবন ইতিহাস পুস্তকের ৩৯ পৃঃ - 'মৌলভী শ্যাম সাহেব' লিখেছেন, হবে মৌলভী 'সায়েম' সাহেব। ৩৫ পৃঃ ১০ ছত্রে 'তাহা জোদ' হবে না, হবে 'তাওয়াজ্জোহ'। ধন্য ডকটর সাহেব - 'কোথা আব্বাস আর কোথায় কিনা গাবগাছ।'

৩৯) ফুরফুরা শরীফের ইতিবৃত্ত - ৭৯-৮০ পৃঃ হঃ পীর সাহেবের জীবনী- ৩৫-৩৬ পৃঃ।

হযরত মাওলানা শাহসূফী আবদুল হাই মিজগ্রাম, মুর্শীদাবাদ, রহমাতুল্লাহ বর্ণনা করেন—[৪০]

কুতবুল ইরশাদ হযরত সূফী সাইয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়সী রহমাতুল্লাহ একসময় সুন্দর গঞ্জহাটে তশরিফ আনেন। তখন খোরাসানী হযরত জনৈক মুরীদের বাড়ীতে কিছুকাল তশরিফ রাখেন। সে সময় প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, রাহেরবন্দে (পরগণা) এক গওস্ তশরিফ এনেছেন। অল্প সময়ের মধ্যে উক্ত সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ায় খোরাসানী হযরত তদীয় খলিফা পাহাড়ী শাহসাহেব এবং মাওলানা (শাহ কসিমুদ্দীন রহমাতুল্লাহ) সাহেবের ওয়ালেদ সাহেব ও কতিপয় আরও মুরীদানসহ কমচিবাড়ী হতে সুন্দর গঞ্জে গওস সাহেবেরর সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হন।

গওসসাহেব খোরাসানী হযরতকে দেখে নিজ জাম্বিল থেকে কয়েকটি 'চাউল' বার করে খোরাসনী হযরতের হাতে দিয়ে বলেন — খাইয়ে (খান)। খোরাসানী হযরত খেয়েই আত্মহারা হয়ে গেলেন। তাঁর হৃদয় পূর্বাপেক্ষা অধিকতর পূণ্যলোকে পরিণত উজ্জ্বল হয়। তিনি গওস সাহেবের কাছ থেকে উচ্চতর ফয়েয পেয়ে তাকে কামিল বুযর্গ মনে করে তাঁর খিদমতে থেকে গেলেন।

একদিন গওস সাহেব খোরাসানী হযরতকে নদী বিহারের জন্য আদেশ করেন। তাঁর ইরশাদ মুতাবিক কতিপয় মুরীদসহ খোরাসানী হযরত ও 'গওস' সাহেব নৌকারোহনে খরস্রোতা নদীতে ভ্রমণ করতে থাকেন। যখন নৌকা তরাঙ্গায়িত নদীবক্ষে নাচতে নাচতে চলতে থাকে। তখন গওস সাহেব— খোরাসানী হযরতকে বলেন— হযরত, আমি এখন যাই? খোরাসানী হযরত ফরমান, যান। 'গওস' সাহেব নদীবক্ষে ঝাঁপ দিয়ে নদীর পানির উপর দাঁড়িয়ে পুনঃ বলেন— আমি যাই? খোরাসানী হযরত তদুত্তর বলেন— যান। এবার হাঁটু পর্য্যন্ত ডুবলেন। এভাবে গলা অব্দি ডুবে বলেন— এবার আমি যাই?

৪০) হযরত মাওলানা আবদুল হাই সিদ্দিকী সিজগ্রাম ইনি হযরত ওয়সী পীরের আওয়াল খলিফা শাহ সূফী মাওলানা আবদুল হক সিজগ্রাম রহমাতুল্লাহ এর সাহেবযাদা এবং হযরত ওয়সী রহমাতুল্লাহ অন্যতম প্রধান খলিফা ফুরফুরা শরীফের পীর আবু বকর সিদ্দিকী রহমাতুল্লাহ খলিফা। বরাত - আল্লামা পীর রূহল আমীন রহমাতুল্লাহ কৃত হযরত পীর সাহেবের বিস্তারিত জীবনী - খলিফাদের তালিকা দেখুন।

যান। বলার সাথে সাথেই গওস সাহেব গভীর পানিতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তদ্দর্শনে খোরাসানী হযরত আত্মবিহ্বল চিত্তে নদী বক্ষে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হলেন। নৌকাস্থ ব্যক্তিগণ - কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় অসম্ভব কারামত দর্শন করে বিমোহিত হয়ে গিয়েছিলেন। সম্বিত ফিরে পেয়ে খোরাসনী হযরতকে প্রবোধ দিয়ে বলতে লাগলেন— আপনি পাগল ফকিরের সাথে ডুবে মরতে যাবেন কেন? ক্ষান্ত হোন। অতঃপর খোরাসনী হযরত নদীর তীরে উঠে গওস সাহেবের মহব্বতে অধীর হয়ে নদীর কিনারা ধরে অন্বেষণ করতে থাকেন। কিছু দূর গিয়ে দেখতে পান একজন পাগল ফকির কতকগুলি ফুলের মালা গলায় দিয়ে নদীর তীরে বসে আছেন। খোরাসনী হযরত তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি এ পথে একজন 'গওস সাহেব'কে যেতে দেখেছেন কি? তিনি বলেন— কোন গওস সাহেব? খোরাসনী হযরতের কাছে সব শুনে তিনি বলেন— 'কি ভালো হতো, যদি আপনি তাঁর সাথে নদীতে ডুবতেন। ইনশা আল্লাহ্ আপনি মনযিলে মকসুদে পৌঁছে পূর্ণ কামালিয়াত হাসিল করতে পারতেন।' এতদশ্রবনে খোরাসানী হযরত পূর্বাপেক্ষা আরও আত্মহারা হয়ে আকুলপ্রাণে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে ফিরে দেখেন ঐ পাগলবেশী বুযর্গ তথায় আর নেই। তিনি বুঝতে পারলেন, এ ফকিরই নিশ্চয় 'গওস সাহেব'। তখন তিনি অনুতপ্ত হৃদয়ে তদীয় প্রধান খলিফা পাহাড়ী শাহ সাহেব। শাহ কসিমুদ্দীন সাহেবের ওয়ালেদ, সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে নানা স্থানে গওস সাহেবের অন্বেষণে ঘুরে ঘুরে ভুটানের এক পাহাড়ে গিয়ে যিয়ারত লাভ করেন। এ স্থানে হযরত গওস সাহেব খোরসানী হযরতকে পূর্ণ সল্যুক শিক্ষাদানে আদেশ করেন— আপনি রংপুর, গাইবান্ধা প্রভৃতি অঞ্চলে গিয়ে হিদায়েত করেন। এই তাপস প্রবর সওসে সামদানী কুতবুল ইরশাদ, শাহসূফী পীর সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়সী হানাফী ক্বাদরী, চিশতী, নকশাবন্দী ও মুজাদ্দাদী রহমাতুল্লাহ।[৪১]

---

৪১) মৎপ্রণীত হায়াতে একরাম-৩৭-৩৯ পৃঃ। ফুরফুরা শরীফের ইতিবৃত্ত - ৮৩-৮৪ পৃঃ (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত) বরাতঃ- শাহ নসিহাতুল্লাহ রহমাতুল্লাহ কৃত শাহ কসিমুদ্দীন রহমাতুল্লাহ জীবনী থেকে, হায়াতে ওয়সী ৪১-৪৪ পৃঃ। ডঃ আল্লামা শহীদুল্লাহ - 'ইসলাম প্রসঙ্গ' ১১৩-১১৪ পৃঃ আর খোরাসানী হযরত মৌলানা শাহ সাইয়্যেদ কাসিম রহমাতুল্লাহ - ইসলাম প্রসঙ্গ - ১১৩ পৃঃ। শাহ কসিমুদ্দীন রহঃ (পাকুড়িয়া শরীফ, রংপুর) আমি লেখক তার মাজার শরীফ জিয়ারত করেছি। এখানেই মুর্শিদাবাদের পুনাশীর পীর শাহ একরামুল হক সাহেবের এক সাহেবযাদার মাজার আছে, উক্ত শাহযাদার কবর শাহ কসিমউদ্দীন রহমাতুল্লাহ পার্শ্বেই দেওয়া হয়। পরদিন দেখা গেল শাহযাদার কবর ৩/৪ হাত সরে গিয়েছে - অদ্যাবধি ঐ অবস্থায় আছে। শাহ কসিমুদ্দীন রহমাতুল্লাহ এর খলিফা শাহ নসিহতুল্লা, ইনিই শাহ কসিমউদ্দীন রহমাতুল্লাহ জীবনীতে উক্ত গওস সাহেবের ঘটনা লিখেছেন।

আমি (গ্রন্থকার) মুর্শিদাবাদী সুম্মা হলদীবাড়ীর পীর সূফী একরামূল হক রহমাতুল্লাহ ছোট সাহেবযাদা শাহসূফী খোন্দকার মকসুদল হক (মুর্শিদাবাদ, পুনাশী) সাহেবের মুখে শুনেছি, তিনি বলেন— আমাদের পুনাশী শরীফে সূফী ফতেহ আলী ওয়সী রহমাতুল্লাহ খিদমতে চট্টগ্রামের বাসিন্দা কালো উস্তাদজী নামে একজন খাদিম বার বছর ছিলেন- হঠাৎ একদিন সূফী ওয়সী পীর রহমাতুল্লাহ ফরমান যে— 'উস্তাদজী সাহেব, বিবাহ করে স্ত্রীকে রেখে আসেন, এতদিন কেন বলেননি?' উস্তাদজী বলেন— হুযুর! আপনার খিদমতে এসে সব ভুল হয়ে গেছে। সূফী সাহেব বলেন— 'উস্তাদজী! আপনার স্ত্রীর অন্যত্র বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, আপনি কি তাকে ভালো বাসেন? বিবিকে কি পেতে চান?'

একথা শুনেই উস্তাদজীর প্রেমের আগুন ঘৃতাহুতির ন্যায় দপ করে জ্বলে উঠলো। কেঁদে কেঁদে বলতে থাকেন- হুযুর! আমার বিবি খুব ভালো, আমি তাঁকে ভালোবাসি। আমার বিবিকে পেতে পারি সে উপায় করে দিন। উপস্থিত ব্যক্তিরা ও সূফী সাহেবকে অনুরোধ করতে থাকেন। অগত্যা ওয়সী পীর সাহেব উস্তাদজীকে নিজের বগলের নিচে চেপে ধরে একটা কাপড় দিয়ে ঢেকে পিছন দিকে (পাছায়) কয়েকটি চপেটাঘাত করে বলেন— যাও! যাও!! যাও!!! সকলেই উস্তাদজীকে আর তথায় দেখতে পেলেন না।

ওদিকে উস্তাদজী সাহেব দেখলেন যে - শ্বশুরবাড়ীর সন্নিকটে হাযির হয়ে গেছেন। বহুলোক তথায় বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত। কয়েকজন আত্মীয় তাকে 'দামাদ মিয়া' বলে চিনতে পেয়ে বললেন— 'আপনি আজ বারো বছর নিরুদ্দেশ। তাই আপনার স্ত্রীর অন্যত্র বিবাহ ঠিক করা হয়েছে। শিঘ্র আসেন, পাত্র (বর) এসে গেছেন, মোল্লাজী বিয়ে পড়ানোর জন্য তৈরি।' উস্তাদজী তাড়াতাড়ি শ্বশুর বাড়ী হাযির হলেন, সকলে তাকে চিনতে পারলেন। যথা সময়ে হাযির হওয়ার জন্য উস্তাদজীর স্ত্রীর আর উপস্থিত পাত্রের সাথে বিয়ে হয়নি।

এমন বিরলঘটনা অতি উচ্চ পর্যায়ের পীর বোযর্গদের দ্বারাই কেবল সম্ভাব, কয়েকজন বোযর্গের জীবনে এমন ধরনের ঘটনার নজির পাওয়া যায়।

হযরত মোহাজেরেমক্কি শাহসূফী পীর হাজী এমদাদুল্লাহ রহমাতুল্লাহ খেদমতে জনৈক আলেম সাহেব তাঁর কাছে শেকায়েত করেন— 'হুযুর! কি সব পীরদের

সম্বন্ধে বলা হচ্ছে ভারতবর্ষ থেকে মক্কা শরীফে এসে নামায পড়ে, মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার মাইল পথ যায়।' হযরত হাজী সাহেব উক্ত মাওলানা সাহেবের হাত ধরে মাদ্রাসা সওলাতিয়া থেকে খানায়েকাবায় এসে দু'রাকায়াত নামায পড়ে আবার মাওলানা সাহেবের হাত ধরে অল্পদূরে পাহাড়ের চড়াই উৎরাই পার হয়ে চোখ খুলে দেখতে বললেন, দেখেন উভয়ে মদিনা মনোয়ারায় হুযুরের রওযা শরীফে হাযির। যিয়ারত করে আবার মাওলানার হাত ধরে হাজীসাহেব কিবলা অতি অল্প সময়ে খানায়ে কাবায় হাজির হলেন। মাওলানা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে হযরত হাজী সাহেবের কাছে ক্ষমা প্রার্থী হন। 'ফুরফুরা শরীফের ইতিবৃত্ত' পুস্তকে আরও এমন বাস্তব ঘটনা আমি লিখেছি।

এক সময় একজন লোক বিবি সালেটের মসজিদে হযরত সূফী ওয়সীর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন— হুযুর! আমি দরুদ শরীফ পড়ে থাকি, হযরত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ছায়া দেখতে পাই, কিন্তু তাঁর আকৃতি দেখতে পাইনা, এর কারণ কি? তৎশ্রবণে তিনি বললেন— তুমি দরুদ শরীফ কিরূপে পড়ে থাকো? লোকটি উত্তরে বললো, আমি "আল্লাহুম্মা সাল্লেআলা মোহাম্মাদিন" পড়ে থাকি। হযরত সূফী সাহেব বললেন, আল্লাহুম্মা সাল্লেআলা সাইয়্যেদিনা মোহাম্মাদিন বলে আমার অসিলা ধরে চোখ বন্ধ করতঃ দুরুদশরীফ পড়। তিনি সে মত পড়া মাত্রই হযরত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিয়ারত নসিবে ঘটে যায়।[৪২]

তাঁর বিমার সলব করার অত্যান্ত শক্তি ছিল, তিনি আঙ্গুলের ইশারা করলে, লোকের পীড়া আরোগ্য লাভ হতো, তাঁর শাশুড়ীর পায়ে বেদনা ছিল। বহু চিকিৎসাতে উপশম হয় নাই। হযরত সূফী ওয়সী সাহেব একদিন বেদনাস্থল ধরে বললেন, বেদনাত নেই! অমনি বেদনা সুস্থ্য হয়ে যায়।[৪৩]

তিনি ছিলেন, আশেকে-রাসুল, ফানাফির রাসুল। একদা এক ব্যক্তি হযরত সূফী ওয়সী সাহেবের খেদমতে হাযির হয়ে সবিনয়ে নিবেদন করেন যে— "হুযুর! আমি ৫০০ শত টাকা ঋণগ্রস্থ, সে জন্য বিশেষ চিন্তিত ছিলাম। গতরাতে চিন্তামগ্ন হয়ে নিদ্রিত হয়ে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যিয়ারত নসিব হয়।

---

৪২) হযরত পীর সাহেবের বিস্তারিত জীবনী - ৩৪ পৃঃ। ৪৩) প্রাগুক্ত - ৩৬ পৃঃ।

তাঁকে আমার ঋণের বিষয় অবগত করালে তিনি আমাকে আপনার খেদমতে আসতে আদেশ দেন।' আশেকে রাসুল হযরত ওয়সী সাহেব স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনে বিনাবাক্যব্যয়ে তৎক্ষণাৎ নিজ থেকে ৫০০ শত টাকা তাকে দিয়ে ঋণ মুক্ত করেন।[৪৪]

একসময় সূফী ফতেহ্ আলী ওয়সী সাহেব ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দিকী সাহেবকে একত্রে একটি মসজিদে জুময়ার নামায পড়ার আদেশ করেন। পীর ও মুরীদের নীবিড় সম্পর্ক থাকলেও, হঠাৎ এমন আদেশে তিনি ঘাবড়ে যান। উক্ত মসজিদের এমাম সাহেব কুমিল্লার মানুষ ছিলেন। তিনি ঐ দিন উপস্থিত ছিলেন না। ফুরফুরার হ্যরত মনে ভাবলেন - আমার পীর সাহেব হয়তো আমাকে এমামতী করার জন্য একসাথে নামায পড়ার কথা বলেছেন। পীরের আদেশ অবশ্য পালনীয় মনে করে যথা সময়ে ভয়ে ভয়ে মসজিদে ঢুকছেন। অমনি তিনি দেখতে পান যে- হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম ভিতরে বসে আছেন। [৪৫] তিনি আবেগভরে তাঁকে দেখতে লাগলেন কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তিনি বুঝতে পারলেন— তিনি তাঁর পীর সূফী ফতেহ আলী ওয়সীকেই দেখছেন। ফুরফুরার হযরত তখন উপলব্ধি করলেন যে— 'ফানা ফির রাসুল' কিভাবে 'ত্বয়' হয় তার প্রত্যক্ষ তালীম দিতেই মসজিদে তাঁর সাথে নামায পড়তে বলেছিলেন।[৪৬]

---

৪৪) প্রাগুক্ত ৩৯-৪০ পৃঃ- এ কাশফ প্রসঙ্গে আল্লামা রূহল আমীন রহমতুল্লাহ অতঃপর দুটি ঘটনা লিখেছেন - "এ সিলসিলার শাহ তালেবুল্লাহ সাহেব খুলনা শোলপুরে উপস্থিত হলে তথাকার বড়মিয়া ইউসুফ আলী সাহেব নিজ পিতার গোরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করেন; শাহ সাহেব কাশফ করে বলেন, আপনার বৃদ্ধ পিতাকে দেখছি যে, তিনি নদীর ধারে বসে ওযু করতে দাড়ী খেলাল করছে। বড় মিয়া বললেন আমার পিতা ৪০ বছর পূর্বে মারা গিয়েছেন, তিনি ওয়াক্তিয়া নামায মসজিদে পড়তেন, ও প্রত্যেক ওয়াক্তে নদীর পাড়ে বসে ওযু করতেন। শাহ সাহেব তাই জানতে পেরেছেন। শোলপুরের মৌলভী সায়েম সাহেব বলেছেন— 'ফুরফুরার অন্ধ মাওলানা শাহ আবদুল ওয়াজেদ সাহেব আমাদের গ্রামে তশরিফ এনেছিলেন - একটি লোক এসে বললো, হুযুর! আমি এস্থানে বাড়ী করেছি, সে বাড়িতে বসবাস করার সময় থেকে বিপদ আপদ লেগেই আছে। আপনি একটু তদন্ত করে দেখুনত।' শাহ সাহেব কাশফ করে দেখেন যে, সে বাড়ীর উপর দিয়ে একটা সরু খাল প্রবাহিত হচ্ছে। আর একটি উলঙ্গিনী পরী উপুড় হয়ে উক্ত খাল থেকে পানি পান করছে। সে গ্রামের বৃদ্ধ লোকদিগকে ডেকে খালের অবস্থা জিজ্ঞাসা করায় তারা বললো। আমরা পুরুষ পরম্পরায় শুনে আসছি। এ স্থানে একটা খাল ছিল। শাহ সাহেব বললেন, ঐ খাল থেকে আগে জ্বিন পরীরা পানি পান করতো। তাদের রীতি এই যে, তারা নিজেদের বিচরণ স্থলে সময় সময় এসে থাকে, তাদের দৈহিক অগ্নির তাছিরে লোকের উপর বিপদ এসে থাকে। এ দুটি ঘটনা হযরত সূফী সাহেবের কন্যার কাশেফের তুল্য। প্রাগুক্ত - ৩৯-৪০ পৃঃ।

৪৫) মৌলভী আবদুস সাত্তার কৃত - ইমামুল মোসলেমীন, হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী পীরকেবলার জীবনচরিত - ৪১ পৃঃ।

৪৬) প্রাগুক্ত - ৪৬-৪৭ পৃঃ উক্ত মৌলভী আবদুস সাত্তার (ঢাকা) সাহেব ফুরফুরার হযরত পীর সাহেবের খাস খাদেম ছিলেন। তখন তিনি কোলকাতায় কর্মরত ছিলেন।

মৌলভী আবদুস সাত্তার সাহেব বলেন— একদিন হযরত সূফী ওয়সী সাহেব ফুরফুরার পীর সাহেবকে 'তাওয়াজ্জুহ' দিচ্ছিলেন, আর তা পশ্চাৎদিক থেকে কে যেন টেনে নিতে ছিল। তিনি ওয়সী হযরতকে জ্ঞাত করালে তিনি তাঁর দুজন খলিফাকে মোরকাবায় বসে কাশফ করে ঘটনাটি দেখতে বলেন। একজন বলেন হুযুর! বহুদূর থেকে একজন এমন কাজ করছে, অন্যজন বললো অনতিদূর থেকেই একজন এ কাজ করছে। হযরত ওয়সী সাহেব বললেন— দেখ, তোমাদের পশ্চাতে মসজিদের চাতানের উপর কে শুয়ে আছে। তার দ্বারাই এ কাজ সংঘটিত হচ্ছে। তখন সকলে অবাক বিস্ময়ে তাকে দেখতে লাগলেন। ইতিমধ্যে হযরত ওয়সী সাহেব সাজা স্বরূপ তার সমস্ত 'নিসবত' কেড়ে নিয়ে (সলব করে) নিসবতের শিরমণি হযরত বড় পীর রহমাতুল্লাহ খেদমতে জমা করে দেন। লোকটি নিসবত হারা হয়ে মণিহারা ফণির ন্যায় ছুটা ছুটি করে বেড়াতে লাগলো এবং অত্যন্ত ব্যকুল ভাবে কাঁদতে লাগল। তার অস্থিরতা দেখে হযরত ওয়সী সাহেব তাকে পুনঃ নিসবত ফিরিয়ে দিয়ে সাবধান করে দেন। নিসবত প্রাপ্ত হয়ে মুহুর্তের মধ্যে তথা হতে অন্তর্নিহিত হন। জানা যায় উক্ত লোকটি মুর্শিদাবাদ শহরের কুতুব ছিলেন।[৪৭]

কোতবুল-ইরশাদ, গওসে-সামদানী, রাসুলনোমা পীর হযরত সূফী ফতেহ আলী ওয়সী রহমাতুল্লাহ আলাইহির বিশেষ আদত ছিল যে পৌষ-মাঘ মাসের প্রবল শীতের সময়ও তিনি একখানা পাতলা চাদর গায়ে দিয়ে খোলা স্থানে বসে সারারাত মোরাকাবা মোশাহাদায় মগ্ন থেকে রাত্রিকাটিয়ে দিতেন।

মৎপ্রণীত 'হায়াতে একরাম' পুস্তকের ২১০ পৃষ্ঠায় ১৩ নম্বর কারামত মুনশী তমিজদ্দীন উস্তাদজীর বর্ণনা—

"এক সময় আমার পীর দস্তগীর (শাহসূফী একরামূল হক মুর্শিদাবাদী) পুনাশী শরীফে শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। ইত্যবসরে একদিন তাঁহার পীর দস্তগীর শাহসূফী ফতেহ আলী ওয়সী রহমাতুল্লাহ তাহার শিয়রে তশরীফ ফরমাইয়া জিজ্ঞাসা করেন— "বাবা একরাম, কি খেয়াল করিতেছ? তিনি বলেন— হযরত

---

৪৭) প্রাগুক্ত - ৪৫-৪৬ পৃঃ পীরজাদা মাওলানা বাকী বিল্লাহ সিদ্দিকী সংকলিত - আমীরুশ শরিয়ত মুজাদ্দেদে মিল্লাত ফুরফুরা পীর সাহেব রহমাতুল্লাহ এর জীবন চরিত - ২৩ পৃঃ।

আজরাইল আঃ কেমন করিয়া জান কবয করেন তাহাই খেয়াল করিতেছি। তদুত্তরে সূফী ওয়সী সাহেব বলেন— "কেন সে খেয়ালে এখন কি দরকার? এখনও অনেক কাজ বাকী।" সত্যই কল্য হইতে হুযুর কেবলা আরোগ্যলাভ করেন এবং বহু দিবস জীবিত থাকিয়া দ্বীনের প্রভূত কল্যাণ করিয়াছিলেন।" হযরত ওয়সী রহমাতুল্লাহ ইন্তেকালের পরে এ ঘটনা সংঘটিত হয়ে ছিল।

এক সময় সূফী ফতেহ আলী সাহেব প্রসঙ্গে আলোচনায় ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেব বলেন—'আমি আরব জাহান ঘুরে এলাম কিন্তু আমার পীরের ন্যায় পীর কাহাকেও দেখি নাই।' এ কথা শুনে হাফেয জান মোহাম্মদ নামক জনৈক ব্যক্তি ও আরও কতিপয় ব্যক্তি উক্ত কথার প্রতি তাচ্ছিল্য ও উদ্ভট মনে করে সমালোচনা করতে থাকে। মুর্শিদাবাদী হুযুর সাহেব কুতুবুজ্জামান সূফী একরামূল হক রহমাতুল্লাহ উক্ত সমালোচনার কথা জ্ঞাত হয়ে হাফেয সাহেবকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন— আপনারা কি বলছিলেন? হাফেয সাহেব বলেন— ফুরফুরার পীর সাহেব নাকি আরব জাহানেও তাঁর পীরের মত কাকেও দেখেননি, আমরা তাই বলছিলাম। এ কি সম্ভব? মুর্শিদাবাদী হযরত রাগন্বীত হয়ে বললেন— হাফেয সাহেব, তাসাউফ সম্বন্ধে তোমার কি জ্ঞান আছে? অমুক অমুক বিষয় সম্বন্ধে বলো। হাফেয সাহেব নত মুখে চুপ করে থাকেন। সূফী একরামূল হক রহমাতুল্লাহ বলেন তিনি তো ফুরফুরার পীর আরব জাহানের কথা বলেছেন— 'আমি তো মনে করি আমার পীরের ন্যায় পীর সারা জাহানেও দ্বিতীয় নেই।'

পীর বোযর্গদের কবরের মধ্যে
টাকা পয়সা ইত্যাদি ফেলা অবৈধ।

ইন্তেকাল

মৌলভী আবদুস সাত্তার সাহেবের বর্ণনা—

"হযরত সূফী ফতেহ আলী ওয়সী দুনিয়া থেকে রোখসত হওয়ার সময় হুগলী জেলার 'নসিবপূর' রেল ষ্টেশনের কাছে 'মোল্লা সিমলা' গ্রামে জনৈক মোল্লা (গোলাম আবেদ মোল্লা) সাহেবের বাড়ীতে দাওয়াত উপলক্ষ্যে পূর্ব রাতে অবস্থান করছিলেন। সে সময় সর্বদা তদ্বীয় অন্যতম প্রাণ প্রিয় প্রধান খলিফা ফুরফুরা শরীফের পীর মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী সাহেব সাথী ছিলেন। হযরত ওয়সী সাহেব ফুরফুরার হযরতকে বললেন যে, "তাঁর উপর তানফিরের ফয়েয' আসছে (অর্থাৎ দুনিয়া হতে শিঘ্রই রোখসত হবেন বলে ইঙ্গিত করলেন) বাবা, শিঘ্র হযরত আনোয়ার শাহ কুলি হালব্বী রহঃ মাযার যিয়ারতে যাও এবং কি মালুম হয় আমাকে জানাও। ফুরফুরার হযরত মাজার শরীফে বসে বুঝতে পারলেন যে, কল্য মোল্লার বাড়ী খাওয়া হবে না। অথচ আহারাদির ব্যবস্থা খুব ধুমধামের সাথে চলছিল। বিধায় এ দুঃসংবাদ পীরের কর্ণগোচর করতে পারলেন না। সেই রাতে ওয়সী হযরত মোরাকাবায় বসে সকলের সবক জিজ্ঞাসা করলেন বটে, ফুরফুরার হযরত ব্যতীত কাকেও তাওয়াজ্জোহ দিলেন না এবং সেই তাওয়াজ্জোহ ছিল হযরত ওয়সী পীরের শেষ তাওয়াজ্জোহ।

পরদিন সকালে হযরত ওয়সী পীর বললেন— হঠাৎ একটি ফয়েয বন্ধ হয়ে গেল এবং তার মুখমণ্ডলে বিষাদের ভাব দেখা দিল। পরক্ষনই তাঁর চেহারা মুবারক উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, বললেন— "না, ফয়েজ পুনরায় এসেছে।" দুপুরের দস্তরখানে খাওয়ার সামগ্রী মৌজুদ, এমনি সময় তিনি 'এস্তেঞ্জা' করে এসে ফুরফুরার হযরতকে বললেন— "আসমান হতে ব্যারাম আমার মধ্যে প্রবেশ করছে, জলদি 'সলব' কর। ফুরফুরার হযরত সঙ্গে সঙ্গে 'সলব' করতে বসে গেলেন, কিন্তু কিছুতেই ব্যারাম 'সলব' হল না। তিনি বললেন যে, "তখন আমার কুওয়াতের ফয়েযের ত্বেজ খুব বেশি ছিল, অথচ এত চেষ্টা করতে লাগলাম যে আমি স্বয়ং শূন্যে উঠে যাচ্ছি তথাপিও বিমারী সলব হল না। অতঃপর তিনি ইঙ্গিতে জোহরের নামায আদায় করলেন।

কিয়ৎক্ষণ পর তাঁর অর্ধেক শরীর অবশ হয়ে গেল। ফুরফুরার হযরত আর কাল বিলম্ব না করে তাঁর পীরকে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন এবং কোলকাতা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। সে দিন মোল্লার বাড়ীতে আর খাওয়া হলো না। 'কাশফের' প্রতিফলন হল। **গাড়ি যখন হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছল এমন সময় সূফী ফতেহ আলী ওয়সী সাহেব ফুরফুরা শরীফের পীর আবু বকর সিদ্দিকীর কোলে মাথা রেখে বাং-১২৯৩ সালের ২০শে অগ্রহায়ণ মোতাবেক ৮ই রবিউল আওয়াল ১৩০৪ হিজরী ৬ ডিসেম্বর ১৮৮৬ সনের রোজ রবিবার বেলা ৪টায় ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে অইন্না ইলাইহে রাযেয়ুন।**

তাঁর লাশ মুবারক অতি যত্ন সহকারে কোলকাতার উপকণ্ঠে মানিকতলা দিল্লীওয়ালা মসজিদ সংলগ্ন ২নং গোরস্থানে সমাধিস্থ করেন। ফুরফুরার পীর সাহেব তার সওয়াব রেসানী করার মানসে প্রতি রমযান মাসের ২৬শে দিনগত ২৭শে রাতে ঈসালে সওয়াব প্রচলন করে গিয়েছেন।[৪৮]

মাওলানা জয়নুলআবেদীন আখতারী সাহেবের বর্ণনা— "আমি আমার পীর ও মুর্শিদ হযরত পীর মাওলানা শাহসূফী আহমদ আলী হামিদ জালালী সাহেবের পাক জবান মোবারকে শুনেছি যে, বাংলার শ্রেষ্ঠ সাধক তাপস হযরত পীর মাওলানা শাহ সূফী সাইয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়সী সাহেব যেদিন ইন্তেকাল করেন, তাঁর পূর্ব রাতে তাঁর খলিফা (শিষ্য) সিরাজুল বাংলা হযরত পীর মাওলানা শাহসূফী মোহাম্মদ আবু বাকার সিদ্দিকী রহমতুল্লাহ সহ হুগলী জেলায় মোল্লা সিমলা নামক গ্রামে এক জনের বাড়ীতে দাওয়াত উপলক্ষে তশরিফ রাখেন। হযরত ওয়সী পীর সাহেব বুঝতে পেরেছিলেন যে তার কাজ শেষ হয়েছে শিঘ্রই তাঁকে আল্লাহ পাকের ডাকে দুনিয়া ছেড়ে আখেরাতের দিকে চলে যেতে হবে।

তাই তাঁর খলিফাকে এরশাদ করেন যে, 'তানফিরের ফয়েজ' আসছে অর্থাৎ এই দারে ফানা (দুনিয়া) হতে পরদা নিয়ে দারেবাকায় পদার্পণ করবেন। তাঁর খলিফা ফুরফুরা শরীফের মরহুম পীর সাহেব কেবলা নিজ পীর ও মুর্শিদ হযরত ওয়সী পীর কেবলা সাহেবকে তাড়াতাড়ি সঙ্গে করে গাড়িতে

---

৪৮) মৌলভী আবদুস সাত্তার কৃত - হঃ মাঃ আবু বকর সিদ্দিকী পীর কেবলার জীবন চরিত - ৪৭-৪৯ পৃঃ। পীরজাদা মাওঃ বাকী বিল্লাহ সংকলিত - মোজাহেদে মিল্লাত ফুরফুরা পীর সাহেবের জীবনচরিত - ২৪-২৫ পৃঃ।

কোলকাতা অভিমুখে রওনা হলেন। গাড়ি ঠিক হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে কোতবুল-ইরশাদ হযরত পীর মাওলানা শাহ সূফী সাইয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়সী, ক্বাদেরী, চিশতী, নকশাবন্দী, মোজাদ্দেদী সাহেব নিজ খলিফা, ফুরফুরার মরহুমের কোলে মাথা রেখে বাংলা ১২৯৩ সালে ২০শে অগ্রহায়ণ; মোতাবেক হিজরী ১৩০৪ সাল, ৮ই রবিউল আউয়াল-ইং ১৮৮৬ রবিবার বেলা ৪টার সময় ভারত বাসিকে শোক সাগরে ভাসিয়ে এ দারেফানা ছেড়ে দারে—বাকায় পদার্পণ করে জান্নাত বাসী হলেন।[৪৯]

ড. মতিউর রহমান সাহেব (পাটনা) লেখেন— আন্দাজ ১৮/১৯ বছর নিরবিচ্ছন্নভাবে সর্বত্র অত্যান্ত কামিয়াবীর সাথে হিদায়াতের কাজে আঞ্জাম দিয়ে প্রায় ৬১ বছর বয়সে হযরত সূফী ফতেহ আলী ওয়সী রহমাতুল্লাহ ৮ই রবিউল আউয়াল ১৩০৪ হিঃ মোতাবেক ২০শে অগ্রহায়ণ ১২৯৩, ৬ই ডিসেম্বর ১৮৮৬ সাল রবিবার বিকাল ৪টায় ইন্তেকাল করেন। হযরত ওয়সী রহমাতুল্লাহ অন্যতম প্রধান খলিফা হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী ফুরফুরাবী রহমাতুল্লাহ তাঁর মাজারে বাংলা ও ফার্সিতে পাথরে নাম খোদাই স্মৃতি ফলক স্থাপন করে দেন।

বিসমিল্লাহিররহমানীর রাহীম

লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ

কুল্লু নাফসিন যায়েকাতুল মওত। কুল্লি শাইঈন হালেকুন ইল্লাওয়াজহু।[৫০]

ফকির মুহাম্মদ আবু বকর আফি আনহু, সাকিন ফুরফুরা, জেলা-হুগলী। হাশতম রবিউল আওয়াল ১৩০৪ হিঃ বাসদ।

পথনির্দেশ ঃ ২৪/১ মুনশী পাড়া লেন, লালাবাগান, থানা-মানিকতলা শিয়ালদহ - শ্যামবাজার আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড - কারবালা ষ্টপেজ নেমে পূর্বদিকে হাজী জাকারিয়া লেন হয়ে সোজা গিয়ে রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট পার হয়ে পূর্বদিকে লালাবাগান মসজিদের উত্তরে অনতিদূরে হযরত ওয়সী রহঃ মাজার শরীফ, কোলকাতা - ৬।

---

৪৯) হায়াতে-ওয়সী (২য়-১৯৮০ ইং) - ৬৪-৬৭ পৃঃ। টিপ্পনী, ইদানিং তথ্য বিকৃতি ঘটিয়ে সুরেশ্বরী পত্রিকায় প্রচার হচ্ছে, 'মুর্শিদাবাদের সালার ষ্টেশন থেকে আসার সময় আহমদ আলী জান শরীফের বুকে মাথা রেখে ওয়সী পীর ইন্তেকাল করেন।' জঘন্য মিথ্যাচার, অদ্যবধি কোন পত্র/পত্রিকা, পুস্তক/পুস্তিকায় এ তথ্য উল্লেখিত হয়নি। সুরেশ্বরী বিদয়াতীদের পক্ষে এমন উদ্ভট কথা সম্ভব। ৫০) আয়নায়ে-ওয়সী ১৭৭-১৭৮ পৃঃ হায়াতে-ওয়সী - ৫৫ পৃঃ।

ঈসালেসওয়াব

ড. মতিউর রহমান (পাটনা) বলেন—

"হযরত মাওলানা শাহ সূফী মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিকী রহঃ (১৮৮৬ থেকে ১৯৩৯ সাল অর্থাৎ আমৃত্যু প্রতি বছর ২৭শে রমযানুল মুবারক দিল্লীওয়ালা কবরস্থানের, মসজিদে লালাবাগান, মানিকতলা, কোলকাতা-৬। সওয়াব রেসানী মাহফিল কায়েম করেন এবং তথায় আত্মীয়, মুরীদ ও ভক্তদের বিশাল জমায়েত সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হতে থাকে।

ফুরফুরা শরীফের পীর কেবলা রহঃ সার্বিক পরিচালনায় এ মহা মাহফিলে সকলের জন্য ইফতারীর সুব্যবস্থা করতেন, মানিকতলার সুবিখ্যাত ব্যবসায়ী খান বাহাদুর মুহাম্মদ সোলায়মান সাহেব এম, এল, সি।[৫১] মোহতরাম খানবাহাদুর সাহেব হযরত সূফী সাহেব রহঃ ও তাঁর খলিফাদের অত্যন্ত বিশ্বস্থ ভক্ত ও মুরীদ।

হযরত ওয়সী পীর কেবলার স্মরণ সভা —

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব লেখেন —

"তার মাজার শরীফ সংলগ্ন মসজিদে তাঁর প্রধান খলিফা ফুরফুরা শরীফের মুজাদ্দেদে-যামান আলা হজরত হুযুর পীর কেবলা (পীর মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী) রহঃ প্রতি বছর ২৬শে রমযান দিবাগত ২৭শের রাতে খুব শান শওকাতের সাথে নিজ পীরের ইসালে সওয়াব কায়েম করেন, উপস্থিত সকলকে ইফতারী ও বিরিয়ানী পোলাও খাওয়ানোর ব্যবস্থা হতো। জনাব ওয়সী পীর কেবলার সাহেবযাদা ও পৌত্রগণ বিশেষ অতিথি হিসাবে এই অনুষ্ঠানে শরিক হতেন।"

---

৫১) হাফেজ সাইয়্যেদ বশিরুদ্দীন সাহেব থেকে বর্ণনা - খানবাহাদুর মুহাম্মদ সোলায়মান ছিলেন- হাজী মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেবের সাহেবযাদা, জিলা গাজীপুর (ইউ,পি,) বাসেন্দা, কাজ কারবার সূত্রে মানিকতলায় অবস্থান করতেন। ২৫ বছর যাবত এসেম্বলীর সদস্য এবং কাউন্সিলার ছিলেন। ৭৫ বছর বয়সে ১৯৪৮ সালে নিজ বাসভবন ৭৮ নম্বর রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, মানিকতলা কোলকাতায় ইন্তেকাল করেন। তাঁকে দিল্লীওয়ালা কবরস্থানে দাফন করা হয়। ১৯৫০ হাঙ্গামায় মানিকতলায় তাঁর বহু সম্পদ ও সম্পত্তি জবর দখল করে নেয়।

তাঁর ছোট সাহেবযাদা জনাব তকী মুহাম্মদ ১৭ই নভেম্বর ১৯৭৪ ইন্তেকাল করেন। তার বড় সাহেবযাদা হাজী নবী মাহমুদ, গ্যাসষ্ট্রীট-রাজাবাজার থাকতেন। পিতা ও পিতামহের ন্যায় ওয়সী হযরত ও সূফী নূরমহাম্মদ নিযামপুরী রহমাতুল্লাহ খলিফাদের পরম সুহৃদয় ছিলেন। তার এক সাহেবযাদী পাটনার রেয়াউর রহমান উকিল সাহেবের সাথে বিয়ে হয়। —আয়নায়ে-ওয়সী ১৭৯ পৃঃ বরাত সাইয়্যেদ এ,বি,এম বশিরুদ্দীন রহঃ ঢাকা।

'১৯৩৯ সনে দাদা হুযুরের ইন্তেকাল হলে তদ্বীয় বড় সাহেবযাদা ও অন্যান্য হুযুর কেবলাগণ যথারীতি আঞ্জাম দিতেন।

১৯৪৬ সনের রমযান মাসে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় এলাকা মুসলিম শূন্য হয়ে যায়। সে জন্য উক্ত মাহফিল কোলকাতায় ১১ নং মার্কেট স্ট্রীট মসজিদে অদ্যবধি প্রতি বছর হয়ে আসছে।

বহুদিন মানিকতলা মুনশীপাড়া লেনের মসজিদ বিরান ও মাজার শরীফ বেহিফাজাতে অরক্ষিত থাকে। এমন কি এলাকা বেদখল হয়ে যায়। বহুভাবে দখল মুক্ত করার চেষ্টা করেও সম্পূর্ণ দখল মুক্ত করা সম্ভব হয়নি।

২৪ পরগণা নিবাসী ফুরফুরা শরীফের হুযুর পীর কেবলার বিশিষ্ট মুরীদ ডা. মোসলেম আলী হযরত বড় হুযুর পীর কেবলার অনুমতি নিয়ে কলুটোলার খানবাহাদুর মুহাম্মদ জান ও ম্যানেজার আলহাজ্জ ইয়াকুব সাহেবের সহযোগিতায় মসজিদে এমামতী, মোয়াজ্জনী, ঝাড়ুদারী করে রাত্রি যাপন করতেন।[৫২]

২৪/১, মুনশী পাড়া লেন, মানিকতলা, কোলকাতা - ৬, হযরত সূফী ওয়সী রহঃ মাজার শরীফ সংলগ্ন মসজিদ প্রাঙ্গণে ফুরফুরা শরীফের পীর মুজাদ্দেদে-যামান, হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী ১৮৮৬ সালে ২৭শে রমযান ইসালে সওয়াব মাহফিল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সে মাহফিল এখনও যথা মর্যাদায় হয়ে থাকে;— **এক নজরে —**

১৮৮৬-১৯৩৯ : ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত মাওলানা আবু বকর সদ্দিকী সাহেবের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ২৪/১, মুনশী পাড়া লেন, মানিকতলা। তামাম খোলাফারা ও বংশধরেরা যথা মর্যাদায় শরীক থাকতেন।

১৯৪০-১৯৪৬ : ফুরফুরা শরীফের পীর কাইয়ূমে যামান, হযরত মাওলানা আবদুল হাই সিদ্দিকী সাহেবের সার্বিক ব্যবস্থাপনায়, মানিকতলা।

---

৫২) মাসিক নেদায়ে ইসলাম পত্রিকা, কার্ত্তিক-অগ্রহায়ন-১৩৯২, ৩৯ বর্ষ, ৭ম-৮ম সংখ্যা- ১৪০ পৃঃ। নেদায়ে ইসলাম মাসিক পত্রিকার সম্পাদক আলহাজ্জ সাইয়্যেদ আশরাফ হোসেন থেকে তথ্য গ্রহণ,—রহমানী।

১৯৪৭-১৯৪৮ঃ সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় সব ওলট পালট হয়ে যায়। মানিকতলা মুসলিম শূন্য হয়ে যায় ফলে এক বছর চাঁদনী টিকাটুলি মসজিদে, পর বছর থেকে ১১ নং মার্কেট স্ট্রীট, নিউমার্কেট মসজিদে উক্ত ইসালে সওয়াব অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৪৯-১৯৭৯ঃ ফুরফুরা শরীফের পীর 'বড় হুযুর' হযরত মাওলানা আবদুল হাই সিদ্দিকী আমৃত্যু ১১ নং মার্কেট স্ট্রীট মসজিদে (নিউ মার্কেট)উক্ত ইসালে সওয়াব মাহফিল যথা মর্যাদায় আঞ্জাম দিয়ে গেছেন।

১৯৮০-২০০২ঃ ফুরফুরা শরীফের পীর আল্লামা মুফতী 'মেজলা হুযুর' হযরত মাওলানা আবু যাফর সিদ্দিকী সাহেবের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় দাদা পীরের উক্ত ইসালে সওয়াব সাড়ম্বরে হতে থাকে।

২০০২-২০১৭ঃ অদ্যাবধি ফুরফুরা শরীফের পীরবংশ পরস্পরায় দাদা পীরের ইসালে সওয়াব কোলকাতা নিউমার্কেট এর মার্কেট স্ট্রীট মসজিদে অদ্যাবধি হয়ে আসছে, বর্তমানে ফুরফুরা শরীফের বর্ষীয়ান পীর আল্লামা সাইফুদ্দীন সিদ্দিকী সাহেবের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় পূর্বের ন্যায় তৃপ্তিদায়ক বিরিয়ানী এবং পরিপূর্ণ ইফতারীর সুব্যবস্থা এখনও বর্তমান। উক্ত অনুষ্ঠানে ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেব ও পীরজাদাগণ এবং বিশিষ্ট উলামায়ে দ্বীন তশরিফ আনেন।

ফলকথা ঃ ১৩০৪ হিজরী সনের ২৭শে রমযান থেকে ১৪৩৯ হিজরী সন পর্যন্ত ১৩৫ বছর ব্যাপি ধারাবাহিক ভাবে ফুরফুরা শরীফের পীর পরিবারের সুব্যবস্থায় হযরত সূফী ফতেহ আলী ওয়সী পরদাদা পীরের ইসালে সওয়াব তথায় হয়ে আসছে। অদ্যাবধি ওয়সী পীরের জন্য অন্য কোন খলিফা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাহফিলের ইতিহাস নেই বললেও সত্যের অপলাপ হবে না।[৫৩]

---

৫৩) ১৮৮৬-২০১৭: ১৩১ বছর সূর্য্যবছর। ১৩০৪-১৪৩৯ হিজরী ১৩৫ চন্দ্রবছর।

১৯৪৭ সাল থেকে হযরত ওয়সী রহঃ মাজার শরীফে মাহফিল বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৪৯-১৯৫০ সাল পর্যন্ত ফুরফুরা শরীফের পীর আবু বকর সিদ্দিকী রহঃ বিশিষ্ট খলিফা হযরত মাওলানা আহম্মদ আলী হামিদ জালালী রহঃ ফুরফুরা শরীফের গদ্দীনশিন পীর সাহেবের এজাযতে মানিকতলায় মাদ্রাসা ও ইসালে সওয়াব করেন। তাঁর ইন্তেকালে আবার মাহফিল বন্ধ হয়ে যায়। ওয়সী আঞ্জুমানে ইত্তেবায়ে সুন্নতের পরিচালক- ১৯৫১-১৯৫৪ সাল পর্যন্ত মাওলানা জয়মূল আবেদীন আখতারী ও পীরজাদা মাওলানা মাহমুদ বখত বক্তিয়ারী সাহেবের মাধ্যমে হয়ে আবার বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত ২০ শে অগ্রহায়ণ মানিকতলায় ওয়সী পীরের ইসালে সওয়াব মাহফিল ২৫/২৬ বছর বন্ধ ছিল, কিন্তু ওয়সী পীরের ইসালে সওয়াব ফুরফুরা শরীফের মাতাহাতে যথারীতি নিউ মার্কেট মসজিদে ইনশা আল্লাহ হয়ে আসছে। ১৯৯০ সালে থেকে ফুরফুরা শরীফের নূরীয়া-ফতেহীয়া-সিদ্দিকীয়া ফাউণ্ডেশন এর ব্যবস্থাপনায় ৮ই রবিউল আওয়াল মোতাবেক ২৪/১, মুনশী পাড়া লেন, মানিকতলায় প্রতিবছর ওয়সী পীরের মাজার-মসজিদে বার্ষিক ঈসালে সওয়াব এবং প্রতি বাংলা মাসের ২০ শে তারিখে মাসিক যিকির ও দুয়ার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়াও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, যেমন— মহর্রম, নবী দিবস, শবেমিরাজ, শবে বরাত, ঈদায়েন, প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার বাদ আসর মিলাদ, খতম-তারাবীহ, ইফতারী বিশেষ করে ২০শে রমজান ইফতার ও দোয়ার মাহফিল ও জিয়ারত অনুষ্ঠিত হয়।

পীর-সিজদা, কবরে সিজদা করা শির্ক।
পীর-পূজক, কবর পূজা করা মোশ্‌রেক।

মাজার শরীফ প্রসঙ্গ

ইতিমধ্যে ১৯৫০ সালে ২৪ পরগণা জেলার বশিরহাটের খানবাহাদুর সাইয়্যেদ মৌলভী গোলাম কাসেম রহমাতুল্লাহ সাহেবজাদা খান বাহাদুর সাইয়্যেদ আবুল খায়ের মুহাম্মদ সিদ্দিক সাহেব[৫৪] ১৯৫০ সালে বঙ্গীয় ওয়াকফ বোর্ডে

---

৫৪) বাগদাদ শরীফ থেকে ভারতে আসেন—'বড়েখান' বংশের সন্তান খানবাহাদুর মৌলভী গোলাম কাসেম রহমাতুল্লাহ এর (১৯১৯ ইং/১৩৩৭ হিঃ) সন্তান, খানবাহাদুর এ,কে,এম সিদ্দিক (১৮৮৮-১৯০৮ ইং) ও খানবাহাদুর এ,এফ,এম, আবদুর রহমান এবং কন্যা কাওকাবুন্নিসা।

এ, এফ, এম আবদুর রহমান-বঙ্গীয় প্রাদেশিক মন্ত্রি সভার সদস্য। সাইয়্যেদ আবদুর রহমান (মন্ত্রী) সাহেবের কবর ঢাকা পোস্তগোলা।

এ, কে, এম, সিদ্দিক সাহেব শামসুল উলামা হযরত মাওলানা গোলাম সালমানী আব্বাসী রহমাতুল্লাহ মুরীদ, ডাইরেক্টর জেনারেল, রেভিনিউ খানবাহাদুর সিদ্দিক সাহেব নওয়াব আব্দুল লতিফ খানবাহাদুর সি, আই, ই; (সাবেক মন্ত্রি ভূপাল) কন্যা (ছোট) আসমাতুন্নেসা বেগমের সাথে বিবাহিত হন। রামপুরের মোজাদ্দেদী খান্দানের সাথে নীবিড় সম্পর্ক আছে এবং এ, এফ, এম, আবদুর রহমান বঙ্গীয় প্রাদেশিক মন্ত্রি সভার সদস্য। অত্যান্ত সৎ ও আদর্শ-স্থানীয় মন্ত্রি ছিলেন। জীবনে ঘুষ তো দূরের কথা মন্ত্রীর গাড়ী নিজের ব্যক্তিগত কাজে কোনদিন ব্যবহার করেননি। এমনকি নিজের এলাকায় সরকারী কাজে এলেও টি,এ, নিতেন না। একই বংশে তিনজন খানবাহাদুর, বিরল দৃষ্টান্ত। মন্ত্রী সাহেবের কবর, পোস্তগোলা, ঢাকা/খানবাহাদুর গোলাম কাসেম সাহেবের কন্যা সাইয়্যেদা কাওকাবুন্নিসার বিবাহ আলীপুর (কোলকাতা) নিবাসী সাইয়্যেদ মঈনুদ্দীন সাহেবের সাথে, (ইন্তেকাল ১৯৪২ ইং)। তাঁদের উভয়ের কবর সাঁওতাল পরগণার মধুপুরে। খান বাহাদুর সিদ্দিক রহমাতুল্লাহ ওয়সী ভক্তদের অত্যান্ত সম্মানীয় ব্যক্তিত্ব, আজ তিনি যদি ২৪/১, মুনশী পাড়া লেন, ওয়াকফ নথিভুক্ত না করাতেন, না জানি মাজার-মসজিদের হাল কি হতো, হয়তো কোলকাতার আর পাঁচজায়গার মত হতো। খানবাহাদুর সিদ্দিক আরও বড় খেদমত করেন, বর্দ্ধমানের মঙ্গলকোট হযরত মোজাদ্দেদে-আলফেসানী রহমাতুল্লাহ বিশিষ্ট খলিফা বঙ্গে মোজাদ্দেদীয়া তরীকার প্রথম খলিফা হযরত মাওলানা শায়েখ হামিদুদ্দীন দানেশমন্দ বাঙ্গালী ওরফে শায়েখ হামিদ বাঙ্গালী রহমাতুল্লাহ এর মাজার ও মসজিদ কসাড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়েছিল এবং জিয়ারতের পরিবেশ মোটেই ছিল না। খানবাহাদুর সিদ্দিক সাহেবের নেতৃত্বে ১৯৩৮ সালে ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেবের দুজন খ্যাতনামা খলিফা হযরত মাওলানা প্রফেসর আবদুল খালেক সাহেব এবং জনাব সাইয়্যেদ মঈনুদ্দীন সাহেব ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ। হযরতের মাজার ও মসজিদ মেরামত, জঙ্গল সাফ করে রাস্তা বানানোর ফলে জিয়ারত কারীদের খুবই সুন্দর হয়। হযরতের মাজার শরীফ ও মসজিদ হিফাযতের জন্য একটি কমিটি গঠন করে ডাঃ আবু তোরাব সাহেবকে সভাপতি মনোনীত করেন। ডাক্তার সাহেব অত্যান্ত যোগ্যতার সাথে সব কাজের আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। খানবাহাদুর সিদ্দিক সাহেবের দলে অল্প বয়স্ক সদস্য তদীয় ভাগ্নে হযরত হাফেয সাইয়্যেদ বশিরুদ্দীন রহমাতুল্লাহ ছিলেন।

খানবাহাদুর সিদ্দিক সাহেবের ভগ্নিপতি সাইয়্যেদ মঈনুদ্দীন সাহেবের তিন সাহেবযাদা সাইয়্যেদ নাসিরুদ্দীন এডভোকেট, সাইয়্যেদ জহিরুদ্দীন (এস, পি) ও হযরত মাওলানা হাফেয আবুল বাসার মুহাম্মদ বসিরুদ্দীন রহমাতুল্লাহ। হাফেয সাহেবের চারপুত্র ও এক কন্যা - সাইয়্যেদ মুহাঃ আবদুল্লাহ আইউব। সাইয়্যেদ মৌলভী সূফী আবদুস সালাম এডভোকেট ও নোটারী পাবলিক-বাংলাদেশ, সাইয়্যেদ মুহাঃ মনিরুদ্দীন, সাইয়্যেদ ডাঃ আসলাম, সাইয়্যেদ বদিউস্ সুলতানা ওরফে নুসরতআরা জওযে সাইয়্যেদ মাওঃ হামিদুল্লাহ, গদ্দিনশীল পীর মিয়াসাহেবের ময়দান, লক্ষ্মী বাজার-ঢাকা, বাংলাদেশ। খানবাহাদুর আবদুর রহমান, সাইয়্যেদ মঈনুদ্দীন, সাইয়্যেদ নাসিরুদ্দীন, সাইয়্যেদ জহিরুদ্দীন, সাইয়্যেদ হাফেয বসিরুদ্দীন সকলেই পীর আবু বকর সিদ্দিকী রহঃ এর খলিফা ছিলেন।

২৪/১, মুনশীপাড়া লেন মানিকতলার হযরত ওয়সী পীরের মাজারশরীফ গোরস্থান ওয়াকফ নথিভুক্তির আবেদন করেন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে আবেদন পত্রে হযরত সূফী ফতেহ আলী ওয়সী রহমাতুল্লাহ মাজার উল্লেখ করেছেন এবং পরিচয়ে বলেছেন— তিনি ফুরফুরা শরীফের পীর আবু বকর সিদ্দিকী রহমাতুল্লাহ সাহেবের পীর। ১৯৫০ সালে হাজী রহিম বকস ওয়াকফ ষ্টেট, ই,সি নং-১১৭৬৬। ২৪/১, ২৪ মুনশী পাড়া লেন, মানিকতলা, কোলকাতা-৬। ওয়াকফ নথিভুক্ত হয়, বোর্ড অফিস ৬/২, ম্যাডন ষ্ট্রীট, ধর্মতলা, কোলকাতা-৭২।

মুরীদের পরিচয়ে পীরের পরিচয় কোন কোনক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। সে সময় সারা বাংলা আসামে ফুরফুরা শরীফের পীর আবু বকর সিদ্দিকী সাহেবকে সবাই একডাকে চিনতো এবং মান্য করতো। সে জন্যই এ,কে,এম,সিদ্দিক সাহেব নিজে শামসুলউলাম, আল্লামা, বড় মাওলানা গোলাম সালমানী আব্বাসী রহঃ মুরীদ হওয়া সত্ত্বেও ফুরফুরা শরীফের পীর আবু বকর সিদ্দিকী সাহেবের পরিচয় উল্লেখ করেছেন। **কেননা পরদাদা পীর কোতবোল ইরশাদ গওসে সামদানী, রাসুলনোমা সুফী ফতেহ আলী ওয়সী রহমাতুল্লাহ এর খলিফাদের মধ্যে একমাত্র তিনি ছিলেন- 'মোজাদ্দেদে-যামান' ও 'আমিরুশ-শরিয়ত'। ওয়সী পীরের খ্যাতিরে আল্লাহপাক তাঁকে এ মরতবা এনায়েত করেছিলেন — তিনি স্বীয় পীরের খেদমতে সর্বদারত ছিলেন, শেষ নিসবতে জামেয়ার ফয়েয পেয়েছিলেন এবং তাঁর কোলে মাথা রেখে হযরত সূফী ওয়সী পীর রহমাতুল্লাহ ইন্তেকাল করেন। আর ওয়সীর শেষ কৃতকার্য তারই তত্ত্বাবধানে সুসম্পন্ন হয়।**

বাস্তব সত্য স্বীকার করলে দেখা যায় যে - পরদাদা পীর হযরত ওয়সী রহমাতুল্লাহ-র প্রায় সমস্ত খলিফাদের আওলাদ ও আওলাদেরা বর্তমানে অধিকাংশ ফুরফুরা শরীফের দাদা পীর ও তাঁর আওলাদ ও খলিফাদের তথা সিলসিলায় ফুরফুরা শরীফের ভক্ত ও মুরীদ।

ফুরফুরা শরীফের পীর আবু বকর সিদ্দিকী কর্তৃক ১৮৮৬ সালে নির্মিত স্মৃতি ফলক ও মাজার শরীফ অক্ষুন্ন রেখে ১৯৭২ সালে পাবনার এনায়েত পুরীর বেগম সাহেবা মাজার সংস্কার করেন। তখনও আসপাশের কবরগুলো ঠিক ছিল; কিন্তু তদ্বীয় সাহেবযাদা ১৯৯২ সালে পুণঃ নির্মাণের সময় কয়েকটি কবর ধ্বংস করে মাজার করা হয়। এ জন্য তাদের থেকে বেশী অপরাধী এ্যাসোসিয়েশনের জনৈক কর্মকর্তা, যা দিবালোকের ন্যায় সত্য। সে সময়ের মাজার শরীফের ফটো (ছবি) থেকে স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় ওয়সী হযরতের পায়ের দিকে চিহ্নিত কবরের প্রতিছবি। এখনও কয়েকটি কবরের ভগ্নাংশ দেখা যায়।- রহমানী।

তাঁর খলিফা ও মুরীদ প্রসঙ্গ

মৌলানা এয়াজদ্দীন, আলিপুর, মৃত্যু- ১৩১৩ সাল ১৫ই আশ্বিন, মাজার খিদিরপুর ষোল আনা কবরস্থান মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্বেই প্রথম সারির ৩য় কবর। সূফী নিয়ায আহমদ কাৎরাপোতা। মৌঃ মতিউর রহমান-চট্টগ্রাম, হাফেজ ইবরাহিম চট্টগ্রাম, মৌঃ আবদুল আযীয চন্দ্রজাহানাবাদ, শাহ দিদার বকস পদ্মপুকুর, শাহ বাকাউল্যাহ কানপুর, মৌঃ গণিমতুল্যাহ, ফুরফুরা। মুনশী সাদাকাতুল্যাহ- ফুরফুরা, মুনশী শাফাকাতুল্যাহ খাতন। সেখ কোরবান আলী - বানিয়াতলাব, শামসুল উলামা আশরাফ আলী-কোলকাতা, মৌঃ গুল হোসেন খোরাসানী, মেঃ আতাউর রহমান ২৪ পরগণা, মৌঃ মবিনুল্যাহ - রামপাড়া, প্রমুখ আরও অনেক মুরীদ বা খলিফাদের বংশ পরম্পরায় পীরি-মুরীদ সিলসিলা জারী নেই, এমন কি অনেক খলিফার কবর পর্য্যন্ত চিহ্নিত করা যায় না।

ব্যতিক্রম হযরত মাওঃ শামসুল উলামা গোলাম সালমানী আব্বাসী ফুরফুরা শরীফ, মোজাদ্দেদে-যামান পীর মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী ফুরফুরা শরীফ, কুতুবুজ্জমান শাহ একরামুল হক মুর্শিদাবাদী, সূফী সাইয়্যেদ শাহওয়াজেদ আলী, মৌলানা শাহ সাইয়্যেদ আমজাদ আলী পাউসার প্রমুখ কয়েকজন খলিফা; তাদের অন্যতম ফুরফুরা শরীফের পীর আলা হযরত মোজাদ্দেদে-যামান, মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী আল কোরায়সী রহমাতুল্লাহ।

শামসুল উলামা হযরত মাওলানা গোলাম সালমানী আব্বাসী রহমাতুল্লাহ বংশ পরম্পরায় পীরি-মুরীদ জারী নেই, তবে তাঁর খলিফাদের যেমন- হুগলীর ব্যাণ্ডেলের হযরত মাওলানা শাহসূফী আবদুল বারী রহমাতুল্লাহ এর খলিফা আযমগড়ের হযরত মাওলানা হাফেয হামেদ হাসান আলভী রহমাতুল্লাহ মুরীদের পরিচয় পাওয়া যায়। হযরত মাওঃ শাহ আবদুল মজিদ রহমাতুল্লাহ গারাংগিয়া চট্ট গ্রাম।

এপার বাংলায় কেবল পুনাশী মুর্শিদাবাদের হযরত কুতুবুজ্জামান, শাহসূফী পীর সাইয়্যেদ একরামুল হক রহমাতুল্লাহ খান্দানে পীরি-মুরীদ সিলসিলা বঙ্গ-আসামে জারী আছে।

ওপার বাংলায় হযরত শাহ সূফী সাইয়্যেদ ওয়াজেদ আলী মেহদীবাগ হুযুরের মুরীদদের পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু তার জনৈক মুরীদের অনেক কার্য্যকলাপ শরিয়াতের খেলাফ। অন্যান্য খলিফাগণ শরিয়ত পন্থি।

মুর্শিদাবাদের সিজগ্রামের হযরত মাওলানা আবদুল হক সিদ্দিকী রহমাতুল্লাহ এর খলিফাদের পরিচয় জানা যায় না। তিনি ও ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেব একই বংশের উজ্জ্বল রত্ন। তার সাহেবযাদা হযরত মাওলানা আবদুল হাই সিজগ্রামী রহঃ ফুরফুরা শরীফের পীর আবু বকর সিদ্দিকী সাহেবের খলিফা।[৫৫]

হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আমজাদ আলী রহমাতুল্লাহ, পাউসার, মুনশীগঞ্জ, ঢাকা। ইতি যোগ্যতম আলেম, কোলকাতা মাদ্রাসা আলীয়ার সুযোগ্য মোদার্রেস। হযরত ওয়সী রহমাতুল্লাহ একজন কামেল খলিফা। শরিয়ত পন্থি বুযর্গ, এত্তেবায়ে সুন্নাত ছিলেন। তিনি নতুন একটি 'তারীকায়ে কদমিয়া' তরীকার উদ্ভব করে অনেকের বিরাগভাজন হন। আমরা সে বিতর্কের মধ্যে নেই, আর সে যুগ চলে গেছে।

আমাদের জানামতে হযরত ওয়সী রহমাতুল্লাহ ওপার বাংলার সমস্ত খলিফাদের মধ্যে শরিয়ত ও তরিকতে পীরের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন, হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আমজাদ আলী সাহেব কেবলমাত্র পৃথক তরীকার দাবী করা ব্যতীত। "পীরফকিরের আসল রূপ" পুস্তকটি তাঁর আওলাদের লেখা। বংশীয় পরিচয় ও পীরিকিয়া পদ্ধতির একটা সুন্দর রূপরেখা পাওয়া যায়। বংশ পরম্পরায় যোগ্যতার সাথে খানকাহ পরিচালনা করে গেছেন, কয়েকজন যোগ্য খলিফার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর মাজার শরীফ পাউসার মসজিদের উত্তর ধারে বিদ্যমান। তিনি কবর সিজদা, গানবাদ্য করা, নারীপুরুষ সম্মিলিত ভাবে যিকির করা, কবরে ফুল চাদর চড়ানো কঠিনভাবে নফরত করতেন। তাঁর সুযোগ্য সাহেবযাদার সময়ে তাঁর কবরে কোন রকম শিরক বিদয়াতী প্রচলন ছিল না। ইদানিং মালী হালাতের দুর্বলতার সুযোগে তাঁর কবরে চাদর চড়িয়েছে, সুরেশ্বরী বেদাতী পীরদের পাল্লায় পড়ে। তবে এখানে অন্যদের চাদর চড়ানোর সুযোগ দেওয়া হয় না।

---

৫৫) হযরত পীর সাহেবের বিস্তারিত জীবনী-২২৮ পৃঃ (খলিফাদের নামের তালিকা)।

হযরত সূফী ওয়সী রহমতুল্লাহ খলিফাও মুরীদের তালিকায় কেবলমাত্র ব্যতিক্রম মৌঃ আহমদ আলী ফরিদপুর।

মৌঃ আহমদ আলী নামের মানুষটি কোন 'ফরিদপুরের' অধিবাসী ছিলেন? অধুনা বাংলাদেশের জেলা-ফরিদপুর, থানা-ফরিদপুর ও ফরিদপুর নামে গ্রামের মৌঃ আহম্মদ আলী নিজেকে জানশরীফ বলে পরিচয় দিয়ে তাঁর খলিফা দাবি করে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তিনি হযরত ওয়সী পীরের খলিফা ছিলেন না, মুরীদ হলেও তিনি হলেন বিদয়াতী, বেশরা বাতিল ফেরকাদের অন্যতম। তার জীবনীতে আছে- তিনি মাদ্রাসা আলীয়া কোলকাতায় ১৮৯২-১৯১২ পর্য্যন্ত ২০ বছর হেড মাওলানা ছিলেন।

ঐ সময় কিন্তু বিহার নিবাসী শামসুল উলামা মাওলানা আহমদ সাহেব, ২০ বছর মাদ্রাসা আলিয়ার হেড মাওলানা ছিলেন- (১৮৯২-১৯১২)। ড. মুজিবর রহমান সাহেব লিখেছেন—তার পিতার নাম মাওলানা ওয়াজীহ বিহারী (১৮০৩-১৮৬৪)। দেখুন কতবড় কারসাজী, তার লিখিত কেতাবে (পুঁতির ছন্দে) বহু বাতিল মত ও আকীদার কথা লেখা আছে। হাক্বানী আলেম হলে এমন কখনই সম্ভব হতো না। শেষে তিনি হযরত সূফী ফতেহ আলী ওয়সীর কবর থেকে মাটি নিয়ে সুরেশ্বরে নকল মাজার করেছে।

হেডিংয়ে যখন "**খলিফা ও মুরীদের নাম**" উল্লেখ আছে, তখন নিশ্চিত হওয়া যায় যে - খলিফাদের সাথে মুরীদের নাম আছে। **সব 'খলিফা' মুরীদ, কিন্তু সব 'মুরীদ' খলিফা নন।**" কামেল ও কাবেল খলিফা তারাই পীরের পূর্ণ পদাঙ্ক অনুসরণ কারী ব্যক্তি 'খলিফা' নামে পরিচয়ের যোগ্য। পীরের মত ও পথের খেলাফ চলনেওয়ালা ব্যক্তি আর তাঁর মুরীদ থাকতে পারে না। দলের নীতিবিরুদ্ধ ব্যক্তি যেমন দলচ্যুত অবাঞ্ছিত বলে ঘোষিত। **তদ্রুপ সুরেশ্বরের মৌঃ আহমদ আলী হযরত ওয়সী পীরের খলিফা ও মুরীদের মধ্যে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ নন।**

হযরত সূফী ফতেহ আলী ওয়সী রহমতুল্লাহ ছিলেন খাটি শরিয়ত পন্থি পীর ও বুযর্গ। তিনি কোন পীরের মাজারে এমন কি নিজের পীরের মাজারে ফুল-চাদর চড়াননী। গান-বাদ্যতো দূরের কথা-বাদ্যযন্ত্র স্পর্শ করেননি। নারী-পুরুষ

সম্মিলিত ভাবে জিকরের নামে নর্তন কুন্দন করা তো বহু দূরের-কথা, পীর ও মুরীদা একত্রে বসেননি।

ফুরফুরা শরীফের পীর, মুজাদ্দেদে-যামান, আমিরুশ-শরিয়ত, হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী রহমতুল্লাহ এবং তদ্বীয় খলিফা বসিরহাটের বড় মাওলানা, ফকিহ্, মুহাদ্দিস, মুফাচ্ছির, মুসান্নিফ, মুবাহিস, পীর মাওলানা রূহল আমীন রহমতুল্লাহ সুরেশ্বরী সম্বন্ধে নিজ পীরের জীবনীতে ১২১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—

ফুরফুরা শরীফের পীর মোজাদ্দেদে-যামান, আমিরুশ শরিয়ত, হযরত মাওলানা শাহ সূফী আবু বকর সিদ্দিকী ফুরফুরাবী "যে সমস্ত দলকে ভ্রান্ত বিদয়াতী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন—তাহাদের মধ্যে নিম্নে কয়েক দলের কথা লিখিত হইতেছে—

সপ্তম ঃ- সুরেশ্বরীয়া, সুরেশ্বরের জান শরিফ হযরত সূফী মাওলানা ফতেহ আলি সাহেবের মুরিদ বলিয়া দাবি করিতেন। কিন্তু তাহার লিখিত কেতাবে বহু কাফেরী মূলক মত লিখিত আছে, এখন তাহার দলেরা, গানবাদ্য, পীরের পায়ে ছেজদা করা ও স্ত্রী পুরুষ একসঙ্গে হালকা করা, স্ত্রীলোকের দ্বারা খেদমত করান ইত্যাদি বহু হারাম কার্য করিয়া থাকে।"

আল্লামা রূহল আমীন রহঃ আরও লেখেন— "হযরত পীর সাহেবের পীর ভাই মাওলানা একরামূল হক সাহেব মুর্শিদাবাদী বলিয়াছেন, একদিন ছুফি সাহেব ফুরফুরার হযরত পীর সাহেবকে ডাকিয়া বলিলেন— বাবা আবু বকর, তুমি 'মোহইয়োছ-ছুন্নত ও 'আমিরোশ-শরিয়ত' হইবে। আর আমাকে বলিয়াছেন, বাবা একরামুল হক, তুমি কচ্ছপের ন্যায় ধীর গতিতে পাহাড় পর্বত হেদাএত করিবে।[৫৬]

(বিদয়াতী শুরেশ্বরীদের বাতিল কার্য্যকলাপের আরও পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। পরিশিষ্টে দেখা যেতে পারে)।

হযরত ওয়সী পীর যাঁকে "আমিরুশ-শরিয়ত" লকব দিয়েছেন, তিনি শরিয়তের দলিলে যে ফৎওয়া দিবেন, তা যে গ্রহণযোগ্য তাতে আর সন্দেহের অবকাশ নেই।

---

৫৬) হায়াতে একরাম - ৫৫ পৃঃ; মাওলানা পীরজাদা বাকী বিল্লাহ সিদ্দিকী সাহেব সংকলিত - ফুরফুরা পীর সাহেবের জীবন চরিত -২৭ পৃঃ।

হযরত ওয়সী পীর ও তাঁর সমস্ত খলিফাদের কেহই ঐ সব বিদয়াতী বেশরা, কুফরী আচরণ করেন নি। হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আমজাদ আলী শাহ উক্ত কার্য্যকলাপ কঠিন ভাবে নফরত করতেন।

সুরেশ্বরের বিদয়াতী মৌঃ আহমদ আলী সাহেব হযরত সূফী ওয়সী রহমাতুল্লাহ এর ইন্তেকালের পর তাঁর মানিক তলার 'কবর' থেকে মাটি নিয়ে গিয়ে সুরেশ্বরে হযরত ওয়সী পীরের 'নকল কবর' করেছে। তথায় নারীপুরুষ গীতবাদ্য সহ 'কবর' প্রদক্ষিণ করে। সেজন্য একশত বছরের মধ্যে তিনি ও তার কোন সাহেবযাদা মানিকতলায় যিয়ারতে আসেন নি।

কবর সিজদা, পীর সিজদা, নারী পুরুষ একত্রে মাজার তাওয়াফ করা, কবর ধোয়া, ফুল চাদর চড়ানো, গানবাদ্য করা, ইত্যাদি সুরেশ্বরীদের পরিচয়।

দাড়ীবিহীন গদ্দিনশীন, মুরীদদের মধ্যে দাড়ী রাখার প্রচলন অত্যান্ত নগন্য। এদের ইটোলজি—"পীর বাবাই সব"। পীর বাবাই সব করে দিবেন—[৫৭] নাউযুবিল্লাহ।

দিওয়ানে-ওয়সী কেতাবের শেষে ২০৭-২০৮ পৃষ্ঠায় হযরত ওয়সী রহমাতুল্লাহ খলিফা ও মুরীদদের নামের তালিকা পাওয়া যায়। যা কেতাব সংকলনকারী মৌলভী সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মীর হাসান শাহপুরী রহমাতুল্লাহ লিখেছেন। হযরত ওয়সী রহমাতুল্লাহ ইন্তেকালের ১২ বছর পর। দিওয়ানে ওয়সীতে ৩৫ জন, হায়াতে ওয়সীতে ৩৩ জন, ফুরফুরার পীর সাহেবের বিস্তারিত জীবনীতে- ৩৯ জন, হায়াতে-একরামে-৪০ জন। আয়নায়ে-ওয়সীতে ৪৩ জন। সংখ্যায় কম-বেশী যাই থাক না কেন। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার মধ্যে আবদ্ধ করা কখনই সঠিক সিদ্ধান্ত হতে পারে না। খাতা কলমে সংখ্যা ক্রমিক ও নাম যাই থাক না কেন, গুরুত্ব বিশেষ নয়। পিতা মাতার সন্তানদের মধ্যে কুসন্তান থাকতেও পারে, কিন্তু গুরুত্ব বা মর্যাদা সুসন্তানই পায়। কলেজ ও স্কুলের ছাত্র সবাই কিন্তু কেউ ডিগ্রী ডিপ্লোমা পেয়ে যশ্বরী হয় কেউ বা হয় সমাজ বিরোধী।

খেলাফত প্রাপ্ত প্রসঙ্গে হযরত সূফী ওয়সী রহমাতুল্লাহ নীতি সুস্পষ্ট, **"বাবা একরাম! খেলাফত দেওয়ার ক্ষমতা যদি আমার হাতে থাকিত তাহা হইলে আমি**

---

৫৭) হায়াতে একরাম - ৭৪ পৃঃ।

তোমাকে ইতিপূর্বে (খেলাফত) দিয়া দিতাম। অদ্য আল্লাহ পাকের তরফ হইতে ইশারা প্রাপ্ত হইয়া আমি তোমাকে খেলাফত দিতে চাহি। তুমি তাহাজ্জদের নামায অন্তে আমার পিছনে বসিয়া থাক।"[৫৮]

"হযরত মাওলানা শাহ সূফী কুতুবুজ্জামান সাইয়্যেদ একরামূল হক মুর্শিদাবাদী রহমাতুল্লাহ সাহেব কোতবুল-ইরশাদ, গওসে-সামদানী, শাহসূফী পীর সাইয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়সী রহঃ এর খেদমতে ৭ বছর ১০ মাস তালীমের পর আনুষ্ঠানিক ভাবে মুরীদী লাভ করেন। অতঃপর ১১ বছর ৯ মাস তালীম তাওয়াজ্জহে অতিবাহিত হলে - আনুষ্ঠানিক ভাবে খেলাফত প্রাপ্ত হইলেন। সর্বমোট ১৯ বছর ৭ মাস তালীম তাওয়াজ্জহ পেয়ে ছিলেন। নিষ্ঠা, ধৈর্য্য ও রিয়াযত তাকে ইনশাআল্লাহ উন্নতির চরম শিখরে আরোহণের অন্যতম পাথেয় ছিল। বর্তমানে ঐ ধরণের নিষ্ঠা, ধৈর্য্য ও রিয়াযাতকারী কয়জন পাওয়া যাইবে?"[৫৯]

মুজাদ্দেদে-আলফে সানী রহমাতুল্লাহ এর ভাষায় জানা যায় এমন অবস্থায় পীর ও মুরীদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। কেবলমাত্র শেকল-সুরাতে; কিন্তু

---

৫৮) প্রাগুক্ত - ৬৯ পৃঃ।

৫৯) বর্তমানে সুরেশ্বরের গদ্দিনশীন ফাসেক ও বিদায়াতী। ইদানিং বাংলাদেশের কতিপয় খলিফার খান্দানের 'মালিহালাত' দুর্বলতার সুযোগে তাদের মুরুব্বী সেজে কবরে গুম্বজ করে ফুল চাদর চড়িয়ে, বিদয়াতী বেশরা কার্য্য কলাপ প্রচলনের অপচেষ্টা করছে। সুদীর্ঘ শত বছর পর মানিকতলায় হযরত সূফী ফতেহ আলী ওয়সী রহমাতুল্লাহ এর চারপার্শ্বের নিজ পরম আত্মীয়দের কবরগুলো ধ্বংস করে বায়তুলমোকাদ্দাসের মডেলে মাজার করার অবৈধ প্রচেষ্টা করে ওয়সী মেমোরিয়াল এ্যাসোসিয়েশনের জনৈক কর্মকর্তার সহযোগিতায়। মোতাওয়াল্লীর বিনা অনুমতিতে, ওয়াকফ বোর্ড, কোলকাতা কে, এম, সি ও পুলিশ প্রশাসনের অনুমতি না নিয়ে রাতের অন্ধকারে কাজ আরম্ভ করে। নুরীয়া ফতেহীয়া - সিদ্দিকীয়া ফাউণ্ডেশন ফুরফুরা শরীফের পক্ষে আইনের সাহায্যে প্রতিরোধ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ওয়সী মেমোরিয়াল এ্যাসোসিয়েশনের সমর্থন ও সহযোগিতায় হযরত ওয়সী হুযুরের মাজারের ভিতর মাথার কাছে টাকার বাকস রেখে, ফুলচাদর চড়িয়ে, কবর ধুয়ে, মেয়েদের অবাধ যোগদানে নানা রকম বিদয়াতী, শিরকী কুফরী, কার্যকলাপ করে কোতবুল ইরশাদ, রাসুলে নোমা পীর সাহেবের মাজারকে বেহুরমতী করে অর্থ উপার্জনের অপকৌশল অবলম্বন করছে। অথচ এসব বেশরা কাজ ওয়সী হুযুরের কোন বংশধর এবং যোগ্যতম খলিফাগন, ও তাদের আওলাদেরা অদ্যবধি করেননি। সুরেশ্বরের মৌঃ আহমদ আলি নাকি কলিকাতা মাদ্রাসা আলীয়ায় বিশ (১৮৯২-১৯১২) বছর হেডমাওলানা ছিলেন। হেড মাওলানা আহমদ সাহেবের সময়ে আল্লামা রূহল আমীন (১৮৯৬-১৯১২) ছাত্র ছিলেন। সীরতে রূহল আমীন - ১১ পৃঃ। জলন্ত মিথ্যা, সে সময় মাদ্রাসা আলীয়ার হেড মাওলানা ছিলেন — মাওলানা আহমদ সাহেব, (১৮৯২-১৯১২) ড. মজিবর রহমান সাহেব লেখেন—তার পিতা মাওঃ ওয়াজিহ (১৮০৩-১৮৬৪) বিহারী। দ্বায়িত্ব নিয়ে প্রমাণ করুন। হেড মাওলানার তালিকায় সাইয়্যেদ মাওলানা আহমদ আলী সুরেশ্বরী নামে কেউ নেই। আছে-শামশুল উলামা হযরত মাওলানা আহমদ সাহেব। 'কোথায় আব্বাস আর কোথায় গাবগাছ!' ধন্যকারসাজী।

কোতবুল ইরশাদ সূফী সাইয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়সী রহমাতুল্লাহির

সীরাতে আমালে একাকার হয়ে যায়। মুরীদের চাল-চলন, আচার-আচারণ, নিয়ম-নীতি, আদব-আখলাক এমনকি সবই পীরের মতন হয়ে যায়। তেনারাই খলিফা, ফানাফিশ্ শায়েখ। —মকতুবাত শরীফ।

পাঠক/পাঠিকা এবার চিন্তা করুন কে খলিফা কে মুরীদ ছিলেন।

-ঃ *'খলিফা ও মুরীদের নাম'* ঃ-

* মাওলানা আবদুল হক সিদ্দিকী রহঃ, সিজগ্রাম, মুর্শিদাবাদ।
* শামসুল-উলামা, আল্লামা গোলাম সালমানী আব্বাসী রহঃ ফুরফুরা শরীফ, হুগলী।
* মোজাদ্দেদে-যামান, আমিরুশ শরিয়ত বাঙ্গালা, মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী, ফুরফুরা শরীফ, হুগলী।
* কুতবুজ্জমান, শাহসূফী সাইয়্যেদ একরামুল হক পুনাশী, মুর্শিদাবাদ।
* সাইয়্যেদ মোস্তাফা আলী সাজ্জাদানশীন, পুনাশী, মুর্শিদাবাদ।
* শামস বাজেগাতুদ্দহর, সাইয়্যেদা যোহরা খাতুন, শাহপুর, মুর্শিদাবাদ।
* মৌলানা এয়াজউদ্দীন আহমদ, আলিপুর, কোলকাতা সদর।
* সূফী নিয়ায আহমদ, কাৎরা পোতা, বর্দ্ধমান।
* মৌলভী মতিউর রহমনা, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
* হাফেজ ইবরাহীম।
* মৌলভী আবদুল আযীয, চন্দ্রজাহানাবাদ, হুগলী।
* মৌলানা আকবর আলী, সিলহেট।
* মৌলানা আমজাদ আলী, পাউসার, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা।
* মৌলভী আহমদ আলী, ফরিদপুর।
* শাহ দিদার বক্স, পদ্মপুকুর, হাওড়া।
* শাহ বাকাউল্লাহ, কানপুর, হুগলী।
* মৌলভী গণিমতুল্লাহ, ফুরফুরা, হুগলী।
* মুনশী সাদাকাতুল্লাহ, ফুরফুরা, হুগলী।
* মুনশী শারাফাতুল্লাহ, খাতুন, হুগলী।
* শেখ কোরবান আলী, বনিয়াতালাব, কোলকাতা।
* শামসুল-ওলামা, মৌলানা আশরাফ আলী, কোলকাতা।

* সাইয়্যেদ ওয়াজেদ আলী শাহ, মেহদীবাগ, কোলকাতা।
* মৌলভী গুলহোসাঈন, খোরাসানী।
* মৌলভী আতাউর রহমান, ২৪ পরগণা।
* মৌলভী মবিনুল্লাহ, রামপাড়া, হুগলী।
* মৌলভী সাইয়্যেদ জোলফিকার আলী, টীটাগড়, ২৪ পরগণা।
* মৌলভী আতায় এলাহি, মোঙ্গলকোট, বর্দ্ধমান।
* মুনশী সোলায়মান, বারাসাত, ২৪ পরগণা উঃ।
* মৌলভী নাসিরুদ্দীন, নদীয়া।
* মৌলভী আবদুল কাদের, ফরিদপুর।
* মৌলভী কাজী খোদা নেওয়াজ, হুগলী।
* মৌলভী আবদুল কাদের, বৈদ্যবাদী, হুগলী।
* কাজী ফাছাহতুল্লাহ, ২৪ পরগণা।
* শেখ লাল মুহাম্মদ, চুঁচূড়া, হুগলী।
* মৌলভী সাইয়্যেদ আযমহোসেন, মোহাজেরে মদিনা শরীফ।
* মৌলভী ওবায়দুল্লাহ, শান্তিপুর, নদীয়া।
* হাফেজ মুহাম্মদ ইবরাহীম, ফুরফুরা, হুগলী।
* মৌলভী আবদুর রহমান, সৈয়দপুর, টাকী, ২৪ পরগণা।
* শাহ তালেবুল্লাহ, বাগবাজার, কোলকাতা।
* মুনশী গোলাম আবেদমোল্লা, মোল্লাশিমলা, হুগলী।
* মাওলানা আবদুল মজিদ, সাতকনিয়া চরতীগ্রাম, চট্টগ্রাম।
* কাজী মমিজুল হক সাহেব, মঙ্গলকোট, (কাজী ডাঃ আবুতোরাব সাহেবের নানা)
* কাজী জালাল হুসাইন সাহেব, মঙ্গলকোট, (কাজী ডাঃ আবুতোরাব সাহেবের দাদা)
* মৌলভী সায়েম সাহেব, শোলপুর, যুগিয়াটী, খুলনা।
* খোরাসানী হযরত।

খলিফা ও মুরীদদের পরিচয়

* হযরত মাওলানা আবদুল হক সিদ্দিকী রহঃ

হযরত মাওলানা পীর আবদুল হক সিদ্দিকী রহমাতুল্লাহ মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার সিজগ্রামের অধিবাসী এবং সিদ্দিকী বংশের উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। তাঁর পিতার নাম হযরত মাওলানা ছাবেত সিদ্দিকী এবং দাদার নাম মাওলানা ওয়েজ সিদ্দিকী। ফুরফুরা শরীফের পীর মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী সাহেব তাঁর পীর ভাইও একই সিদ্দিকী বংশের হযরত জিয়াউদ্দীন জাহেদ সিদ্দিকীর বংশধর।

তিনি একজন মোহাক্কেক আলেম ও বুযর্গ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন সূফী ছিলেন। তার সাহেবযাদা হযরত মাওলানা আবদুল হাই সিদ্দিকী সিজগ্রামে বসবাস করতেন। হযরত মাওলানা আবদুল হাই সিদ্দিকী সাহেব ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দিকী সাহেবের হাতে বয়াত গ্রহণ করে খেলাফত প্রাপ্ত হন।

হযরত মাওলানা আবদুল হক সিদ্দিকী ১৬ই পৌষ ১২৯৫ বাংলা, ৩১শে ডিসেম্বর ১৮৮৮ সাল, হিজরী ১১ই রবিউল আওয়াল ১৩০৬, ইন্তেকাল করেন। তার মাজার মুর্শিদাবাদের সিজগ্রামের কবরস্থানে শিরক-বিদয়াত মুক্ত অবস্থায় বিদ্যমান।

হযরত সূফী ওয়সী পীরের কামেল খলিফা, তিনি পীরের মাসলাকের পূর্ণ-অনুসারী ও আরবী, ফার্সীভাষায় অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। কবর সিজদা, ফুল চাদর চড়ানো, পীর সিজদা, কবর ধোয়া ও তওয়াফ করা প্রভৃতি শিরক বিদয়াতের চরম রিবোধী ছিলেন।

* শামসুল উলামা গোলাম সালমানী আব্বাসী রহঃ

সুলতানুল আরেফীন, হযরত পীর গোলাম সালমানী আব্বাসী রহমাতুল্লাহ আব্বাসী বংশের উজ্জ্বল রত্ন ফুরফুরাশরীফে ১লা জুলাই - ১৮৫৪, বাংলা - ১৭ই আষাঢ় ১২৬১ ও ৫ই সওয়াল ১২৭০ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মহামান্য পিতার নাম মাওলানা গোলাম রাব্বানী। তিনি একজন সুশিক্ষিত মুনসেফ ছিলেন। ১২৬৮ সালের ২১ শে পৌষ একমাত্র পুত্রসন্তান রেখে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মাজার শরিয়ত মোতাবেক ফুরফুরা শরীফে বিদ্যমান। হযরত মাওলানা গোলাম সালমানী আব্বাসী সাহেব অত্যান্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ফুরফুরা শরীফে প্রাথমিক তালীম প্রাপ্ত হন এবং হুগলী মোহসেনীয়া মাদ্রাসায় অধ্যায়ন করেন। শেষে কোলকাতা মাদ্রাসা আলীয়া থেকে উচ্চতর

ডিগ্রী প্রাপ্ত হন। অতঃপর তিনি হুগলী সিনিয়র মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। ১৯১০ সালের ২২ শে ফেব্রুয়ারী পুনঃ হুগলী মোহসেনিয়া মাদ্রাসার ডেপুটি সুপারিনটেন্ড পদে যোগ দান করেন।

পরবর্ত্তী কালে কোলকাতা মাদ্রাসা আলীয়ার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯১১ সালের ১২ ই ডিসেম্বর তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'শামসুল উলামা' খেতাবে ভূষিত করেন। *

১ লা জুলাই ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে, ১৫ই রজব ১৩৩০ হিজরী, ১৭ই আষাঢ় ১৩১৯ সালের সোমবার বেলা ৫টায় ইন্তেকাল করেন। —রহমানী।

যুগশ্রেষ্ঠ বুযর্গ সূফী ফতেহ আলী ওয়সী সাহেবের দস্তে বায়য়ত গ্রহণ করেন। তাঁর নেক দৃষ্টি ও রিয়াযত মেহনতের ফলে অতি উচ্চ মাকাম ত্বয় করে খেলাফত প্রাপ্ত হন। ইতি 'বড় মাওলানা' সাহেব নামে খ্যাত। মক্কা মোয়জ্জমার আলেমেরা তাঁকে 'শাইখুল হিন্দ' খেতাবে ভূষিত করেন।

অতুলনীয় আলেম ও বোযর্গ ছিলেন, তিনি আত্মগোপনকারী বিদগ্ধ মহাজন। তাঁর গুণের কথা বলে শেষ করা যায় না। সে যুগে সম্ভ্রান্ত বংশীয় ও উচ্চশিক্ষিত মানুষ নওয়াব যাদা, খানবাহাদুর তাঁর মুরীদ ও ভক্ত। বসিরহাটের খানবাহাদুর আবুল খায়ের মুহাম্মদ সিদ্দিক, ওয়সী পীরের মাজার শরীফ ওয়াকফ ভুক্ত করেন। খানবাহাদুর সোলায়মান, ওয়সী পীরের ২৭ শে রমজান ইসালে সওয়াবের ইফতারীর ইন্তেজামকারী তাঁর মুরীদ ছিলেন।

বড় মাওলানা কোন মাসায়ালা-মাসায়েল তাহকীক না করে বলতেন না। প্রতিটি পদক্ষেপ অত্যান্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে করতেন। এমনকি নিজের মুরীদের লিখিত কেতাবেও হট করে নিজ মন্তব্য দিতেন না। মাওলানা অলিমুদ্দীন মহেশপুরী (বগুড়া) স্বীয় 'আনিসুল আশেকীন' কিতাবের ভূমিকায় লিখেছেন— আনিসুল আশেকীন কিতাব ছাপার সময় প্রতি ফরমা তাঁকে পড়ে শোনান হত। ২২ ফরমা পর্যন্ত্য তিনি শুনে সন্তুষ্ট হয়ে স্বাক্ষর করেন এবং তিনটি ভুল সংশোধন করেছেন।

মাওলানা আলিমুদ্দীন মহেশপুরী কৃত- 'আনিসূল আশেকিন', মাওলানা আবদুল্লাহ সিলহেটি কৃত 'মিরয়াতুস্ সলুক' কেতাবে এবং মৎপ্রণীত 'ফুরফুরা শরীফের ইতিবৃত্ত' পুস্তকে তাঁর বিস্তারিত জীবনী পাবেন।

---

* কোন কোন পুস্তকে ১৯১০ সালে 'শামসুল উলামা' খেতাব প্রদানের কথা লিখেছেন, এ তথ্য সঠিক নয়। আমি 'ফুরফুরা শরীফের ইতিবৃত্ত' পুস্তকে উক্ত সনদের ফটো কপি দিয়েছি।

'ফুরফুরা শরীফের ইতিবৃত্ত' পুস্তকের ৫৫ পৃষ্ঠা থেকে—

তাঁর কয়েকজন উপযুক্ত খলীফা ও মুরীদের নাম—

১। জনাব হযরত সূফী শাহ মাহতাবুদ্দীন রহমাতুল্লাহ, সাগরকান্দি, পাবনা।

২। জনাব হযরত মাওলানা হাজী আবদুল্লাহ রহমাতুল্লাহ, সিলেট।

৩। জনাব হযরত মৌলভী ইয়াকুব রহমাতুল্লাহ, বগুড়া।

৪। জনাব হযরত হবিবুর রহমান রহমাতুল্লাহ, বগুড়া।

৫। জনাব হযরত আবদুল হালীম রহমাতুল্লাহ, খুলনা।

৬। জনাব হযরত আবদুল জাওয়াদ রহমাতুল্লাহ, উকিল হাইকোর্ট, কলিকাতা।

৭। জনাব হযরত আমিন-উল-ইসলাম রহমাতুল্লাহ, জেনারেল ইনস্পেকটর, কলিকাতা।

৮। জনাব হযরত শাহজাদা নওয়াব সোলতান আলম রহমাতুল্লাহ, টালিগঞ্জ, কলিকাতা।

৯। জনাব হযরত মৌলভী ফজলে করিম, রহমাতুল্লাহ কলিকাতা।

১০। জনাব হযরত হাজী আবদুল লতিফ রহমাতুল্লাহ, ইন্সপেক্টর, বর্ধমান।

১১। জনাব হযরত হাজী আবদুল গফফার রহমাতুল্লাহ, জব হাসপাতাল।

১২। জনাব হযরত মৌলবী হায়দার আলী রহমাতুল্লাহ, সিলেট।

১৩। জনাব হযরত আব্দুল করীম রহমাতুল্লাহ, বি.এ., কলিকাতা।

১৪। জনাব হযরত মাওলানা হেকীম মুহাম্মদ মাজহার রহমাতুল্লাহ।

১৫। জনাব হযরত মৌলভী হাফিজ ফৎহে নসিব রহমাতুল্লাহ, কলিকাতা।

১৬। জনাব হযরত তাফাজ্জুল আলী রহমাতুল্লাহ, শায়ের, সিলেট।

১৭। জনাব হযরত হাফিজুদ্দীন রহমাতুল্লাহ।

১৮। জনাব হযরত হাফেজ পীর সাইয়্যেদ আব্দুল বারী রহমাতুল্লাহ, ব্যাণ্ডেল, হুগলী। প্রমুখ।

শাহ মাহতাবুদ্দীন সাহেব সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য 'ফুরফুরা শরীফের ইতিবৃত্ত' পুস্তকে পাবেন।

সাইয়েদ আব্দুল বারী সাহেব রহমাতুল্লাহ খলীফা আজমগড়ের খ্যাতনামা খলীফা হযরত মাওলানা হামেদ হাসান আলভী রহমাতুল্লাহ খলীফা চট্টগ্রামের গাএর রাংগিয়ার হযরত মাওলানা আব্দুল মাজিদ রহমাতুল্লাহ চট্টগ্রাম।

জনাব সূফী মাহতাবউদ্দীন, সাগরকান্দি, পাবনা, বাংলাদেশ, হযরত সূফী আবদুল বারি সাহেব ব্যাণ্ডেল, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত অন্যতম।[৬০]

তাঁর একমাত্র পুত্র হযরত মাওলানা আবুল বারাকাত গোলাম মহিউদ্দীন সাহেব (১৯০৩-১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দ)। তাঁর দু পুত্র মৌলভী শামসুদ্দীন ও হযরত মাওলানা হুশামুদ্দীন খ্যাতনামা বক্তা ও আলেম, ফুরফুরা শরীফে বসবাস করছেন। খান্দানে তরীকতের সিলসিলা জারী পাওয়া যায় না।

* মুজাদ্দেদে-যামান পীর,

* মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী রহমাতুল্লাহ

উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ সংস্কারক, শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হযরত মাওলানা শাহসূফী পীর আবু বকর সিদ্দিকী ছিলেন— কোতবুল ইরশাদ হযরত সূফী সাইয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়সী রহমাতুল্লাহ সমস্ত খলিফাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। তাঁর কোলে মাথা রেখে হযরত ওয়সী পীর ইন্তেকাল করেন, তাঁর থেকে শেষকালে 'জামেয়ার ফয়েয' প্রাপ্ত এবং পীর কর্ত্তৃক তিনি মুজাদ্দেদে-যামান ও আমিরুশ-শরিয়ত' লকবে ভূষিত হন।

তার পীরের দু'য়ায় মুজাদ্দেদে-যামান, ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেবকে আল্লাহপাক এমন আলাদরজা এনায়েত করেন যে, পাক-ভারতে তথা এশিয়া মাইনরে তাঁর বুযর্গী ও পীরত্বের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে, ফলে পাক-ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ও আরব আযম থেকে অসংখ্য খ্যাতিমান ব্যক্তিরা তাঁর খেদমতে হাযির হয়ে দস্তে বায়য়ত লাভ করেন। এমনকি হযরত ওয়সী রহমাতুল্লাহির অধিকাংশ খলিফার খান্দান ও মুরীদগন ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেবের হাতে মুরীদ হয়ে তালীম ও তাওয়াজ্জহ গ্রহণ করেন।

তদ্বীয় পীর ও মুর্শিদ কোতবুল-ইরশাদ হযরত সাইয়্যেদ সূফী ফতেহ আলী ওয়সী রহমাতুল্লাহ এর শেষ কৃতকার্য্য সমূহ তার মাতাহাতে সুসম্পন্ন হয়। তিনি ছিলেন— পীরগত প্রাণ। পীরের জুতা মাথায় করে পীরের চলমান পালকীর সাথে খুশীমনে

---

৬০) ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনের অনতিদূরে মসজিদের কাছে তাঁর মাজার শরীফ। তাঁর খলিফা প্রখ্যাত আলেমেদ্বীন, হযরত মাওলানা সাঈদ খান সাহেব, তাঁর খলিফা হাফেয হামেদ হাসান আলুবী রহমাতুল্লাহ। গবেষণা মূলক বৃহৎ পুস্তক 'আয়নায়ে-ওয়সী'র লেখক ড. মতিউর রহমান (পাটনা) প্রমুখ সিলসিলা জারী আছে।

খুশীমনে চলতেন। পীরের কলিজা নিংড়ানো দু'য়ার বদৌলতে আল্লাহপাক তাঁকে এমন মালামাল করে ছিলেন যে, বঙ্গ আসাম তথা ভারতে তাঁর বোযর্গীও অবদান দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত।

বহু লক্ষ তাঁর মুরীদ মুতাকেদীন, খলিফা তাঁর কয়েক হাজারের সন্ধান পাওয়া যায়। সব গাছে ফুল-ফল ধরে না, আবার অনেক গাছ-ফল-ফুলে পরিশোভিত। তেমনি হযরত ওয়সী হযরতের অনেক খলিফার মুরীদ আছে কিন্তু খলিফার সন্ধান পাওয়া যায় না। এমনকি অনেক খলিফাদের ইন্তেকালে খান্দানে পীরি-মুরিদী সিলসিলা জারী দেখতে পাওয়া যায় না। আবার অনেক খলিফার দরবার এখনও গোলজারে গোলজার আছে।

পীরের খ্যাতি তদ্বীয় খলিফাদের মাধ্যমে বিকাশ সাধন হয়। আর হক্কানী, রব্বানী পীরের আলামত-যুগের বড় বড় আলেমেদ্বীন ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বুদ্ধিজীবিরা তার দস্তে বায়য়ত গ্রহণ করে।

"সওয়ানেহে উমরী গওসে সামদানী পীরে ফুরফুরা" উর্দ্দু জীবনীতে হযরত মাওলানা সূফী আবদুল মাবুদ পিয়ারডাঙ্গা মেদেনীপুরী রহমাতুল্লাহ আল্লামায়ে হিন্দ পীর রূহল আমীন কৃত 'ফুরফুরা শরীফের হযরত পীর সাহেবের বিস্তারিত জীবনী' পুস্তকে, আন্তর্জাতিক খ্যতিসম্পন্ন বহুভাষা তত্ত্ববিদ, বিদগ্ধ মহাজন হযরত মাওলানা ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ পিয়ারা সুম্মা ঢাকা, কৃত 'ইসলাম প্রসঙ্গ পুস্তকে, খ্যাতনামা বাগ্মী, মুহাম্মদ ইবরাহীম তর্কবাগিশ তার 'হাক্কিকাতে-ইনসানিয়াত' পুস্তকে ফুরফুরা হযরতের খলিফাদের সুবৃহৎ তালিকা দিয়েছেন।

তন্মধ্যে অন্যতম কতিপয় খলিফাদের নাম —

* ফকিহ মুহাদ্দিস, মুফাচ্ছির, মুবাহিস, মুসান্নিফ হযরত পীর আল্লামা রূহল আমীন রহমাতুল্লাহ বসিরহাট, ২৪ পরগণা। * পূর্ববঙ্গের বিখ্যাত পীর ও বুযর্গ, আলেমেদ্বীন, বহু গ্রন্থ প্রণেতা - হযরত মাওলানা শাহ সূফী পীর নিসারউদ্দীন আহমদ রহমাতুল্লাহ সর্ষিনা, বরিশাল। * শাহসূফী পীর তাজ্জমল হোসেন সিদ্দিকী রহঃ নদীয়া-শান্তিপুর। * শাহসূফী পীর সদরুদ্দীন আহমদ রহমাতুল্লাহ যশোর সুম্মা ফেণী। * সাইয়্যেদুল আবদাল, শাহসূফী পীর আবদুল মোমেন রহমাতুল্লাহ বাঁকুল, হাওড়া। * শাহসূফী পীর হাতেম আলী সিদ্দিকী রহমাতুল্লাহ গোফরান পুর, কুমিল্লা। * শাহসূফী পীর অধ্যাপক আবদুল খালেক রহমাতুল্লাহ ছতুরা, কুমিল্লা। *

ভাষাতত্ত্ববিদ, বিদগ্ধমহাজন হযরত আল্লামা ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ রহমাতুল্লাহ (পিয়ারা) ঢাকা। * শাহসূফী পীর মাওলানা আবদুর রহমান রহমাতুল্লাহ সোনাকান্দা, কুমিল্লা। * শাহসূফী পীর মাওলানা আজিমুদ্দীন রহমাতুল্লাহ ধামতী, কুমিল্লা। * হযরত মাওলানা শাহ সূফী আবদুল মাবুদ ফারুকী রহমাতুল্লাহ পিয়ারডাঙ্গা, মেদিনীপুর। * হযরত মাওলানা আবদুদ্দাইয়ান ফারুকী রহমাতুল্লাহ পিয়ারডাঙ্গা, মেদিনীপুর। * হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আহমাদুল্লাহ রহমাতুল্লাহ, পিয়ারডাঙ্গা মেদিনীপুর। * মোহাক্কেক আলেমেদ্বীন, হযরত মাওলানা আবদুল আযীয রহমাতুল্লাহ কনকপুরী, হুগলী। * হযরত মাওলানা পীর মফিজদ্দীন রহমাতুল্লাহ বাজিতপুরী, গাইবান্ধা। * হযরত মাওলানা মুফতী পীর ইবরাহীম রহমাতুল্লাহ মহব্বতপুরী, জয়পুরহাট। * হযরত মাওলানা পীর বহুগন্থ প্রণেতা ময়েজদ্দীন হামীদী রহমাতুল্লাহ, হামিদপুর, খুলনা। * হযরত মাওলানা বজলুর রহমান রহমাতুল্লাহ দরগাহপুরী, খোলাপোতা। * শাহসূফী পীর আবদুল হামিদ রহমাতুল্লাহ মাগুরা, যশোহর। * শাহসূফী পীর জয়নাল আবেদীন রহমাতুল্লাহ ঠনঠনিয়া, বগুড়া। * মাওলানা আবদুল হাই রহমাতুল্লাহ শিজগ্রাম, মুর্শিদাবাদ। * হযরত মাওলানা শাহসূফী আবদুল গণি রহমাতুল্লাহ নিজামপুরী সূফিয়া, চট্টগ্রাম। * সূফীকারী নুরুল হুদা রহমাতুল্লাহ, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম। * হযরত মাওলানা অজহি উল্লাহ রহমাতুল্লাহ সন্দীপী। * হাফেজ সাইয়্যেদ বসিরুদ্দীন রহমাতুল্লাহ, ঢাকা। * মুফতীকাজী নূরআলী রহমাতুল্লাহ, বাঁদপুরী হুগলী। * মাওলানা ইউসুফ আলী রহমাতুল্লাহ, রামপাড়া, হুগলী, আল্লামা অজিহুল্লাহ রহমাতুল্লাহ সন্দপী, মাওঃ আহমদ আলী রহমাতুল্লাহ এনায়েত পুরী- যশোর। * জনাব হাজী নবাব আলী রহমাতুল্লাহ হাদোল পাবনা। * জনাব আবদুল আযীয রহমাতুল্লাহ পীর -নগর, হুগলী। প্রমুখ।

ফুরফুরা শরীফের মোজাদ্দেদে-যামান, পীর আবু বকর সিদ্দিকী আলকোরায়সী বিশ্বনবী, আঁকা মাওলা, সাইয়েদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রধান খলিফা আমিরুল মোমেনীন সিদ্দীকে-আকবর হযরত আবু বকর সিদ্দিকী আলকোরায়সী রাদি আল্লাহু আনহুর বংশধর। তাঁর ৬ষ্ঠ পুরুষ কোতবুল আকতাব হযরত মোস্তাফা মাদানী রহমাতুল্লাহ ছিলেন— মুজাদ্দেদে-আলফেসানী সাইয়্যেদ আহমদ ফারুকী রহমাতুল্লাহ সুযোগ্য সাহেবযাদা কাইয়ূমেসানী হযরত মাসুম রব্বানী ফারুকী রহমাতুল্লাহ অন্যতম খলিফা এবং দিল্লীর বাদশাহ হাফেয আলমগীব আওরঙ্গজেবের পীর ভাই।

পীর আবু বকর সিদ্দিকী রহমাতুল্লাহ সীতাপুর মাদ্রাসায় পড়াশোনার পর হুগলী মোহসেনিয়া মাদ্রাসা থেকে সর্বউচ্চ ডিগ্রী প্রাপ্ত এবং হযরত বেলায়েতি মাওলানা ও হাফেয জামালুদ্দীন (সিঙ্গুরিয়া পট্টি) সাহেব থেকে হাদীস, তফসির দাওরা খতম করেন এবং হিকমত, মান্তেক শিক্ষা গ্রহণ করেন, সর্বপরি মদিনা মনোয়ারায় হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাজারের মোজাবের হযরত মাওলানা শাইখুদ্দালাএল সাইয়্যেদ আমীন রেদওয়ান রহমাতুল্লাহ কর্তৃক চল্লিশটি হাদীসের সনদ প্রাপ্ত হন। আল্লামা রূহল আমীন সাহেব তাঁর জীবনী পুস্তকে উক্ত ৪০ টি হাদীসের কেতাবের নাম উল্লেখ করেছেন। সে সব কেতাবের নাম 'ফুরফুরা শরীফের ইতিবৃত্ত' পুস্তকে আছে।

যুগশ্রেষ্ঠ পীর ও বুযর্গ কুতবুল ইরশাদ, রাসুলনোমা পীর হযরত সূফী সাইয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়সী সাহেবের দস্তে বায়য়ত গ্রহণ করে দীর্ঘদিন সোহবত এখতিয়ার ও কঠোর রিয়াযাত, মেহনতের ফলে স্বীয় পীর ও মুর্শিদ থেকে খেলাফতের অমূল্য নিয়ামত লাভ করেন এবং বায়য়ত ও তালীমের এজাযত প্রাপ্ত হন। তাঁর পীরের দুয়ার বদৌলতে ভূভারতে প্রভাব প্রতিপত্তি, ইজ্জত ও সম্মান অন্যান্য সমস্ত পীর ভাইয়ের থেকে অনেক গুণ বৃদ্ধি পায়; যেহেতু তিনি ছিলেন - **মুজাদ্দেদে-যামান, আমীরুশ-শরিয়ত।**

বঙ্গ-আসামের অধিকাংশ মসজিদ, ঈদগাহ, খানকাহ, মাদ্রাসায় তাঁর 'সিদ্দিকীয়া' নাম বিজড়িত। তাঁর দ্বীনি খিদমত ও বোযর্গীর কথা লিখলে পৃথক একটি বৃহৎ পুস্তক হয়ে যাবে। অধ্যাবধি তাঁর জীবন-চরিত বা জীবনী বাংলা ও উর্দ্দু ভাষায় (ছোট-বড়) ২০/২৫ খানা পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে আল্লামা পীর রুহল আমীন বশিরহাটী কৃত — 'ফুরফুরার হযরত পীর সাহেবের বিস্তারিত জীবনী, মৌলভী আবদুস সাত্তার সাহেব (ঢাকা) কৃত — 'এমামুল হুদা হযরত পীর সাহেবের জীবন-চরিত', মাওলানা সূফী আবদুল মাবুদ ফারুকী মেদিনীপুরী কৃত 'সওয়ানেহে উমরী গওসে সামদানী পীরে ফুরফুরা' (উর্দ্দু)। মুফতীয় বাংলা-আসাম, হযরত পীর আবু যাফর সিদ্দিকী (মেজলা হুযুর) ফুরফুরাবী সাহেবের আদেশে ও যত্নে পীরযাদা হযরত মাওলানা বাকী বিল্লাহ সিদ্দিকী কর্তৃক সংকলিত —''আমিরুশ-শরিয়ত মুজাদ্দেদে

মিল্লাত ফুরফুরা পীর সাহেব (রঃ) এর জীবন চরিত', মাওলানা ইব্রাহীম তর্কবাগিশ কর্তৃক প্রণীত "হাক্কিকাতে-ইনসানিয়াত', মৎপ্রণীত-'ফুরফুরা শরীফের ইতিবৃত্ত' সাইয়্যেদ বাহাউদ্দীন প্রণীত 'ফুরফুরার হযরত' সমধিক প্রসিদ্ধ। এ খান্দানে পীরি- মুরীদি সিলসিলা অদ্যাবধি সুনামের সাথে জারী আছে।

শরিয়তের লক্ত নজরে শিরক-বিদায়াত মুক্ত নির্ভেজাল "সিলসিলায়ে-ফুরফুরা শরীফ" এর মতাদর্শ এক বিশেষ মর্যদায় ভূষিত। যা দেওবন্দী মতবাদও বেরেলী মতাবাদ থেকে স্বতন্ত্র মতবাদ "সিলসিলায়ে ফুরফুরা শরীফ।" বিস্তারিত জানতে হলে- **'ফুরফুরা শরীফের ইতিবৃত্ত' পুস্তক সংগ্রহ করুন।**

তিনি ১২৬৩ হিজরী সন মোতাবেক ইংরাজী ১৮৪৬, বাংলা ১২৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়া থানার অধীন ফুরফুরা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। নয় মাস বয়সে তিনি পিতৃ হারা হয়ে মাতৃক্রোড়ে প্রতিপালিত হন।

তিনি ৩৮ টি সন্তান-সন্ততির জনক হলেও ইন্তেকালের সময় পাঁচ পুত্র ও পাঁচ কন্যা রেখে ৩রা চৈত্র ১৩৪৫, ১৭ই মার্চ ১৯৩৯, ২৫শে মহরম ১৩৫৮ শুক্রবার ভোরে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মাজার মুবারক ফুরফুরা শরীফে বিদ্যমান। তাঁর বদৌলতে চিরধন্য ফুরফুরা শরীফ।

১ম পুত্র — কাইয়ূমে যামান, শাহসূফী পীর আবু নসর আবদুল হাই সিদ্দিকী রহঃ (বড় হুযুর)

২য় পুত্র — শেইখুল মাশায়েখ, শাহ সূফী পীর আল্লামা মুফতী আবু যাফর সিদ্দিকী রহঃ মেজলা হুযুর।

৩য় পুত্র — মোজাহেদে-মিল্লাত, মাওলানা পীর আবদুল কাদের সিদ্দিকী সেজলা হুযুর।

৪র্থ পুত্র — সুলতানুল আরেফীন, পীর, নজমুস্ সায়াদাত সিদ্দিকী, ন'হুযুর।

৫ম পুত্র — আশেকে রাসুল, পীর, জোলফিকার আলী সিদ্দিকী, ছোট হুযুর।

তাদের ৫ ভাইয়ের ৩২ জন পুত্র সন্তান। ৪ সাহেবযাদা পর্দা নিয়েছেন, বর্তমানে ২৮ জন যথা মর্যাদায় ইশায়াতে ইসলাম, সমাজসেবা, পীরিমুরীদি সিলসিলা জারী রেখে দ্বীনের খেদমতে রত আছেন।

২৭শে রমযান প্রতিবছর স্বীয় পীর ও মুর্শিদ রহঃ মাজার শরীফে ২৪/১, মুনশী পাড়া লেন, মানিকতলা, কোলকাতা-৬ 'মাহফিলে ওয়াজ দরজেম্নে

আঁইসালে সওয়াব' কায়েম করেন। 'ফুরফুরা ফাতেহিয়া টাইটেল মাদ্রাসা' ও ফুরফুরা শরীফে ২১, ২২ ও ২৩শে ফাল্গুন বাৎসরিক ঈসালে সওয়াব, চট্টগ্রামের নিজামপুরে তাঁর দাদাপীরের নামে 'সুফিয়া নূরীয়া মাদ্রাসা'। বগুড়ায় তার দাদার নামে মোস্তাফাবিয়া ডবল টাইটেল মাদ্রাসা (সরকারী) প্রভৃতি তাঁর অমর অবদান এবং পীর ভক্তির পরম নিদর্শন।

* কুতুবুজ্জমান পীর সূফী একরামূল হক রহঃ

সিরাজস্ সালেকীন, শামসুল আরেফীন কুতুবুজ্জামান শাহ সূফী সাইয়্যেদ একরামূল হক সাহেব মুর্শিদাবাদ জিলার ভরত পুর থানার পুনাশী শরীফে আনুমানিক ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ মোতাবেক সন ১২৫৮ সালের কোন এক শুভ মুহর্তে কোচবিহার জিলার ঝলঝলিয়া স্টেটে[৫৯] তাঁর নানার বাড়ী জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি ছিলেন— শেরে খোদা হযরত আলী কার্রামাল্লাহু অজহু বংশীয় হযরত (হাসান) মাসান্না রাঃ বংশধর। তাঁর পূর্ব পুরুষ 'তরতুশ' নগরী থেকে হিজরত করে এলাহাবাদের 'কড়াহ মানিকপুর' নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। এ বংশের উজ্জ্বল রত্ন জোদাতুল আরেফীন, শাহ সূফী পীর সাইয়্যেদ আবদুল আযীয কদ্দুঃ এলাহাবাদ থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বোযর্গ মনোহরপুর - 'পানাহছী' হয় অধুনা 'পুনাশী'[৬০] নামে খ্যাত। এই পুনাশী শরীফে কোতবুল ইরশাদ সূফী ফতেহ আলী ওয়সী রহঃ বসতবাড়ী নির্মাণ করে বসবাস করতেন। তার স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র সাইয়্যেদ মোস্তাফা আলী রহঃ মাজার পুনাশী। তার পোতা সাইয়্যেদ মসউদার রহমান সাহেব পুনাশী শরীফে বসবাস করতেন। তার ছোট সাহেবজাদী সাইয়্যেদা হুসনে আরার শাদী মুবারক সূফী সাইয়্যেদ একরামুল হক রহঃ পোতা হযরত মাওলানা জিয়াউল হক সাহেবের সাথে হয়। বর্তমানে তারা সূফী সাহেবের বাড়ীতে ৪ পুত্র ও ৪ কন্যা সহ স্বামী-স্ত্রী বসবাস করছেন।

তিনি প্রথমে মেদেনীপুর শহরের সাইয়্যেদ মোরশেদ আলী আল কাদরী রহমাতুল্লাহ এর কাছে মুরীদ হন। তাঁর সম্মতিক্রমে তিনি সূফী ফতেহ আলী ওয়সী রহমাতুল্লাহ দস্তে বায়য়ত গ্রহণ করেন। ৭ বছর দশ মাস ভাবের আদান প্রদান এবং

এক নাগাড়ে প্রায় ১১ বছরের ৯ মাসের অধিককাল পীরের সোহবত এখতিয়ার করে অত্যন্ত কঠিন মেহনত করে তিনি 'কামালাত' হাসিল করেন। ক্বাদরীয়া, চিস্তিয়া মোজাদ্দেদীয়া ও নকশাবন্দীয়া তরীকাগুলো সম্পূর্ণত্বয় করে 'খিলাফৎ' প্রাপ্ত হন। সূফী সাহেব তাকে ডেকে বলেন — "বাবা একরাম। খিলাফত দেওয়ার ক্ষমতা যদি আমার হাতে থাকিত, তাহা হইলে আমি তোমাকে ইতিপূর্বে (খিলাফত) দিয়া দিতাম। অদ্য আল্লাহ্ পাকের তরফ হইতে ইশারা প্রাপ্ত হইয়া আমি তোমাকে খেলাফত দিতে চাহি। তুমি তাহাজ্জদের নামাজ অন্তে আমার পিছনে বসিয়া যাও।"[৬১]

সূফী ওয়সী রহমাতুল্লাহ নিজে ফারসী ভাষায় সূফী একরামূল হক রহমাতুল্যাহর ভূয়সী প্রশংসা করে লিখেছেন। সে পত্রের উদ্ধৃতি হুবহু 'হায়াতে ওয়সী' কেতাবে ও 'হায়াতে-একরাম' কেতাবে আছে।

খেলাফত প্রাপ্ত হয়ে প্রায় ৩০ বছর ডুয়ার্স ও আসামের পাহাড় জঙ্গলে ছায়ের করে ছিলেন। জঙ্গলের হিংস্র জীবজন্তু তথা বাঘ, ভালুক, গণ্ডার, হাতী তাকে সালাম করতো এবং খেদমতে থাকতো। তাঁর সেসব অলৌকিক ঘটনাবলী ও বিস্তারিত জীবনী জানতে হলে মৎপ্রণীত 'হায়াতে-একরাম' (ফাল্গুন ১৩৮০ সাল মুদ্রিত প্রায় ৩০০ শত পৃষ্ঠার বই) সংগ্রহ করুন।

উভয় বঙ্গে তাঁর ৭০ জনের অধিক খলিফার কথা জানা যায় কিন্তু আমরা সকলের নাম ধাম সংগ্রহ করতে পারি নাই। ৪৯ জনের নাম আমরা হায়াতে একরামে দিয়েছি। তন্মধ্যে ডাঃ আতাউল্লাহ ঢাকায় থাকতেন, তাঁর একটি কেতাব লণ্ডনে ছাপা হয়েছে।[৬২]

---

৬১) কোচবিহার জিলার ঝলঝলিয়া স্টেট তখন জঙ্গল ঘেরা এলাকা। তার নানাজান-হেকীম শাহ আযিযুর রহমান ছিলেন কোচবিহার মহারাজের 'রাজহেকীম'। পূর্বে নাম ছিল 'মিয়াবাড়ী হিল্লা' বর্তমানে 'নিজবাড়ী হিল্লা'। — হায়াতে-একরাম - ৫ পৃঃ।

৬২) হাজার হাজার মানুষ মানুষ জিন্দাপীর শাহ আঃ আযীয রহমাতুল্লাহ দোয়ায় মুক্তিপেয়ে বলতো 'পানাহ'-মুক্তি-'ছে' হতে অর্থাৎ মুক্তিপ্রাপ্ত স্থল থেকে আসছি - বোযর্গ মনোহর পুর 'পানাহছে' পুনাশীশরীফ। বর্দ্ধমানের কাটোয়া-সালার রেলপথে 'ঝামটপুর বহরান' স্টেশনে নেমে আধ মাইলপথ পুনাশী।

তিনি বাংলা ১৩৫২ সালের ১৩ই ভাদ্র মোতাবেক - ৯ই রমযান ১৩৬৩ হিঃ মঙ্গলবার বেলা ৮ টায় প্রায় ৯৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ১৪ই ভাদ্র তাকে কোচবিহার জিলার হলদীবাড়ীতে[৬৩] দাফন করা হয় তথায় মাজার শরীফ বিদ্যামান। প্রতি বছর ৫/৬ ফাল্গুন তথায় বিশাল ইসালে সওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মাদ্রাসা, মসজিদ, দিঘী, মেহমানখানা আছে।

তিনি ১০ জন সন্তান-সন্ততির জনক ছিলেন —

১) হযরত শাহসূফী সাইয়্যেদ মুহাঃ মোহেববুল হক সাহেব, রহমাতুল্লাহ।

২) হযরত শাহসূফী সাইয়্যেদ মুহাঃ মহবুবল হক সাহেব, রহমাতুল্লাহ।

৩) হযরত শাহসূফী সাইয়্যেদ মুহাঃ সিরাজুল হক সাহেব, রহমাতুল্লাহ।

৪) হযরত শাহসূফী সাইয়্যেদ মুহাঃ মতলুবল হক সাহেব, রহমাতুল্লাহ।

৫) হযরত শাহসূফী সাইয়্যেদ মুহাঃ মকসুদল হক সাহেব, রহমাতুল্লাহ।

শাহযাদীগণ —

১) হযরত সাইয়্যেদা জামিলা খাতুন জওযে সৈয়দ মোঃ আবদুস সবুর

২) হযরত সাইয়্যেদা রাহেলা খাতুন হাল-হলদিবাড়ী, জওযে-খন্দঃ আঃ হাকিম - বর্দ্ধমান

৩) হযরত সাইয়্যেদা রাবেয়া খাতুন - পুনাশী জওযে - খন্দঃ এহসানুল হক

৪) হযরত সাইয়্যেদা মাহমুদা খাতুন হাল রংপুর সূফী আবদুস মাবুদ শাহ

৫) হযরত সাইয়্যেদা শামস বাজেগা হাল রংপুর সূফী আবদুস শাকুর

প্রথম পুত্র নিঃসন্তান ১৩১৬ সালের ৬ই ভাদ্র ইন্তেকাল করেন। তাঁর মাজার রংপুরের পাকুড়িয়া শরীফে শাহ কসিমদ্দীন রহমাতুল্লাহ মাজারের কাছে, মাজার দেওয়ার পর রাতে ৪/৫ হাত দূরে সরে যায় অদ্যবধি 'কবর' সে অবস্থায় বিদ্যমান।

দ্বিতীয় শাহজাদা শাহ মাহবুবুল হক রহমাতুল্লাহ ২ কন্যা ৭ জন পুত্র সন্তান। প্রায় ৭৯ বছর বয়সে ১৩৭৯ সালে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মাজার বাংলাদেশের রংপুর টাউনের কেরানী পাড়ায় অবস্থিত। মস্ত বোযর্গ, তাঁর বহু মুরীদ বাংলাদেশে বিদ্যমান।

---

৬৩) হলদীবাড়ী-কোচবিহার জিলার মেকলিগঞ্জ মহাকুমার একটি থানা। হলদীবাড়ী-জলপাইগুঁড়ি সদর থেকে ২৫ কি.মি. উত্তরে। নিউজলপাইগুঁড়ি থেকে - ৬১ কি.মি.। জেলা সদর কোচবিহার থেকে ১৩৪ কি. মি.। শাহ সূফী একরামুল হক সাহেব কর্তৃক খরিদ ১১৭ বিঘা। শাহযাদাদের খরিফ সম্পত্তি ২০ বিঘা। মাদ্রাসায় ওয়াকফ ১৭ বিঘা মোট ১৫০ বিঘা জমি কেন্দ্রিক মাজার শরীফ। ইসালেসওয়াব ও মাদ্রাসা। — হায়াতে-একরাম - ১৫৪ পৃঃ। বর্তমানে হুযুর সাহেবের মাজার শরীফে শিরক বিদয়াত শুরু হয়ে গেছে। ইসালেসওয়াব থেকে বিশাল মেলা প্রভাব বিস্তার করেছে।

তৃতীয় শাহযাদা শাহ সিরাজুল হক সাহেব ১৩৭৩ সালে ইন্তেকাল করেন, তার মাজার পুনাশী বুড়নি পীরের আস্তানায় অবস্থিত। তাঁর ২ পুত্র ও ২ কন্যা। বড় আলেম ওয়ায়েজ ছিলেন।

চতুর্থ শাহযাদা শাহ মতলুবুল হক সাহেব।

ইনি ৪/৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, পুনাশী শরীফে তাঁর কবর।

পঞ্চম শাহযাদা শাহ মকসুদল হক সাহেব ইনি ছোট হুযুর নামে খ্যাত, গদ্দিনশীন হযরতের হায়াতে থাকা সময়ে সোহবত তখতিয়ার করে তার প্রেরণায় এক রূহানী তাকাজ্জায় মুর্শিদাবাদ পুনাশী শরীফের শাহসূফী পীর সাইয়্যেদ একরামূল হক সাহেবের জীবনী 'হায়াতে-একরাম' পুস্তক প্রকাশ করি। ফাল্গুন ১৩৮৩ সাল।

'হায়াতে-একরাম' কেতাব এমনই মকবুল যে অনেকে নবীপাকের যিয়ারত নসিব লাভ করেন আর আমাকে আল্লাহ পাক পরিচিতি ইজ্জত ও সম্মান দান করেছেন।

তিনি ইন্তেকাল করেন-এবং কোচবিহার জিলার চ্যাংড়াবান্ধার 'পানিশালায়' তার মাজার শরীফ বিদ্যমান। তথায় প্রতিবছর ফাল্গুন মাসের ৮-৯ তারিখে বার্ষিক ইসালে সওয়াব অনুষ্ঠিত হয়।

তাঁর ৬ জন পুত্র ও ৫ জন কন্যা।

* হযরত সাইয়্যেদ ওয়াজেদ আলী শাহ রহঃ *

ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত 'গের্দা' নামক স্থানে তাঁর জন্ম। ইনি শাহ সাইয়্যেদ এছহাক বাগদাদী রহমাতুল্লাহ সাহেবের বংশধর। এক সময় শতাধিক কামেল বুযর্গ বাগদাদ থেকে হিজরত করে ভারতে শুভাগমন করেন। তাদের একদল ফরিদপুর ও মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থান করেন। ফরিদপুরের যে স্থানে তাঁরা বসবাস করতেন.— সে অঞ্চলের নাম 'ফতেহাবাদ' এবং মুর্শিদাবাদের যে অঞ্চলে বাস করতেন সে অঞ্চলের নাম 'ফতেহদিন'। সাইয়্যেদ এছাহক শাহ, সাইয়্যেদ আলী হাবীব শাহ, সাইয়্যেদ হোসেন তেগবোরহান শাহ নামক তিন বুযর্গ গের্দায় বসবাস করতেন। তাঁদের মাজার শরীফ গের্দায় বিদ্যমান। সে সময়ের নবাব ও বাদশাগণ তাদের সম্মানী স্বরূপ লাখেরাজ ভূসম্পত্তি দান করেছিলেন।

হযরত সাইয়্যেদ ওয়াজেদ আলী সাহেবের পিতার নাম সাইয়্যেদ বাসারত উল্লা সাহেব। তিনি কামেল বুযর্গ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছিলেন এবং কোলকাতায় ঢাকায় অনারেবল নওয়াব খাজা আবদুল গণি, কে, সি, আই, ই সাহেবের এজেন্ট (নায়েব) ছিলেন। নওয়াব বাহাদুরের উপঢৌকন প্রাপ্ত কলিকাতার ৩১ নম্বর ইলিয়ট লেনের সুন্দর বাড়ীতে বসবাস করতেন। সে সময় কোতবুল-ইরশাদ সূফী ফতেহ আলী ওয়সী রহমাতুল্লাহ'র সাথে তাঁর খুবই দোস্তি ছিল। প্রায় তিনি আসতেন। সে সুবাদে অল্প বয়স থেকে সূফী ওয়সী রহমাতুল্লাহ সোহবতে আসেন। বয়স কম থাকায় স্বস্নেহে তাকে উপদেশ ও তালীম দিতেন -[৬৪] হযরত ওয়সী রহমাতুল্লাহ ইন্তেকাল করার পূর্বে নিসবতের জামেয়ার ফয়েয প্রাপ্তির জন্য তদ্বীয় শাহযাদী সাইয়্যেদা যোহরা খাতুন শাহপুরী থেকে তালীম নিতে উপদেশ প্রদান করেন।

হযরত শাহ ওয়াজেদ আলী রহমাতুল্লাহ তালীম তরবিয়াতে কেমন সুদক্ষ ছিলেন যে- এরশাদে মা'বুদীয়া বা খোদা প্রাপ্তির সরল পথ পুস্তক পাঠে অবগত হওয়া যায়। তিনি যে সব তালীম ও কথপোকথন এবং নসিহত করতেন তার খলিফা ও খাদেম আহমদ জান মোজাদ্দেদী লিখে রাখতেন, পরবর্ত্তীতে কেতাব আকারে ছাপা হয় বস্তুতঃ তাঁর 'মলফুজাত' বলা হয়।

সাইয়্যেদ ওয়াজেদ আলী শাহ বড় 'হাতেম দিল' ছিলেন - ফলে পিতার দেওয়া কোলকাতায় ৩১ নং ইলিয়ট লেনের বাড়ী ও অন্য একটি বাড়ী ও নগদ বহু টাকা প্রাপ্ত হয়েও আয়ের থেকে ব্যায় বেশী হওয়ায় এবং ব্যবসায়ে ক্ষতি ও লোকসান হওয়ায়, নিঃস্ব হয়ে যায়।[৬৫] কিন্তু তাঁর এ দারিদ্রতা তাঁকে অলিউল্লাহদের উচ্চ সোপানে আরোহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। রিয়াযাত মেহনত বেশী বেশী করতে থাকেন, আর সে সময় তাঁর পীর ভাই কোলকাতা মাদ্রাসা আলীয়ার অধ্যাপক শামসুল উলামা হযরত মাওলানা গোলাম সালমানী আব্বাসী সাহেবের পরামর্শে মানিকতলায় ২৪/১, মুনশী পাড়া লেন হযরত পীর সূফী ওয়সী রহমাতুল্লাহ এর মাজার শরীফে বসে ফয়যিয়াব প্রাপ্ত হতে থাকেন এবং মাজার শরীফ থেকে যে অবস্থা জ্ঞাত হতেন সে মত

৬৪) আয়নায়ে-ওয়সী - ২০৯ পৃঃ। ৱরাত - মাওঃ জয়নাল আবেদীন আখতারী।
৬৫) হায়াতে-একরাম - ৭৪ পৃঃ।

কাজ করতেন। ফলে তাঁর অত্যধিক উরুয হয়। একসময় হযরত আল্লামা গোলাম সালমানী আব্বাসী সাহেব পুনঃ পরমর্শ দেন যে- আপনি পীর বহিনের আদেশ নিয়ে এশায়াতে ইসলামের জন্য সফর করতে থাকুন, আর আপনি সাইয়্যেদযাদা কাজেই এ আপনার দ্বায়িত্ব ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।[৬৬] সাইয়্যেদ ওয়াজেদ আলী শাহ পীর ভাইয়ের উপদেশ মত শাহপুরে পীর বহিন থেকে মুরীদ করার আদেশ প্রাপ্ত হয়ে আল্লাহ ভরসায় সফর শুরু করেন। শাহ সাহেবের ভাষায় — "আমি শিয়ালদা ষ্টেশনে আসিয়া জেলা বগুড়ার অন্তর্গত হিলি ষ্টেশনের একখানা তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট লইলাম। সঙ্গে পরিধানের কাপড় অতিরিক্ত একখানা কম্বল ও একটি তাম্র বদনা ব্যতীত অন্য কোন অসবাবাদী ছিল না। খোদাতায়ালার নাম স্মরণ করিতে করিতে গাড়িতে উঠলাম। গাড়ী ধব ধব করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল।"

"রংপুর গাইবান্ধা অঞ্চলের জনৈক হযরত, পীর দস্তগীরের খলিফা শাহ জহুর আলী সাহেবের নিকট শুনিয়াছি, যে রাত্রিতে হযরত পীর সাহেব হিলি অভিমুখে আসিতেছিলেন। সেই রাত্রিতে আমি আমার হিলি বাজারস্থ তামাকের দোকানে এশার নামাযান্তে অজিফা শেষ করিয়া শয়ন করিয়া ছিলাম। ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে দেখিতেছিলাম যেন এক প্রশান্ত ও সৌম্য মুর্তিধারী - মহাপুরুষ আমার শিয়রে দন্ডায়মান আছেন। আমি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিয়া তাঁহার 'কদম বোছ' করিলাম এবং তিনিও আমাকে সস্নেহে আশীর্বাদ করিয়া নিকটে উপবেশন করতঃ আমাকে তারিকার কাজ অর্থাৎ তাওয়াজ্জোহ দিয়া মুরীদ বানাইলেন। আমি ও তাহার নিকট ভক্তি সহকারে মুরীদ হইলাম। যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন অনুভব করিতে পারিলাম যে, আমার দিলে টক টক করিয়া আল্লাহর জিকির হইতেছে। তখন স্বপ্নের কথা একে একে মনে পড়িতে লগিল। আর ঘুম হইল না। অজু করিয়া তাহাজ্জদের নামাজ পড়িলাম। ঐ অজুতেই অতি প্রত্যুযে ফজরের নামাজ পড়িয়া তসবিহ হাতে করিয়া আমার দোকান সংলগ্ন ইন্দারার নিকট পায়চারি করিতে লাগিলাম। স্বপ্নে আমার পীরের

---

৬৬) আহমদ জান মোজাদ্দেদী প্রণীত "এরশাদে-মা'বুদীয়া' - ১৭/১৮ পৃঃ।

যে সেকেল ও ছুরাত দেখিতেছিলাম ও সে স্বর শুনিয়াছিলাম তখনও সেই ছুরত মানস চক্ষে দেখতেছিলাম এবং সেই স্বর হৃদয়ের কর্ণে শুনিতেছিলাম।

এদিকে জনাব, হযরত পীর সাহেব কেবলা হিলি স্টেশনে গাড়ী লাগিবামাত্র কম্বলটা বগলে দাবিয়া এবং তাম্র বদনটা হাতে করিয়া উপরোক্ত ঐ ইন্দারার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমার পীর ভাই শাহ জহুর আলী সাহেব জনাব হজরত পীর সাহেব কেবলাকে দেখিবা মাত্রই স্বপ্নদৃষ্ট পীর সাহেব বলিয়া চিনিয়া লইলেন। অমনি সসম্মানে নিকটে আসিয়া অভিবাদন পূর্বক ভক্তি সহকারে বলিলেন - "হুযুর! আমার নিকট বদনা দিন, আমি পানি উঠাইয়া দিতেছি। তিন সস্নেহে বদনা হাতে দিলে পর শাহ সাহেব পানি উঠাইয়া দিলেন। হজরত পীর সাহেব কেবলা ঐ পানি দ্বারা অজু ক্রিয়া সমাধা করিলেন। তখন শাহ সাহেব আবার সবিনয়ে বলিলেন, "হুযুর আমার ঘরে আসিয়া নামাজ পড়ুন। তিনি ও দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহার ঘরে যাইয়া নামাজ পড়িলেন। নামাজ সমাপনান্তে শাহ বলিলেন - "হুযুর! দয়া করিয়া আমাকে মুরীদ করুন। তিনিও তাঁহাকে প্রকাশ্যভাবে মরীদ করিলেন। পূর্বেইত স্বপ্ন যোগে বাতেনীতে মুরীদ হইয়া ছিলেন। এক্ষণে জাহেরাভাবে মুরীদ হইয়া দোকান পসার পরিত্যাগ করতঃ হজরত পীর কেবলার খেদমতে থাকিয়া তরীকা শিক্ষা করিতে লাগিলেন।"[৬৭]

সফরী হালাতে তরিকার আঞ্চাম দিতে থাকেন ফলে পাবনা, বগুড়া, রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, ময়মনসিংহ, নদীয়া, ফরিদপুর, যশোহর প্রভৃতি জিলার মানুষেরা তাঁর থেকে ফায়দা পেয়ে থাকেন।

১৩২৬ সালের ১৭ই সফর মোতাবেক বাঙ্গালা ২৫শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার দিবাগত রাতে সাড়ে ৭টায় তিন সাহেবযাদা ও চারি সাহেবযাদী ও মুরীদদের রেখে ইন্তেকাল করেন।

তিনি তার পীরভাই ফুরফুরা শরীফের পীর আবু বকর সিদ্দিকী সাহেবের কাছে দাবী করেছিলেন যে - আমি আপনার আগে মারা গেলে আমার জানাজা নামায পড়ে দিবেন। তাঁর অসিয়ত মোতাবেক ফুরফুরা শরীফের উক্ত পীর সাহেব তাব

৬৭) প্রাগুক্ত - ২০ পৃঃ।

জানাজার এমামতি করেন। অতঃপর তাঁকে তাঁর খরিদা ৯ নং রামমোহন বেরা লেনের বাগানবাড়ীতে মদফুন করা হয়। তিনি উক্ত বাগানবাড়ীর নাম 'খানকায়ে মোজাদ্দেদীয়া' পাথরে খোদিত করে রাখেন এবং ১৩২৬ সালের ১৯ শে আষাঢ় ৪ঠা শাওয়াল বাৎসরিক মাহফিল সাইয়্যেদ সাহেব নিজে করেছিলেন।

সাহেবযাদা - ১) মৌঃ সাইয়্যেদ আহম্মদ উল্লাহ, ২) ডাক্তার আলহাজ্জ সাইয়্যেদ মাহমুদ উল্লাহ, ৩) মৌলানা সাইয়্যেদ হামিদ উল্লাহ। তাঁর কতিপয় খলিফাদের নাম,

১) মৌলভী সূফী আহমদজান মোজাদ্দেদী, নাগ-ডেমরা, ফরিদপুর বনওয়ারীনগর।

২) শাহ জহুর আলী, গাইবান্ধা, রংপুর

৩) সূফী কাজেমুদ্দীন খান, সিরাজগঞ্জ উল্লাপাড়ার সোমতোল গ্রাম প্রমুখ।

৪। শাহ সুফী কাসেম আলী পারতেখুর [৬৮] শাহজাহানপুর, বগুড়া।

*** মৌলভী আবদুল আযীয সাহেব** রহমাতুল্লাহ

মৌলভী সাইয়্যেদ আবদুল আযীয সাহেব হুগলী জেলার চান্দুর জাহানাবাদ বাড়ী ছিল। জাহানাবাদ বিহারের গয়া জিলায় সাবডিভিশন এবং বাংলায় জাহানাবাদ থাকায় সরকারী কাজে বিভ্রান্তি ঘটতে থাকে ফলে পশ্চিম বাংলার সাবডিভিশনের 'জাহানাবাদ' এর নাম ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে 'আরামবাগ' রাখা হয়।

'আরামবাগ' তারকেশ্বর ষ্টেশন থেকে ৩১ কিঃমিঃ পশ্চিমে, বর্দ্ধমান থেকে ৪২ কিঃমিঃ দক্ষিণ-পশ্চিম। আরামবাগ-বর্দ্ধমান যাওয়ার রাস্তায় শহর থেকে প্রায় ৩ মাইল উত্তরে চান্দুর গ্রাম।

চান্দুর মিয়া পাড়ায় হযরত মৌলভী সাইয়্যেদ আবদুল আযীয সাহেবের মাজার শরীফ। তার পোতা ও ভাতিজারা তথায় বসবাস করেন। জন্ম ও মৃত্যুসন জানা যায় না।

৬৮। মাহবুবে সোবহানী আলহাজ্জ সুফী কাসেম আলী পীর কেবলার মাজার শরীফ পারতেখুর ওয়ায়সীয়া শরীফে হাফিজি মাদ্রাসা ও তালীমে জিকরের মাহফিল পরিচালনা করেন আইল পুনিয়া দরবারে মোজাদ্দেদীয়া (ফুরফুরা শরীফ) বর্তমান পীর কেবলা শাহ সূফী মাওলানা ডাক্তার মোঃ আবদুল মান্নান সাহেব। সিলসিলার অতন্ত্র প্রহরী মর্দে মোজাহেদ তালীমে জিকরের মহা পরিচালক।

* মৌলভী আকবর আলী রহমাতুল্লাহ

হযরত মাওলানা আকবর আলী সাহেব সিলেটের অধিবাসী ছিলেন। তিনি গোপালগঞ্জের রণকৌলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কোলকাতা মাদ্রাসার মোদাররেস ছিলেন। হযরত সূফী ওয়সী সাহেব যখন কোলকাতায় বিবি সালেটের মসজিদে অবস্থান করতেন, সে সময় দস্তে বায়য়ত গ্রহণ করে তালীম তাওয়াজ্জোহ পেয়ে থাকেন।

তিনি অনুমান ১৩১৬ হিজরী ১৮৯৮ সালে ইন্তেকাল করেন।[৬৯] তাঁর মাজার শরীফ বাংলাদেশের সিলেট জেলার একটি ছোট পাহাড়ের টিলায় অবস্থিত।

* মৌলভী আহমদ আলী ও মৌলভী আবদুল কাদের রহমাতুল্লাহ

ড. মতিউর রহমান সাহেব দেওয়ানে ওয়সী পুস্তকের ২১৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন —"ইনাদের সম্বন্ধে এতটুকু জানা যায় যে উভয়ে ফরিদপুরের অধিবাসী, কিন্তু তাদের সঠিক ঠিকানা অজানা, ফরিদ পুরের অধিবাসী হলে কোন ফরিদপুর, শহর ফরিদপুর না গ্রাম ফরিদপুর জানা যায় না।"

আমাদের জানা মতে তথ্য তালাশ ইতিপূর্বে পরিবেশন করেছি।

*শাহ দিদার বকস রহমাতুল্লাহ

হযরত শাহ দিদার বকস সাহেব জেলা হাওড়ার পদ্মপুকুর হুগলী নদীর কিনারায় বোটানিকাল গার্ডেন এর পশ্চিম-উত্তর পার্শ্বে কেরী রোড তার মাজার শরীফ বিদ্যমান। তার সম্বন্ধে বিস্তারিত জানা যায় না। সাইয়্যেদ হাফেয বসিরুদ্দীন রহমাতুল্লাহ থেকে জানা যায় তাঁর এক খলিফার নাম ছিল সূফী সাদমানী রহমাতুল্লাহ তিনি দরজির কাজ করতেন। বর্তমানে পদ্মপুকুর মাদ্রাসা দিদারীয়া নামে একটি দ্বীনি প্রতিষ্ঠান হয়েছে।

---

৬৯) প্রাগুক্ত - ২০ পৃঃ।

* হযরত শায়েখ কোরবান আলী রহঃ *

হযরত শাইখ কোরবান আলী সাহেব কোলকাতার বানিয়াতালাব থাকতেন। তাঁর জন্ম কোলকাতা ফুলবাগান। তাঁর মাজার পদ্মপুকুর ও শালিমার ষ্টেশনের মধ্যে — শালিমার গেট সন্নিকট ১৩৬, আন্দুল রোড মসজিদ সংলগ্ন বিদ্যমান। তাঁর এক সাহেবযাদার নাম শায়েখ আসগর আলী সাহেব। প্রতি বছর তথায় ২০শে জামাদিউল আওয়াল ইসালে সওয়াব হয়ে থাকে।

* মির্জা আশরাফ আলী রহঃ

মির্জা আশরাফ আলী সাহেব প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রফেসর ছিলেন। সম্ভবতঃ কোলকাতা অবস্থানকালে হযরত সূফী ওয়সী রহমতুল্লাহ দস্তে বায়য়ত হন। তাঁর বিস্তারিত তথ্য জানা যায় না। তার এক সাহেবযাদা জনাব হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসীন মরহুম মানিকতলায় সূফী ওয়সী রহমতুল্লাহ মাজার মসজিদের দীর্ঘদীন এমাম ছিলেন এবং সূফী সাহেবের মাজার শরীফের খেদমতগার ছিলেন, তাঁর ইন্তেকাল ১৯৪১ সাল।[৭০]

* মৌলভী আতাউর রহমান রহঃ ও
* মৌলভী ফাসাহাতুল্লাহ রহঃ

ইনারা ২৪ পরগণা জেলার অধিবাসী ছিলেন, কিন্তু এদের সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না।

* মৌলভী নাসিরুদ্দীন রহঃ

ইনি নদীয়া জেলার বাসেন্দা ছিলেন। আর কিছু জানা যায় না।

* মৌলভী সাইয়্যেদ জোলফিকার আলী রহঃ

ইনি ২৪ পরগণা জেলার ব্যারাকপুরের টিটাগড় শিল্প অঞ্চল, কাগজের কলের জন্য বিখ্যাত। বাজারের নিকট কাগজের কারখানার ভিতর সাইয়্যেদ মৌলভী জোলফিক্কার আলী রহমতুল্লাহ এর মাজার শরীফ। মাজার শরীফের চারিধার উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, ভিতরে যাওয়ার সুযোগ নেই। তাঁরই বন্ধুবর - সাইয়্যেদ

৭০। প্রাগুক্ত - ২১-২২ পৃঃ। প্রসঙ্গতঃ অন্যান্য খলিফাদের নাম থাকলেও। এনায়েত পুরীর নাম নেই।

নিযামুদ্দীন 'রাগেব' বারাকপুরী বিখ্যাত উর্দ্দু ও ফার্সী কবি। 'কালামে রাগেব' নামে সুন্দর একটি বই আছে।

* মৌলভী আতায়ে এলাহি রহঃ

ইনি বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া থানার মঙ্গলকোট গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। মঙ্গলকোট প্রসিদ্ধ স্থান। ইমামে রব্বানী, মোজাদ্দেদে-আলফেসানী রহমাতুল্লাহ এর খ্যাতনামা খলিফা হযরত মাওলানা হামিদ দানেশমন্দ বাঙ্গালী (১৬৫৩ হিঃ) বিখ্যাত।

জনাব কাজী আতায়ে এলাহি রহমাতুল্লাহ ১৯২০ সালে মঙ্গলকোটে ইন্তেকাল করেন। তাঁর এক পুত্র কাজী আবদুল্লাহ ও এক কন্যা ছিল। কাজী আবদুল্লা দুটি সন্তান রেখে খুব কম বয়সে ইন্তেকাল করেন। তার এক পুত্র দুবছর পর ইন্তেকাল করেন। তার কন্যা ফাতেমা খাতুন ও মাওলানা হামিদ দানিশমন্দ ওয়াকফ কমিটির প্রধান ডাঃ আবু তোরাব সাহেব একই খান্দান।

ডাঃ আবু তোরাব সাহেবের বর্ণনায় জানা যায় যে হযরত সূফী ওয়সী রহমাতুল্লাহ মঙ্গলকোট যিয়ারতে গেছেন, এমনকি এখানে তাঁর অনেক মুরীদ ছিল, আমার নানা ও দাদা উভয়েই সূফী সাহেবের মুরীদ ছিলেন।[৭১]

* জনাব মমিযুল হক রহঃ

ইনি আবু তোরাব সাহেবের নানাজান হতেন। তিনি ১৯১৮ সালে ইন্তেকাল করেন, তাঁর মাজার মঙ্গোলকোটে।

* জনাব কাজী জালাল হুসাইন রহঃ

ইনি ডা. কাজী আবু তোরাব সাহেবের দাদা জান। তিনিও ১৯৩০ সালের এপ্রিলে ইন্তেকাল করেন। মঙ্গলকোটে মাজার।

* জনাব মৌঃ আয়াজউদ্দীন রহঃ

হযরত মৌলানা আয়াজউদ্দীন সাহেব কোলকাতা আলীপুর (পূর্বে ২৪ পরগণার জিলা সদর) বাসেন্দা ছিলেন। এক সময় আলী পুরে সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকদের বসবাস ছিল। সে সব খান্দানদের মধ্যে বর্তমানে ঢাকার বাসেন্দা হযরত মাওলানা হাফেয বশিরুদ্দীন রহমাতুল্লাহ এর খান্দান। হযরত সূফী ফতেহ

---

৭১) দেওয়ানে-ওয়সী ২০৮ পৃঃ আয়নায়ে-ওয়সী - ২১৬ পৃঃ।

আলী রহঃ এর পোতা হযরত মাওলানা মাসউদার রহমান সাহেব এ খান্দানে শাদী করেন। তার স্ত্রী সাইয়্যেদা মনোয়ারা খাতুন ও দাদা শ্বশুর সাইয়্যেদ আবদুল আযীয সাহেবের 'কবর' সূফী ওয়সী সাহেবের কবরের পশ্চিম পার্শ্বে ছিল যা বর্তমানে মাজার শরীফ সংস্কার করার অজুহাতে সিমেন্টে ও পাথরে ঢাকা পড়ে গেছে।

বর্তমানে মানিকতলায় মাহফিলে প্রতি বছর যোগদান করেন - ঢাকা সুপ্রিম কোর্টের এ্যাডভোকেট আলহাজ্জ সূফী সাইয়্যেদ আবদুস সালাম সাহেব, হাফেয সাইয়্যেদ বশিরুদ্দিন রহমতুল্লাহ দ্বিতীয় সাহেবযাদা।

আলীপুরের সাইয়্যেদ আবদুল আযীয ও মৌলভী আয়াজউদ্দীন সাহেবের খান্দানের সাথে হযরত ওয়সী রহমতুল্লাহ এবং তার অন্যতম খলিফা শামসুল উলামা হযরত মাওলানা সালমানী আব্বাসী রহমতুল্লাহ, মোজাদ্দেদে-যামান হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী ফুরফুরাবী রহমতুল্লাহ নীবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। মৌলভী আয়জউদ্দীন সাহেব বাং- ১৩১৩ সালের ১৫ই আশ্বিন ইন্তেকাল করেন। তাঁর মাজার কোলকাতা ৭০/১, ইকবালপুর রোড, যোলআনা কবরস্থানে বিদ্যমান। যোলআনা মসজিদের ঠিক দক্ষিণ পার্শ্বেই প্রথম সারির পূর্বদিক থেকে তৃতীয় মাজার।

* সূফী নিয়ায আহমদ রহঃ

হযরত সূফী নিয়ায আহমদ সাহেব বর্দ্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার 'কাটরাপোতা' গ্রামে বসবাস করতেন। তাঁর মাজার শরীফ বিদ্যমান। 'কাটরাপোতা' বিখ্যাত পীর হাজী বাহরাম সাক্কা (৭৯০ হিজরী, ইং ১৫৬২-৬২ সাল) রহমতুল্লাহ মাজার। নওয়াব কোতবুদ্দিন খান এবং বেগম নূরজাহানের প্রথম স্বামী শের আফগান খান এর মাজার বিদ্যমান। কাটরাপোতা-বর্দ্ধমান ষ্টেশন থেকে প্রায় ২ মাইল দূরে অবস্থিত।

সূফী নিয়ায আহমদ সাহেবের বড় সাহেবযাদা ডাক্তার মুহাম্মদ আহম্মদ মঙ্গলকোট বসবাস করতেন, তাঁর কোন সন্তানাদি ছিল না। সূফী সাহেবের সময়েই তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর দ্বিতীয় সাহেবযাদা জনাব আলী আহম্মদ সাহেব। তিনি বিহারের আরা জিলার ডিষ্ট্রিক্ট জজ ও সেশন জজ ছিলেন।

তৃতীয় পুত্র আসামের কোন চা বাগানে কর্মরত ছিলেন। চতুর্থ পুত্র জনাব মোহসেন আহমদ কাটরাপোতায় থাকতেন। জনাব সূফী আলী আহমদ জজ সাহেব ৭২ বছর বয়সে ভাগলপুর ইন্তেকাল করেন। তার মাজার শহর থেকে দক্ষিণে ‘‘শাহজঙ্গী’’ কবরস্থানের কাছেই খান্দানী কবরস্থান আমবাগানে বিদ্যমান।

জনাব সূফী আলী আহমদ মরহুম জজ সাহেবের এক কন্যা ও ৪ পুত্র ছিল। ১) সূফী সুলতান আহমদ, (ইন্সপেক্টার জেনারেল রেজিষ্টেশন, বিহার) ২) সূফী এহছান আহমদ, ৩) সূফী গোফরান আহমদ, ৪) সূফী তোফায়েল আহমদ।

সূফী সুলতান আহমদ ১৯৪৪ সালে ইন্তেকাল করেন। সূফী এহছান আহমদ সাহেব, মৌলানা পাঠ্যরত অবস্থায় ২০ বছর বয়সে বোম্বাইয়ে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মাজার নাসিক (বোম্বাই) আছে। সূফী গোফরান আহমদ সাহেব বাচ্চা বয়সে ইন্তেকাল করেন। সূফী তোফায়েল আহমদ সাহেব কোলকাতা থাকতেন। ১৯৮৬ সালে ইন্তেকাল করেন।

সূফী সুলতান আহমদ সাহেবের তিন পুত্র- ১) সূফী আযীয আহমদ সাহেব, ২) সূফী আনিস আহমদ সাহেব, ৩) সূফী আনোয়ার আহমদ সাহেব।

সূফী আযীয আহমদ সাহেব কোলকাতায় ডাক্তারী পড়ে, ভাগলপুরে কর্মরত ছিলেন। তার চার মেয়ে এবং একজন ছেলে সন্তান সূফী আরশাদ আহমদ সাহেব। সূফী আনিস আহমদ সাহেব বি, এস, সি (টেকনোলজি) কোলকাতা কোন এক জুট মিলে উচ্চ পদে ছিলেন। সূফী আনোয়ার আহমদ এম, এস, সি সিন্দরী জিলা ধানবাদে (টেকনোলজিস্ট) কর্মরত।

সূফী তোফায়েল আহমদ সাহেবের ছেলে অর্থাৎ ডাক্তার আযীয আহমদ সাহেবের চাচাতো ভাই ডাক্তার আমীন আহমদ সাহেব কোলকাতা ডাক্তারী করেন।

ভাগলপুরে জনাব সূফী আলী আহমদ সাহেব মরহুম জজ সাহেবের খান্দান সদর থানার পূর্ব আবাদ।

সূফী নিয়ায আহমদ (মঙ্গলকোট) রহমতুল্লাহ এর এক প্রপৌত্র সূফী মহিউদ্দীন সাহেব বাংলাদেশ এ্যাগ্রিকালচারাল রিচার্স ইনিস্টুটিটিউট এর ডাইরেক্টর এবং জনাব ডাক্তার আবু তোরাব (মঙ্গলকোট) সাহেবের সম্পর্কে ভাতিজা হন।

কাটরা পোতায় যে কবরস্থানে মাজার। তথায় বাংলার মুসলিম রেনেশাঁ মোহামেডান লিটারী এ্যাসোসিয়েশন কোলকাতার প্রতিষ্ঠাতা নওয়াব আবদুল লতিফ খানবাহাদুর সি, আই-ই সাহেবের দৌহিত্র- নওয়াব সাইয়্যেদ মুহাম্মদ খানবাহাদুর আই, এইচ, উ, ঢাকা, মৌলানা আযাদ সাহেবের সাহেবযাদা নওয়াব সাইয়্যেদ আলী আশরাফ মরহুম (১৯৪১ সালে ইন্তেকাল) প্রভৃতি একই গোরস্থানে আরাম করছেন। তার সাহেব যাদা প্রফেসর সাইয়্যেদ আলী আকবর বর্দ্ধমানে থাকেন। নওয়াব সাইয়্যেদ আলী আশরাফ মরহুমের দৌহিত্রী বেগম সাইয়্যেদা ফাতেমা ফজলুর রহমান ওরফে নাসমী বেগম হযরত মাওলানা পীর আবু বকর সিদ্দিকী সাহেবের খলিফা প্রফেসর মাওলানা আবদুল খালেক সাহেবের দস্তে বায়য়ত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। নাসমী বিবি লেডি ব্রাবণ কলেজের প্রফেসর ছিলেন। তারা উভয়ে ঢাকা ধানমণ্ডি থাকেন। মিষ্টার ফজলুর রহমান (প্রাক্তন পাকিস্তান সরকার মন্ত্রী) সাহেব আল্লামা শিবলী নোমানী রহমাতুল্লাহ সাহেবের বিখ্যাত সীরাত গ্রন্থ 'সীরাতুন্‌নবী' বৃহৎ পুস্তকের ইংরাজী তরজমা করেন এবং তার ইন্তেকালের পর সীরাতুন-নবী পুস্তকের ভূমিকা লেখেন - বেগম ফাতেমা ফজলুর রহমান সাহেবা।[৭১]

* মৌঃ মতিয়ূর রহমান ও হাফেজ ইবরাহীম রহমাতুল্লাহ

ইনারা চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন, শহর না গ্রামে তা জানা যায় না। দু'বুর্যগের মাজার শরীফ কোথায় তাও জানা যায় না।

* হযরত মাওলানা আবদুর রহমান রহমাতুল্লাহ

আল্লামা পীর রূহল আমীন রহমাতুল্লাহ এর নিকট আত্মীয়। হযরত মাওলানা আবদুর রহমান সাহেবের জন্মস্থান ছিল - টাকী নারায়ণপুর সংলগ্ন 'সৈয়দপুর' গ্রামে, মৌজা নং ৫০। তিনি একজন তুখোড় বাগ্মী ও সমাজ সংস্কারক ছিলেন। ইনি হযরত মাওলানা সূফী শাহ ফতেহ আলী রহমাতুল্লাহ এর মুরীদ ও খলিফা ছিলেন। এলাকায় পীর ও বুযর্গরূপে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি কোলকাতা বেলিয়াঘাটায় 'খোদাগঞ্জ' এলাকায় থাকতেন। তিনি তুখোড় বাগ্মী ছিলেন। প্রতি শুক্রবার গোলতালাবে (হাজী মহসিন স্কোয়ার) ওয়াজ করতেন। বেলিয়াঘাটায় চিংড়াঘাটার সরকার বাড়ী খোদাগঞ্জ রোডে নিজ নির্মিত

---

৭১) আয়নায়ে-ওয়সী - ২১৭ পৃঃ।

মসজিদ পার্শ্বে তার মাজার। তাঁর রচিত দু'খানি গ্রন্থের নাম জানা যায়। ১) মৎলুবুল মো'মেনিন ওয়া মকসুদল মুসলেমিন, ২) আয়নায়ে আশেকিন ফি হাক্কে সাদেকিন, — কর্মবীর - ৪৫ পৃঃ এবং অধ্যাপক আলি আহমদ, বাংলা - মুসলিম গ্রন্থপঞ্জি, বাংলা একাডেমি - ঢাকা; ১৯৫৭/৮৫ পৃঃ। আল্লামা রূহল আমীন জীবন ও কার্য - ৬১ পৃঃ।

* মৌলভী গণিমতুল্লাহ রহমাতুল্লাহ

* মুনশী সাদাকাতুল্যাহ রহমাতুল্লাহ

উভয় হযরত আপন ভাই এবং ফুরফুরা শরীফের অধিবাসী ছিলেন। ফার্সি ভাষায় মাহের ছিলেন। হেকীম মুনশী সাদাকাতুল্লাহ মোজাদ্দেদে-যামান পীর আবু বকর সিদ্দিকী সাহেবের শ্বশুর হতেন। শাহ সূফী জুলফিকার আলী সিদ্দিকী ছোট হুযুর পীর সাহেবের নানাজান। নানাজানের বসত বাড়ীতে ছোট হুযুর বসবাস করছেন। তার মাজার ও মসজিদের উত্তর পাশে প্রাচীর ঘেরা পারিবারিক গোরস্থানের দক্ষিণ-পূর্ব ধারে হযরত মুনশী সাদাকাতুল্লাহ মাজার বিদ্যমান।

হযরত মৌলভী গণিমতুল্লাহ রহমাতুল্লাহ মাজার শরীফ ছোট হুযুরের বাড়ী থেকে পাক রাস্তা দিয়ে তালতলা হাট যাওয়ার পথের মুখেই পূর্ব-দক্ষিন কোণে প্রাচীর ঘেরা বকুল ছায়ায় অবস্থিত।

* মুনশী শারাফতুল্লাহ রহমাতুল্লাহ

মুনশী শারাফাতুল্লাহর পিতার নাম মুনশী বাশারাতুল্লাহ হুগলী জেলার ফুরফুরা শরীফ সংলগ্ন উত্তর পার্শ্বে রাস্তার ধারে 'খাতুন' গ্রাম। মোজাদ্দেদে-যামান পীর আবু বকর সিদ্দিকী রহমাতুল্লাহ তাঁর কবর বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন।

তাঁর পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁর চাচাতো ভাইয়ের সন্তান মুনশী দিয়ানাতুল্লাহ, মুনশী মুহাম্মদ কাসেম, মুনশী মিজানুর রহমান ও মাওলানা আবদুল কাদের প্রমুখ খাতুন গ্রামে বসবাস করেন। মাওলানা আবদুল কাদের সাহেব আলেমে দ্বীন তিনি সীতাপুর মাদ্রাসায় সিনিয়র মোদার্রেস।

* মৌলভী মবিনুল্লাহ রহমাতুল্লাহ

হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়া থানায় 'রামপাড়া' গ্রামে হযরত মৌলভী মবিনুল্লাহ রহমাতুল্লাহ অধিবাসী ছিলেন। ফুরফুরা শরীফের তালতলা হাটের দক্ষিণ পার্শ্বের গ্রাম — রামপাড়া। তাঁর কন্যা মনোয়ারা খাতুন ফুরফুরা শরীফের কাজী ফজলুল হক সাহেবের সাথে বিয়ে হয়। তাঁর এক বড় ছেলে কাজী জহুরুল হক। দ্বিতীয় পুত্র একরামুল হক। কাজী জহুরুল হক সাহেবের চারপুত্র। তাঁর বড় ছেলে কাজী সিরাজুল হক সাহেব আলেমেদ্বীন। মৌলভী মবিন্যুল্লাহ রহমাতুল্লাহ ভাতিজা তফজেল হালদার ও করিম হালদার মরহুম। আয়নায়ে-ওয়সী ২২৫-২২৬ পৃঃ।

* হাফেয ইব্রাহীম রহমাতুল্লাহ

হযরত হাফেয মুহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেব- হুগলী জেলার ফুরফুরা শরীফের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ মোনয়েম সাহেব মোজাদ্দেদে-যামান এসব কবর বাঁধিয়ে দিয়ে ছিলেন বলে জানা যায়, কিন্তু এক্ষণে সঠিক নির্ণয় এবং বিস্তারিত কিছু জানার উপায় পাওয়া যায় না।

* মুনশী সোলায়মান রহমাতুল্লাহ

জনাব মুনশী সোলায়মান সাহেব ২৪ পরগণা (উত্তর) জেলা সদর বারাসত কাজী পাড়ার অধিবাসী ছিলেন। বারাসাত-হাসনাবাদ ব্রডগেজ রেল পথে 'কাজীপাড়া' ষ্টেশন (হল্ট) দক্ষিণ দিকে অনতিদূরে যেখানে হযরত মাওলানা আতিকুল্লাহ সাহেবের মাজার আছে সেই কবরস্থানে মুনশী সোলায়মান রহমাতুল্লাহ (কাচা) কবর বিদ্যমান।

রেললাইনের উত্তর দিকে কিংবদন্তীপীর হযরত শাহ্ একদিল রহমাতুল্লাহ মাজার আছে। এ বারাসাতের এলাকা, বর্তমানে বশিরহাট মহাকুমার বাদুড়িয়া থানার নারিকেল বেড়িয়া গ্রামে মীর নিসার আলি ওরফে তীতুমীর রহঃ ১৮৩১ সালে 'বাশের কেল্লা' বানিয়ে জিহাদ করে শহীদ হয়েছিলেন। সে সময় হিন্দু জমিদার মুসলমানদের দাড়ীর ওপর কর (ট্যক্স) ধার্য্য করেছিল। তারই প্রতিবাদে শহীদ সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলীর খলিফা মীর নিসার আলি রহমাতুল্লাহ জিহাদ করেন।

* শাহ বাকাউল্লাহ রহমাতুল্লাহ

তার বাসস্থান হুগলী জিলার কানপুর গ্রামে। আরামবাগ সদর থেকে অনুমান ৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে যেখানে বিশিষ্ট বুযর্গ ব্যক্তিদের মাজার ও মাদ্রাসা আছে তথা থেকে সামান্য উত্তরে তারকেশ্বর-আরামবাগ রাস্তার রাসুলপুর, মুবারকপুর, সালেহপুর গ্রাম সমূহ বিদ্যামন। সহজে বোঝা যায় পূর্বে এ অঞ্চলটি মুসলিম প্রধান ছিল। শাহ বাকাউল্লাহ খুব সম্ভবতঃ ব্যবসার খাতিরে কোলকাতা অবস্থান করতেন এবং হযরত ওয়সী পীরের সান্নিধ্য হাসিল করেন। তার বিস্তারিত জানা যায় না।

* মৌলভী কাজী খোদা নাওয়ায রহমাতুল্লাহ

মৌলভী কাজী খোদা নাওয়ায ধসা, হুগলী লেখা আছে। ধসাতো বিখ্যাত স্থান, মুনশীর হাটের সন্নিকট অবস্থিত, হযরত ওয়সী পীর এ ধসা শরীফের পানাউল্লা মাদ্রাসায় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে ছিলেন কিন্তু জিলাতো হাওড়া।

কাজেই আমার মনে হয় হুগলী জিলার কোন্নগর ধাড়সা গ্রাম হবে, ফুরফুরা পীর রহমাতুল্লাহ এর হজ্জের সাথী খলিফা হাজী আবদুল মাতীন ও হাজী আবদুল মঈন সাহেবের বাসস্থান। ধাড়সায় নদীর কিনারায় বিখ্যাত এক বোযর্গের মাজার শরীফ আছে।

* মৌলানা আবদুল কাদের সাহেব রহমাতুল্লাহ

তিনি হুগলী জেলার বৈদ্য বাটীর বাসেন্দা ছিলেন। বৈদ্যবাটী হাওড়া থেকে ২৫ কিঃ মিঃ উত্তরে শেওড়াফুলি জংশন, শেওড়াফুলি-ভদ্রেশ্বর ষ্টেশনের মধ্য বরাবর বৈদ্যবাটী ষ্টেশন। বিস্তারিত জানা যায় না।

* শেখ লাল মহম্মদ রহমাতুল্লাহ

তিনি হুগলী জেলার চুঁচুড়ার অধিবাসী ছিলেন। চুঁচুড়াকে চিনসুরা ও বলা হয়। জেলা সদর চুঁচুড়া বিখ্যাত দানবীর হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ অবস্থিত। রেলষ্টেশনের নামও চুঁচুড়া। তার বিস্তারিত জানা যায় না।

* মৌলানা সাইয়্যেদ আযম হুসাঈন রহমাতুল্লাহ

দেওয়ানে ওয়সীতে লেখা আছে — মদীনা মনোয়ারা। এর বেশী জানা যায় না। মোহাজেরে-মদীনা।

* মৌলভী সাইয়্যেদ ওবায়দুল্যাহ রহমাতুল্লাহ

হযরত মৌলভী ওয়ায়দুল্লাহ্ সাহেব নদীয়া জেলার শান্তিপুর অবস্থান করতেন। রানাঘাট মহকুমা শহর থেকে ১৩ মাইল এবং জেলা সদর কৃষ্ণ নগর থেকে ৬ মাইল। এখানে মোগল বাদশাহের শিল্প ছিল এবং বাদশা আলমগীরের এক মসজিদ আছে। এখানে বাংলা ভাষা খুব সুন্দর ও সাবলীল এখানে কবি মোজাম্মেল হক সাহেব হযরত নবী করিম স্বঃ জীবনী "হযরত মুহাম্মদ" পুস্তক রচনা করেন। তার সম্বন্ধে তেমন জানা যায় না।

* মৌলানা গুল হোসাঈন রহমাতুল্লাহ

ইনি খোরাসানের অধিবাসী ছিলেন।

* হযরত মোল্লা গোলাম আবেদ রহমাতুল্লাহ [৭২]

ইনি হুগলী জেলার নসিব পুর ষ্টেশনের সন্নিকটে মোল্লা সিমলা গ্রামের অধিবাসী। এখানেই হযরত আনোয়ার কুলী খান হালব্বী রহমাতুল্লাহ এর মাজার শরীফ। হযরত শাহ পাহলোয়ান রহমাতুল্লাহ ও অন্যান্য বুযর্গ ব্যক্তিদের মাজার বিদ্যমান। এ গ্রামেই মোল্যাসাহেবের বাড়ীতে হযরত সূফী ওয়সী রহমাতুল্লাহ এর শেষ 'সফর', এখানেই শেষ বিমারিতে আক্রান্ত হন।

হযরত ওয়সী রহমাতুল্লাহর খলিফাদের বংশধরদের তথ্য সরবরাহ করার জন্য আবেদন জানাই। আপনারা তথ্য তালাশ করে জানালে পরবর্ত্তী সংস্করণে ইনশা আল্লাহ সংযোজন করা হবে।

দিওয়ানে-ওয়সী

"কুল ইন্ কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তবিয়ূনী ইউহ্বিব কুমুল্লাহ্ ওয়া ইয়াগ ফিরলাকুম যুনুবাকুম অল্লাহু গফুরুর রহীম" — আলকোরআন

হাত্তা আকুনা আহাব্বা ইলাইহি মিউওয়ালেদেহী আও ওয়ালাদেহী অন্নাসে আজ মাঈন। — আল হাদীস।

কোরআন পাকের ঘোষণা- হে নবী বলে দাও! হে লোক সকল যদি তোমরা আমি আল্লাহকে পেতে চাও, তাহলে তোমাদের নবীর অনুসরণ কর এবং ভালোবাসো।

৭২। আয়নায়ে ওয়সী ২০৩-২০৭ পৃঃ। মুরীদদের অধিকাংশ তথ্য আয়নায়ে ওয়সী থেকে সংগৃহীত।—রহমানী

আবার সে ভালোবাসা কেমন হবে-হাদীসে রাসুল বলেন - তোমরা মু'মীন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততিদের চেয়ে আমাকে বেশী না ভালোবাসবে।

ভালোবাসা 'দুনিয়ার গরজে' আর 'দ্বীনের গরজে'। দুনিয়ার গরজে ভালোবাসা-বাসীতে কত রাজাধিরাজ পথের ভিখারী হয়েছে, আবার আহলুল্লাহ বান্দারা ভালোবাসাবাসীতে জীবন উৎসর্গ করেছে অকাতরে। তাদের লক্ষ্য একটিই - 'নবীপ্রেম', নবীকে ভালোবাসো অকৃত্রিমভাবে, আর কাকেও নয়।

তবে সাধারণতঃ মানুষ ভালোবাসে, প্রেম নিবেদন করে, প্রেমিকের-রূপ দেখে, গুণ দেখে, সহায় সম্পদ দেখে, কিন্তু বিষয়-বৈভব ও রূপ লাবণ্য খোদা প্রেমিক বান্দার আকর্ষণ বিন্দু নয়। রূপে-অপরূপ সেতো হযরত নবী-ইউসুফ (আঃ) আর ধন সম্পদ হযরত সোলায়মান, হযরত ইবরাহীম আরও নানা গুণে গুণান্বীত ছিলেন অনেক পয়গম্বর আঃ তবুও কেন মহান আল্লাহ বিশ্বনবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ভালো বাসতে আদেশ করলেন।

এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে বড় মহাকাব্য রচিত হয়েছে - বিশ্ববরেন্য বাঙ্গালী ফার্সি কবি সূফী সাইয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়সী 'দিওয়ানে-ওয়সী' নামে সুবৃহৎ কাব্যগ্রন্থ, রচনা শেষ করেন ১৩০০ হিজরী সনে।

আমার নবী বিশ্বনবী ছিলেন- দুধে-আলতা রংয়ে ভূবন মোহিনী রূপ ও গুনের আঁধার। তেজ জ্যোতিতে চোখ ঝলসে যায়, স্নিগ্ধ-কিরণে চোখ জুড়ায়। হযরত ইউসুফ আঃ এর রূপে, হাত কেঁটে ফেলে, আর আমার নবীর রূপে দিল দিওয়ানা-মাস্তানা পারাপারা, দাঁত ভেঙ্গে ফেলে। হযরত ইউসুফ নবীর প্রেমের একজন পাগল কিন্তু আমার নবীর প্রেমে সারা বিশ্বপাগল পারা। তাদেরই একজন হযরত ওয়সী। বিশ্বনবীর দিওয়ানা হযরত ওয়সী বিশ্ব পথিক সাজলেন - অজানার পথে পাড়ি দিলেন, পাহাড় জঙ্গল তাঁর একাকার হয়ে যায়। সে সবের হিসাব মিলানো অতি দুষ্কর। বিরহ যাতনায় আত্মহননের পথে মিলন মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠে কায়েমী ভাবে — ঘটে রাসুলনোমার আত্ম প্রকাশ।

'দিওয়ানে-ওয়সী' গ্রন্থে রয়েছে ১৭৯ টি গজল ও ২৩ টি কাসিদা, যা নবী প্রেমে মাতোয়ারা আবার বিচ্ছেদ-যাতনায় কাকুতি মিনতীতে ভরা। আবার কাসিদা গুলো বেশ বড়-সড়। তাও হুযুরের লেখা দিওয়ানের ৭টি হরফ বিশিষ্ট গজল ও কাসিদা পাওয়া যায় না। কেননা ১৮৮২ তে লেখা শেষ ১৮৮৬ তে তাঁর ইন্তেকাল। আর প্রথম মুদ্রন ১৮৯৮ খ্রীঃ ৩য় মুদ্রন ১৯৩৫ খ্রীঃ তদ্বীয় দৌহিত্র মৌলভী সাইয়্যেদ মীর হাসান সাহেব কর্তৃক কোলকাতা থেকে। শত বছর পর তাঁর পৌত্র আলহাজ্জ শাহ সাইয়্যেদ জানে আলম (এডভোকেট) সাহেব ফার্সীকাব্যের বঙ্গানুবাদ করেন।

'দিওয়ানে ওয়সী' কাব্য গ্রন্থ হলেও বাস্তবে শরিয়তের নানাবিধ বিধান, বিচ্ছেদ-বেদনা, সাহিত্য-সাধনা, প্রেম-নিগরানা ভরা এক অমূল্য সম্পদ। কত মহাজন আঁকতে পারলোনা তাঁর সর্বাঙ্গীন রূপ রেখা, আমি রহমানীতো কোন ছার।

কোরআন পাকে কবিদের সম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসার স্থলে সতর্কবাণী ঘোষণা আছে - 'পথভ্রষ্টতার আন্দেসা' — সুরা শুয়ারা। অধিকাংশ কবিরাই পথভ্রষ্ট। কতিপয় কেবল ব্যতিক্রম। যে সব কবিরা ছিলেন - ব্যতিক্রম ধর্ম্মী - হযরত সূফী ফতেহ আলী ওয়সী রহমাতুল্লাহ ছিলেন অন্যতম। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন - হক্কানী -রব্বানী সূফী কবি। শাহ-সূফী সূফীদিগের বাদশাহ — শাহেনশা। জ্ঞানীদের জন্য ইশারাই যথেষ্ট, হাড়ির একটি ভাত টিপলেই হাড়ির খবর হয়ে যায়।

* দিওয়ানে-ওয়সীর প্রথম গজল *

মশরেকে হুব্বে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাতলায়ে দিওয়ানে মা
মাতলায়ে খুরশিদে এশকাশ সিনায়ে সুজানে মা।
দরত্তাহে হার লাফজ পেনহা নালায়ে দিল সুজেমা,
অজবুনে হার হারফে পায়দা আতাশে পেনহানে মা।
হার গজল আতাশ কাঁদা হার বায়েতে আ এক শোলায়ে,
আতাশে আফরুখতা হার মেছরায়ে দিওয়ানেমা।
পাদশাহে কেশওয়ারে ইশকাম জনুনে দস্তুরে মান।
মসনদে মা খাকে কুয়েশ কুয়েউ আওয়ানে মা।

হার কুজা দর সিনায়েআমগুল কারদা জখেমে এশকেউ,
শুদ গুলিস্থান আখের আয় দিল সিনায়ে বিরানে মা।
মাতলায়ে হুসনে আজল আঁন চেহরায়ে রোখশানো দোস্ত,
মাশরেকেনূরে কেদাম আ তালয়াতে জানানে মা।
আঁকে উঁ মাহবুবে, রাহমাঁ দিল শাহীদে আনেউ,
আঁকে উ মতলুবে ইয়াজদানে আরজুয়ে জানে মা।
খাতেমা বিলখায়ের বাসাদগর বুদে বর অকত মর্গ
বররুখে জেবাতে হায়রা দিদায়ে গিরয়িনে মা।
ওয়সীয়া আজ দীন ও ঈমাঁ ইকদর দানিমো বস
দীনে মা ইশকে মুহাম্মদ হুব্বে উঁ ঈমানে মা।

ওয়সী পীরের পৌত্র আলহাজ্জ শাহ-সাইয়্যেদ জানে আলম্ রহমাতুল্লাহ এর বঙ্গানুবাদ ঃ-

আমার দিওয়ানের প্রথম ছন্দ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রেম হইতে উদ্ধৃত্ত,
তার ছন্দের প্রেমের সূর্য্য আমার বুকে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে।
প্রত্যেক শব্দের তলে আমার প্রাণ দগ্ধ কারি ক্রন্দন লুকায়িত আছে।
প্রত্যেকটি ইথরের নীচে সুপ্ত আগুন নিহিত আছে।
প্রতি গজল অগ্নিকুন্ড প্রতি ছন্দ অগ্নিস্ফুলিংগ
আমার ছন্দের প্রতিটি ছত্র প্রজ্জ্বলিত অগ্নিসম
হে আমার প্রেমের রাজ্যের বাদশাহ পাগলামিই আমার স্বভাব
তোমার গলির ধূলিই আমার সিংহাসন
তোমার গলিই আমার প্রাসাদ
আমার বুকের সর্বত্র তোমার প্রেমের ফুলের আঘাতে জর্জরিত হইয়া আছে
আমার ধ্বংস প্রাপ্ত প্রাণ পুষ্পোদ্যানে পরিণত হইয়াছে,
বন্ধুর মুখের চেহারা আদি সৃষ্টির সৌন্দর্য্যের বিকাশ
বন্ধুর চেহারায় আদি নূরের উদয় দেখা যায়।
সে বা আমার বন্ধু তাহাতে আমার প্রায় উৎসর্গ কৃত।
খোদা যারে চায় সে আমার প্রাণের আরাধনা

আমার জীবন সন্ধ্যা শুভ হবে সদি মৃত্যুকালে আমি হয়রান হই এবং চক্ষুক্রন্দন রত হয়।

ওয়সী তার ধর্ম ও ইমান সম্বন্ধে এতটুকু মাত্র জানে যে মুহাম্মাদের সঃ প্রেমই তার ধর্ম্ম এবং তার ভালবাসাই আমার ঈমান।

খ্যাতনামা সাংবাদিক আঞ্জুমানে-ফার্সি বাংলাদেশ এর সাবেক সভাপতি ড. মুহাম্মদ ফরিদউদ্দীন খান সাহেব দিওয়ানে ওয়সীর কাব্য অনুবাদ করেছেন, বেশ সাবলীল ও সুন্দর।

বিতাব কার্দে হুসনে তু হুরে নাঈমরা,
বি আব কার্দে রুইয়র্রতু দুরে ইয়াতিমরা।
তোমার রূপ সৌন্দর্য অস্থির করে তুলেছে উৎফুল্লাহ খুশীমনা হুরকে
তোমার রূপ (চেহারা) শ্রীহীন করে দিয়েছে রূপসী মুক্তোকে।
বার চশমে ক্বদাম যেনেহ এ্যাই শাহে আম্বীয়া
মনাদ ক্বদম যেবারে ফেরাকে তুজিমরা।
আমার চোখে তোমার কদম (পা) রাখো হে শাহে আম্বিয়া
তোমার বিরহ যাতনার ভারে যে আমার পা বেঁকে 'দ' হয়ে যায়।
চুরাহে মুস্তাকীম বেজুয সুন্নাতে তুনিস্ত
ওয়সী বেজান গুজিদ রাহে মুস্তাকীমরা।
যেহেতু তোমার সুন্নত বৈ মুস্তাকীম সরল সোজা পথ আর নেই
সেহেতু ওয়সী জান প্রাণ দিয়ে ঐ মুস্তাকীম পথই বেছে নিয়েছে।

দিওয়ানে ওয়সীর ১৮৮ পৃষ্ঠাব্যাপী বিশ্বনবী শানে গজল ও ক্বাসিদা বাকী ৪৪ পৃষ্ঠা অন্যান্য গজল কাসিদা, চিঠি পত্র, শাজরানামা, কতিপয় খলিফার বিবরণ সহ খলিফা ও মুরীদদের নাম। শেষ/তৃতীয় সংস্করণ ২৩২ পৃষ্ঠা সমাপ্ত। শেষের ৪৪ পৃষ্ঠার (১৮৮, ১৯৭, ২৩২ পৃঃ) সবটাই হযরত ওয়সী রহমাতুল্লাহ লেখা না হলেও মূল্যবান তথ্যপূর্ণ।

'দিওয়ান-ই-ওয়সী' সুবৃহৎ কাব্য গ্রন্থ। আর তা রাসুল প্রেমের মুক্তমালা। জহুরী ছাড়া তার মূল্যায়ণ করা অসম্ভব। রহমানী — 'আদার ব্যপারী, জাহাজের খবর কি রাখে'।

আল্লামা পীর রূহল আমীন রহঃ ড. আল্লামা শহীদুল্লাহ (ভাষাচার্য্য, ডি, লিট) বাংলার সূফী কবি ওয়সীকে খাকানী, সাদী, সিরাজী থেকে কোন অংশে যে কম ছিলেন না, নবাব সিদ্দিক হাসান ভূপালী সাহেব ও অকপটে স্বীকার করেছেন।

ড. শহীদুল্লাহ সাহেব হাফেয সিরাজীর উপমায় বলেন—

আগার আঁ-তুর্কে সিরাজী বদস্ত আরদ দিলে মারা
বখালে হিন্দুয়শ বখ্শম সমরকন্দ বুখারারা।

ড. শহীদুল্লাহ সাহেবের অনুবাদ —

সেই সিরাজী তুর্কিবালা নেয় যদি মোর হিয়ারে,
তার এক তিলে বিলিয়ে দিব সমর কন্দ বুখারারে।

এ উপমায় হযরত সূফী ওয়সী লিখেছেন —

আগর আঁশাহে খুবানম নাহাদ বর চশ্মে মান পারা।
বখাকে খায়েউ বখশাম মা আন দুনইয়া ও উকবারা।

ড. শহীদুল্লাহ সাহেবের অনুবাদ —

মোর যদি সে রূপের রাজা পা রাখে মোর আঁখির পরে,
বিলিয়ে দিব দ্বীন দুনিয়া তার চরণের ধুলির তরে।

অতুলনীয় ভাবসম্প্রসারণ। খোদাহাফেজ।

দিওয়ানে ওয়সীর বঙ্গানুবাদ ছারছীনা দারুচ্ছুন্নত লাইব্রেরী থেকে ' দেওয়ানে ওয়ায়েছী বা হুব্বে রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম" কাব্য অনুবাদ ৯৫৮ পৃষ্ঠার সর্ববৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। সম্পাদনায়- হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ মুস্তফা হামীদী, প্রাক্তান উপাধাক্ষ্য ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদ্রাসা। প্রকাশ কাল-২০১২ ইং।

।। শাজারায়ে তাইয়্যেবা ।।

তরীকায়ে আলীয়ায়ে নকশবন্দীয়া ও মোজাদ্দেদীয়া শাজরা শরীফ।

* সাইয়্যেদুল মুরসালীন, রাহ্‌মাতুল্লীল আলামীন, খতামুন্নাবীয়ীন, শাফিউল মুজনাবীন, আঁকা মওলা, হযরত আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

* আমীরুল মু'মেনীন, সিদ্দিকে আকবর হযরত আবু বকর সিদ্দিকী আলকোরায়সী রাদিআল্লাহু আনহু।

* সাহাবীয়ে-রাসুল হযরত সালমান ফারসী রাঃ।

* খায়রুত্তাবেয়ীন, হযরত কাসেম বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর সিদ্দিক রাঃ।

* হযরত ইমাম জাফর সাদিক রহমাতুল্লাহ।

* হযরত ইমাম মুসা কাযেম রহঃ।

* হযরত ইমাম মুসা আলী রেযা রহমাতুল্লাহ।

* হযরত শায়েখ মারুফ কারখী রহমাতুল্লাহ।

* হযরত আবুল হুসাঈন সরী সকতী রহমাতুল্লাহ।

* হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহ।

* হযরত খাজা আবু আলী রোদবারী রহমাতুল্লাহ।

* হযরত আবুল কাসেম নাসিরাবাদী রহমাতুল্লাহ।

* হযরতে আবু আলী দাক্কাক রহমাতুল্লাহ।

* হযরত আবুল কাসেম কুরাইসী রহমাতুল্লাহ।

* হযরত খাজা আবু আলী ফারমদী রহমাতুল্লাহ।

* হযরত খাজা আবু ইউসুফ হামদানী রহমাতুল্লাহ।

* হযরত খাজা আবদুল খালেক গিজদেওয়ানী রহমাতুল্লাহ।

* হযরত খাজা আরিফ রেওগরী রহমাতুল্লাহ।

* হযরত আবুল খায়ের ফাগনূবী রহমাতুল্লাহ।

* হযরত খাজা আযীযান আলী রমতনী রহমাতুল্লাহ।

* হযরত মুহাম্মদ বাবা শাম্মাসী রহমাতুল্লাহ।

* হযরত সাইয়্যেদ আমীর কুলাল রহমাতুল্লাহ।

* হযরত খাজায়ে খাজেগান, খাজা বাহউদ্দীন বোখারী রহমাতুল্লাহ।

ইনি নকশাবন্দী তরীকার ইমাম

* হযরত আলাউদ্দীন, আত্তার রহমাতুল্লাহ।

* হযরত খাজা ইয়াকুব চারখী রহমাতুল্লাহ।
* হযরত খাজা ওবায়দুল্লাহ আহ্‌রার রহমাতুল্লাহ।
* হযরত খাজা যাহেদ রহমাতুল্লাহ।
* হযরত সাইয়্যেদ দরবেশ মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ।
* হযরত খাজা আমকানগী রহমাতুল্লাহ।
* হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ রহমাতুল্লাহ।
* হযরত ইমামুত ত্বরীকৃত, কুতবে রাব্বানী, মুজাদ্দেদে আলফে সানী, শাইখ আহমদ ফারুকী সারহান্দী রহমাতুল্লাহ।
* হযরত আদম বান্নুরী রহমাতুল্লাহ।
* হযরত সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ আকবরাবাদী রহমাতুল্লাহ।
* হযরত মাওলানা শাহ আবদুর রহীম মুহাদ্দিস দেহলবী রহমাতুল্লাহ।
* হযরত মাওলানা শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী রহমাতুল্লাহ।
* হযরত মাওলানা শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দেস দেহলবী রহমাতুল্লাহ।
* হযরত আমীরুল মোমেনীন, সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহমাতুল্লাহ।
* হযরত গাজীয়ে বালাকোট, হাজী শাহসূফী নূরমুহাম্মদ নিযামপুরী রহমাতুল্লাহ।
* হযরত মাওলানা কুতবুল-ইরশাদ সাইয়্যেদ সূফী ফতেহ্ আলী ওয়সী রহমাতুল্লাহ।
* হযরত মোজাদ্দেদে-যামান, আমীরুশ শরীয়ত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী আলা কোরায়সী ফুরফুরাবী রহমাতুল্লাহ।
* হযরত আল্লামা মুফতী শাইখুল মাশায়েখ আবু যাফর সিদ্দিকী রহমাতুল্লাহ ও হযরত সুলতানুল আরেফীন মাওলানা নজমুস্‌সায়াদাত সিদ্দিকী রহমাতুল্লাহ।
* খাদেমুল মিল্লাত, গোলামানে-গোলাম, মুহাম্মদ মুবারক আলী রহমানী কোড়া পাড়া, বসিরহাট।

।। শাজরায়ে তাইয়্যেবা ।।

। তরীকায়ে আলীয়ায়ে চিশতিয়া ।

* সাইয়্যেদুল মুরসালীন, শাফিউল মুজনাবীন, রাহ্‌মাতুল্লীল আলামীন, হযরত আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

* হযরত আমীরুল মু'মেনীন, খলিফাতুল মোসলেমীন, হযরত আলী মুর্দতজা রাদি আল্লাহু আনহু।

* হযরত খায়রুত্তাবেয়ীন হযরত হাসান বাসরী রহমাতুল্লাহ।

* হযরত আবদুল ওয়াহেদ বিন যাহেদ রহমাতুল্লাহ।

* হযরত ফোজায়েল বিন আয়াজ রহমাতুল্লাহ।

* হযরত সুলতানুল আরেফীন হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম রহমাতুল্লাহ।

* হযরত হুযায়ফা মারয়াসী রহমাতুল্লাহ।

* হযরত আমীনুদ্দীন হুযাইরা বাসরী রহমাতুল্লাহ।

* হযরত শায়খ আবু ইব্রাহীম এসহাক উলুব বেদেনওয়ারী রহমাতুল্লাহ।

* হযরত শায়খ আবু এসহাক শামী রহমাতুল্লাহ।

* হযরত খাজা আবু আহমদ আবদাল চিশতী রহমাতুল্লাহ।

* হযরত খাজা আবু মুহাম্মদ চিশতী রহমাতুল্লাহ।

* হযরত খাজা নাসিরুদ্দীন আবু ইউসুফ চিশতী রহমাতুল্লাহ।

* হযরত খাজা কুতুবউদ্দীন মউদুদ চিশতী রহমাতুল্লাহ।

* হযরত খাজা শরীফ জিন্দানী রহমাতুল্লাহ।

* হযরত খাজা উসমান হারুনী রহমাতুল্লাহ।

* হযরত সুলতানুল হিন্দ, ইমামুত্তারীকত হযরত খাজা মঈনুদ্দীন হাসান চিশতী আজমেরী রহমাতুল্লাহ।

* হযরত খাজা কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কাকী রহমাতুল্লাহ।

* হযরত খাজা বাবা ফরীদউদ্দীন গঞ্জেশাকর রহমাতুল্লাহ।

* হযরত খাজা নিযামউদ্দীন আওলিয়া রহমাতুল্লাহ।

* হযরত শায়খ আঁখি সিরাজ ওসমান আওদী রহমাতুল্লাহ।

* হযরত শায়খ আলাউল হক রহমাতুল্লাহ।

* হযরত খাজা নূর কুতবে আলম রহমাতুল্লাহ।

* হযরত খাজা হুসামুদ্দীন মানিক পুরী রহমাতুল্লাহ।

* হযরত সাইয়্যেদ রাযী হামিদ শাহ রহমাতুল্লাহ।

* হযরত শায়খ হাসান বেনে তাহের রহমাতুল্লাহ।

* হযরত কাজী খান ইউসুফ নাসেহী রহমাতুল্লাহ।
* হযরত শায়েখ আবদুল আযীয রহমাতুল্লাহ।
* হযরত শায়েখ নজমুল হক রহমাতুল্লাহ।
* হযরত আবদুল আযীয রহমাতুল্লাহ।
* হযরত শায়খ কুতবে আলম রহমাতুল্লাহ।
* হযরত শায়েখ রফিউদ্দীন দেহলবী রহমাতুল্লাহ।
* হযরত মাওলানা শাহ আবদুর রহীম মোহাদ্দেস দেহলবী রহমাতুল্লাহ।
* হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলবী রহমাতুল্লাহ।
* হযরত মাওলানা শাহ আবদুল আযীয মোহাদ্দেস দেহলবী রহমাতুল্লাহ।
* হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আহম্মদ শহীদ মোজাদ্দেদ বেরেলভী রহমাতুল্লাহ।
* হযরত মাওলানা কুতবুল আকতাব গাজী সূফী নূরমুহাম্মদ নিযামপুরী রহমাতুল্লাহ।
* হযরত মাওলানা কুতবুল-ইরশাদ, সূফী সাইয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়সী রহমাতুল্লাহ।
* হযরত মাওলানা মোজাদ্দেদে-যামান, পীর আবু বকর সিদ্দিকী ফুরফুরাবী রহমাতুল্লাহ।
* হযরত মুফতী শায়খুল মাশায়েখ আল্লামা আবু যাফর সিদ্দিকী রহমাতুল্লাহ ও সুলতানুল আরেফীন, শাহ সূফী নজমুস্ সায়াদাত সিদ্দিকী রহমাতুল্লাহ

খাদেমুল মিল্লাত, গোলামানে গোলাম, মুহাম্মদ মুবারক আলী রহমানী, কোড়াপাড়াবী, বসিরহাট।

।। শাজরায়ে তাইয়্যেবা ।।

তরীকায়ে আলীয়ায়ে ক্বাদরীয়া শাজেরা শরীফ।

* হযরত নবীয়ে মাহশর, রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল-মুজনাবীন, আঁকা মওলা হযরত আহমদে মুজতবা, মুহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।
* হযরত আমীরুল মু'মেনীন, শেরেখোদা হযরত আলী মুরতাজা রাদি আল্লাহু আনহু।
* হযরত সাইয়্যেদুস শোহাদা ইমাম হুসাঈন রাঃ
* ইমাম যয়নাল আবেদীন রাঃ
* ইমাম মুহাম্মদ বাকের রাঃ
* ইমাম জাফর সাদেক রহমাতুল্লাহ।
* ইমাম মুসা কাজেম রহমাতুল্লাহ।
* ইমাম মুসা আলী রেযা রহমাতুল্লাহ।
* শাইখ মারুফ কারখী রহমাতুল্লাহ।
* হযরত আবুল হুসাঈন সর্রীসকতী রহমাতুল্লাহ।
* হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহ।
* হযরত আবু বকর শিবলী রহমাতুল্লাহ।
* হযরত আবদুল আযীয বিন হারেস তামীমী রহমাতুল্লাহ।
* শাইখ আবুল ফারাহ তারতুসী রহমাতুল্লাহ।
* শাইখ আবুল হাসান রহমাতুল্লাহ।
* শাইখ আবু সাঈদ মাখযুমী রহমাতুল্লাহ।
* মাহবুবে-সুবহানী, গওসে-সামদানী, গওসুল আযম, ইমামে তরীকাত, হযরত সাইয়্যেদ মহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ।
* কুতবে রব্বানী সাইয়্যেদ আবদুর রজ্জাক রহমাতুল্লাহ।
* হযরত শাহ সাইয়্যেদ শারফুদ্দীন কাত্তাল রহমাতুল্লাহ।
* হযরত শাহ সাইয়্যেদ আবদুল ওহাব রহমাতুল্লাহ।
* হযরত শাহ সাইয়্যেদ বাহাউদ্দীন রহমাতুল্লাহ।
* হযরত সাইয়্যেদ আকীল রহমাতুল্লাহ।
* হযরত সাইয়্যেদ শামসুদ্দীন শাহরায়ী রহমাতুল্লাহ।
* হযরত শাহ গদা রহমান আওয়াল রহমাতুল্লাহ।
* হযরত সাইয়্যেদ শামসুদ্দীন আরেফ রহমাতুল্লাহ।
* হযরত সাইয়্যেদ গাদা রহমান সানী রহমাতুল্লাহ।
* হযরত ফোজায়েল রহমাতুল্লাহ।

* হযরত শাহ কামাল কায়থালী রহমাতুল্লাহ।
* হযরত শাইখ মুজাদ্দেদে-আলফে সানী শায়খ আহমদ ফারুকী সারহান্দী রহমাতুল্লাহ।
* হযরত আদম বান্নুরী রহমাতুল্লাহ।
* হযরত সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ আকবরাবাদী রহমাতুল্লাহ।
* হযরত মাওলানা শাহ আবদুর রহীম মুহাদ্দেস দেহলবী রহমাতুল্লাহ।
* হযরত মাওলানা শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলবী রহমাতুল্লাহ।
* হযরত মাওলানা শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দেস দেহলবী রহমাতুল্লাহ।
* হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ মুজাদ্দেদ ব্রেলভী রহমাতুল্লাহ।
* হযরত মাওলানা কুতবুল আকতাব হাজীগাজী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী রহমাতুল্লাহ।
* হযরত মাওলানা কুতবুল-ইরশাদ, সাইয়্যেদ সূফী ফতেহ আলী ওয়সী রহমাতুল্লাহ।
* হযরত মাওলানা মোজাদ্দেদে-যামান, পীর আবু বকর সিদ্দিকী আলকোরায়সী ফুরফুরাবী রহমাতুল্লাহ।
* হযরত আল্লামা মুফতী শাইখুল আরেফীন আবু যাফর সিদ্দিকী রহমাতুল্লাহ ফুরফুরাবী ও হযরত মাওলানা সুলতানুল আরেফীন, ওলিয়ে মাদারযাদ নজমুস সায়াদাত সিদ্দিকী ফুরফুরাবী রহমাতুল্লাহ।
* খাদেমুল মিল্লাত গোলামানে গোলাম মুহাম্মদ মুবারক আলী রহমানী, কোড়াপাড়া, বসিরহাটী।

পরিশিষ্ট

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে ১৯৫০ সাল থেকে ২৪/১, মুনশী পাড়া লেন, (লালাবাগান) মানিকতলা দিল্লীওয়ালা কবরস্থান হাজী রহিমবকস ওয়াকফ স্টেট, ই, সি, নম্বর ১১৭৬৬। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওয়াকফ নথিভুক্ত সম্পত্তি। হাজী তানবীর আহমদ ল্যান্ড হোল্ডার ও প্রথম মোতাওয়াল্লী। তিনিই উক্ত কবরস্থানের দায়ভার ও দেখভালের পূর্ণ দায়িত্ব। সেখানে কিছু করণীয় কি, তিনি ও পরবর্ত্তী মোতাওয়াল্লী সাহেবের কর্তব্য ও দায়িত্ব। পাবলিকের কাজ কবর জিয়ারত ও অন্যান্য ধর্মীয় আচার আচরণগুলো করা। জনাব তানবীর আহমদ সাহেবের পরে কে মোতাওয়াল্লী ছিলেন নথিতে পাওয়া যায় না।

স্বীকার করতে সকলেই বাধ্য ১৯৪৭ সালের পর মানিকতলার সে সুন্দর পরিবেশ মোটেই ছিল না। সহায় সম্পত্তি বেদখল হতে থাকে। ১৯৫০ সাল থেকে মোতাওয়াল্লী এবং সরকার তথা ওয়াকফ বোর্ড দ্বায়বদ্ধতা থেকে কখনই মুক্তি পেতে পারে না। আর এ দ্বায়বদ্ধতার গাফলতির সুযোগে ২৪/১, মুনশী পাড়া লেন কবরস্থানের সম্পত্তি নষ্ট হতে থাকে।

১৯৫০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত এর প্রতিকারের জন্য জোরালো কোন ব্যবস্থার নথিপত্র ১১৭৬৬ নম্বর ওয়াকফ স্টেটের ফাইলে পাওয়া যায় না। না পাওয়া যায় আয় ও ব্যায়ের কোন হিসাবপত্র। ওয়াকফ বোর্ডের নিষ্ক্রয়তা ও মোতাওয়াল্লীর ব্যর্থতাই দায়ী বললে ভুল হবে না। কার্যতঃ মোতাওয়াল্লী অপদার্থ ও দুর্নীতি পরায়ণ হলে 'ওয়াকফ লিল্লাহ' হওয়ার সুবাদে ওয়াকফ বোর্ড উপযুক্ত মোতাওয়াল্লী নিয়োগ বা রিসিভার নিয়োগ করা, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ ওয়াকফ বোর্ড এখানে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

বঙ্গীয় ওয়াকফ কমিশন বা বোর্ড হয়তো বলতে পারে বোর্ডের কাগজ পত্র পূর্বপাকিস্থানে চলে যাওয়ার ফলে অসুবিধা হয়, সে তো সাময়িক সময়ের জন্য, এ অজুহাতে বোর্ডের কতিপয় কর্মকর্তাদের সহায়তায় একদল মানুষ ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে ছিনিমিনি খেলা শুরু করে। তবে স্মরণ রাখতে হবে হাজী, রহিম বকস ওয়াকফ স্টেট তো ১৯৫০ সালের নথিভুক্ত সম্পত্তি। কাজেই ১৯৪৭ সালের অজুহাত ধোপে টিকে না।

সরকারের সদিচ্ছার অভাব, বিগত কংগ্রেস সরকার এবং বর্তমান বাম ফ্রন্ট সরকার যেন - ‘‘মাসতুতোভাই’’। পশ্চিমবঙ্গ ওয়াকফ বোর্ড যেন ‘অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র’।

১৯৪৭ সালের হাঙ্গামার পর ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেবের পরিচালিত মানিকতলার মাহফিল স্থান পরিবর্তন করে মার্কেট ষ্ট্রীট মসজিদে (নিউমার্কেট) অদ্যাবধি হয়ে আসছে।

এ দিকে মানিকতলার পরিবেশ একটু শান্ত হলে - ফুরফুরা শরীফের খলিফা হযরত মাওলানা আহমদ আলী হামিদ জালালী সাহেব (১৯৪৯-১৯৫১) মানিকতলায় ২৪/১, মুনশী পাড়া লেন মাজার শরীফে মাহফিল ও একটি দ্বিনী মাদ্রাসা কায়েম করেন। ‘মাজার শরীফের সংস্কার ও প্রশাসনিক কার্য কলাপ তিনি হয়তো আবশ্যক মনে করেন নি। তারপর তদ্বীয় জামাতা ‘আঞ্জমনে ইত্তেবায়ে সুন্নত’ নামে সংগঠনের মাধ্যমে তথায় মাহফিল শুরু করেন। অতঃপর ১৯৮০ সালে জনাব আখতাবী সাহেব ‘ওয়সী মেমোরিয়াল এ্যাসোসিয়েশন’ প্রতিষ্ঠা করে মানিক তলায় কেবল মাহফিল পুনঃ কায়েম করেন।

কবর সংস্কার, করবে ফুল চাদর চড়ানো, কবর সিজদা করা, মেয়েদের যোগদান করা, এমন কি কোন বিদয়াতী ভণ্ড পীর আমদানী করেননি। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর অযোগ্য সন্তান ও সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশী ভণ্ড বিদয়াতীপীর আমদানী করে ঐ সব শিরক ও বিদয়াত প্রচলন করার (অপচেষ্টা) প্রয়াস পায়।

ফুরফুরা শরীফের মুজাদ্দেদে-যামান আলা হযরত পীর আবু বকর সিদ্দিকী রহমাতুল্লাহ কর্তৃক নির্মিত হযরত ওয়সী পীরের মাজার শরীফ সংস্কার করেন — ১৯৭২ সালে পাবনার এনায়েত পুরীর বেগম সাহেবা। তখনও মূল মাজার অক্ষুন্ন ছিল। এবার ১৯৯২ সালে এ্যাসোসিয়েশনের সহায়তায় উক্ত মাজার শরীফ ভেঙ্গে মাজার শরীফ নির্মাণ করেন এবং আশেপাশের কয়েকটি কবর ভেঙ্গে সমতল করে তার উপর প্রায় ২৫()৩০ স্কোয়ার ফুল চাতান করে রেলিং দিয়ে ঘিরে দেয়, যা বর্তমান আছে।

ইতিমধ্যে ১৯৮৫-৮৬ এ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক নিজেকে (ভূয়া) মোতাওয়াল্লী বলে চালাতে থাকে ফলে প্রতিপক্ষ 'আঞ্জমানে পাঞ্চাবিয়ানে দেহলী' কোলকাতা হাইকোর্টে দীর্ঘ দিন মামলা করে ওয়াকফ বোর্ড কর্তৃক দুবছরের জন্য মোতাওয়াল্লী মনোনীত হয়। কাগজে কলমে আঞ্জুমান মোতাওয়াল্লী থাকলেও ইতিমধ্যে এ্যাসোসিয়েশন এমাম সাহেবের কামরা জবর দখল করে নেয় ফলে আঞ্জুমানের 'এমামসাহেব' মসজিদে থাকতে বাধ্য করায়।

সর্বত্র এ্যাসোসিয়েশন দাপট দেখিয়ে বহিরাগত জিয়ারত কারীদের থেকে ফায়দা ওঠাতে থাকে এবং কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখার জন্য সর্ব প্রকার অপকৌশল অবলম্বন করে, ফলে আঞ্জুমানের সাথে এ্যাসোসিয়েশনের একটা জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আর এ ঘোলাটে পরিবেশে কিছু মানুষ জবর দখল করতে থাকে এবং পরিবেশ সমাজ বিরুধীদের আবাসে পরিণত হয়। এ্যাসোসিয়েশন মানিকতলায় জবর দখল করে অবৈধভাবে থেকেও অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকা পালন করতে থাকে, কে কত সমাজ বিরুদ্ধীদের প্রিয়পাত্র হতে পারে সে প্রচেষ্টা চালাতে থাকে, ফলে খাটাল, গোবরের ঢাঁই, বলখেলার মাঠ, গাড়ীর গ্যারেজ, মোবিলের দোকান প্রভৃতি গজিয়ে ওঠে। আঞ্জুমানের এ সব অন্যায় অবৈধ কাজের কোন রূপ প্রতিকার ব্যবস্থার নথিপত্র ওয়াকফ বোর্ডে পাওয়া যায় না। না পাওয়া যায় এ্যাসোসিয়েশনের জোরালো প্রতিবাদ-প্রতিকারের নথিপত্র, আর স্বয়ং ওয়াকফ বোর্ড কুম্ভকর্ণ। উক্ত দুটি সংস্থাই মোতাওয়াল্লীর লড়াইয়ে খুবই সচেষ্ট, কিন্তু 'ষ্টেটের ভালমন্দ নিয়ে নয়। প্রায় ৩০ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে এ্যাসোসিয়েশনের অপরিণাম-দর্শীতা, হটকারী অসাধু মানসিকতা, আঞ্জমানের গাফলতী ও ব্যর্থতা, সরকারী উদাসিনতা হাজী রহিম বকস ওয়াকফ ষ্টেটের এ করুন চিত্র, তা আজ দিবালোকের ন্যায় সত্য।

ইতিমধ্যে এ্যাসোসিয়েশনের কর্মপদ্ধতির নানাবিধ ব্যাধির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে প্রতিকার না পেয়ে "নূরীয়া ফতেহীয়া-সিদ্দিকীয়া ফাউণ্ডেশন"—ফুরফুরা শরীফ, হুগলী। মোজাদ্দেদে-যামান, রহমতুল্লাহ মতাদর্শে, অরাজনৈতিক সমাজ কল্যাণ ধর্ম্মীয় সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ফাউণ্ডেশনের মুখ্য উদ্দেশ্য—হযরত ওয়সী পীরের

মাজার ও মসজিদের উন্নয়ন, গোরস্থানের সার্বিক হেফাজত। জিয়ারতকারীদের ও দূরাগত মেহমানদের থাকা ও খাওয়া, পাক ও পবিত্রতার জন্য পানীয় ও বাথরুম এবং ওযুখানার সু-ব্যবস্থা করা, সর্বপরি হযরত সূফী ওয়সী পীরের মাজার শরীফ শিরক-বিদয়াত মুক্ত করা।

আর যাই হোক — হযরত ওয়সী পীরের মাজার শরীফ ১০০ বছর ব্যাপী শিরক বিদয়াত মুক্ত ছিল। আস্তে আস্তে এ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশী জনৈক বিদয়াতী বেশরা পীর নামধারীদের আমদানী করে ফলাও কাজ কারবার শুরু করে। সে কাজ কারবার পাকাপোক্ত ও সুযোগ সুবিধার জন্য আবার ৮/১০টি কবর ভেঙ্গে বায়তুল মোকাদ্দাসের মডেলে উক্ত মাজার শরীফ আরও দৃষ্টিনন্দন ও প্রকাণ্ড করার অপকৌশল অবলম্বনের জন্য অবৈধ ও বেআইনী নির্মান শুরু করে বিভ্রান্তি ও অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করে।

নূরীয়া ফতেহীয়া সিদ্দিকীয়া ফাউণ্ডেশন - ফুরফুরা শরীফ মৌখিক ভাবে যুক্তিতর্কে বাঁধা দেয়। তাতে তারা ঔধত্য প্রকাশ করে। মুসলিম শূন্য মানিকতলায় নিজেরা ঝগড়া ঝঞ্ঝাটে অন্যের ফায়দা লুটবার সুযোগ না দিয়ে ফুরফুরা শরীফের পরামর্শে ফাউণ্ডেশন আইনের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। সে সময় কিন্তু ওয়াকফ বোর্ড যথেষ্ট সহায়তা করে। নচেৎ হয়তো ততদিনে বিদয়াতী বেশরাদের আড্ডাখানায় পরিণত হতো। হযরত ওয়সী পীর হাক্কানী পীর। আর হকের হাফেয আল্লাহ। সর্ব উত্তম হিফাযত কারী-সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ।

আইনের চৌহদ্দির মধ্যে বোর্ডকে কাজ করতে হয় কিন্তু মানিকতলায় যে পরিস্থিতি তাতে অতি সহজে সমাধান হওয়ার নয়। বোর্ডকে বিশেষ ভূমিকা পালনে অতি তৎপর হতে হবে। বড় দেরী হয়ে যাচ্ছে। আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করে দ্রুত মোতাওয়াল্লী বা কমিটি মতোওয়াল্লী নিয়োগ করে পূর্ণ সরকারী সাহায্য ও সহানুভূতির মাধ্যমে মানিকতলার হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনা। কিম্বা ধান্দাবাজ, অকর্মণ্য মোতাওয়াল্লীদের নিয়োগ না করে বোর্ড সরকারী রিসিভার নিয়োগ করে প্রশাসনিক তৎপরতায় এবং শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সৃজনশীল ব্যক্তিদের

সহযোগিতায় দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়ে শক্ত হাতে বিশেষ প্ল্যান পরিকল্পনার মাধ্যমে মানিকতলায় হাজী রহিমবক্স ওয়াকফ স্টেট সংরক্ষণ কবা। *

আশু প্রয়োজন ঃ— মসজিদ পুণঃনির্মাণ, অজুখানা ও বাথরুম নির্মাণ, মোসাফিরখানা, সঙ্গে সঙ্গে কোরআনীয়া মাদ্রাসা ও দাতব্য চিকিৎসালয় করা।

কেবল সূফী ওয়সী রহমতুল্লাহ মাজার শরীফ সৌধ বানানো নয় বরং সমস্ত কবরস্থান হেফাযত করা। অবৈধ দখল মুক্ত ও পবিত্রতা বজার রাখার সুব্যবস্থা করা। বিউটিশিয়ানের ** নামের আড়ালে পার্ক বা প্রমোদউদ্যান করা কখনই সমুচীন হবে না বরং তাতে কবর বাসীরা কষ্ট পাবে এবং চরম নারাজ হবে। ওয়াকফ লিল্লাহর যথার্থতা ব্যর্থ হবে। জনগনের কাছে এবং পরকালে জওয়াব দেহিতার আওতায় পড়তে বাধ্য হবে।

আবার বলছি — এ কঠিন ও জটিল পরিস্থিতি থেকে হাজি রহিম বক্স ওয়াকফ ষ্টেট সংরক্ষণ বা হেফাযাত সম্ভব সরকারের স্বদ্বইচ্ছা ও ওয়াকফ বোর্ডের কার্য্যকারী ভূমিকা।

নূরীয়া-ফতেহীয়া-সিদ্দিকীয়া ফাউণ্ডেশন, ফুরফুরা শরীফ, মানিকতলার হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনার তাগিদে বর্তমানে হযরত ওয়সী পীরের মাজার শরীফ নিয়ে নতুন করে না ভেবে সামগ্রিক ভাবে সমস্ত গোরস্থানের হিফাযত আসু প্রয়োজন মনে করে।

---

* ২০০৭ সালের প্রস্তাব ২০১২ সালে কার্যকারী হলো

** এতদিন পর ওয়াকফ বোর্ডের ঘুম ভেঙেছে, ফাউণ্ডেশনের প্রস্তাব মেনে 'কমিটি মোতাওয়াল্লী' করেছে। ওয়সী মেমোরিয়াল এসোসিয়েশনের সেখ আহমদ আলী তৎকালীন বোর্ড চেয়ারম্যানকে দিয়ে

বিউটিশিয়ানের আড়ালে প্রমোদ-উদ্যান করার উদ্দেশ্যে মাটি ফেলেছিল, ফাউণ্ডেশনেব সেক্রেটারী এম, এ, রহমানী সাহেবের জোরালো প্রতিবাদে বন্ধ হয়ে যায়।

পর্য্যয়ক্রমে নিম্নোক্ত বিষয়ে নজর দিতে হবে ঃ-

১) মসজিদ আমূল সংস্কার করা

২) ওজু ও বাথরুম করা

৩) এমাম সাহেবের কামরা জবর দখল মুক্ত করা

৪) হযরত ওয়সী পীরের মাজার শরীফ শিরক বিদয়াত মুক্ত করা

৫) সমস্ত গোরস্থান হেফাজাত করা

৬) কোরআনীয়া মাদ্রাসা করা

৭) জবরদখল মুক্ত করা

৮) মোসাফির খানা করা

৯) লঙ্গর খানা খোলার চিন্তা করা

১০) দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করার চেষ্টা করা ইত্যাদি।

এ কর্মসূচী সামনে রেখে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে, যদি ওয়াকফ বোর্ড যৌথভাবে সক্রিয় দ্বায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালনে তৎপর হয়। ফাউণ্ডেশন সর্বতোভাবে অংশগ্রহণে রাজী থাকবে। নচেৎ ওয়াকফ বোর্ড ও সরকার সম্পূর্ণভাবে দেশ ও জাতির কাছে দায়ী থাকবে, যা ক্ষমার অযোগ্য।

আল্লাহপাক আমাদের সকলকে সুমতি দান করুন, হযরত ওয়সী পীরের অসিলায় সমস্ত কবরবাসীদের এবং মসজিদ হেফাযত করুন। খোদা হাফেয।

ফাল্লাহু খাইরুন হাফেযাঁও ওয়া হুয়া আর হামার রাহেমীন।

কবর সিজদাহ ও ফুলচাদর চড়ানো প্রসঙ্গ ঃ-

নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে দেখা যায়—চারি মজহাবের ঐক্যমতে আল্লাহছাড়া অন্য কাউকে সিজদাহ করা শিরক ও হারাম। উম্মতের জন্য—সর্বউত্তম নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ছেলেমেয়েদের জন্য—পিতা-মাতা, স্ত্রীর জন্য—স্বামী, সিজদাহ পাওয়ার সর্বাধিক অগ্রগণ্য। জীবিত অবস্থায় সিজদা লওয়া, কবরে সিজদা করা কোন মজহাবে জায়েয নেই।

যে পীর জীবিত অবস্থায় কোন মুরীদের সিজদাহ গ্রহণ করেননি, তার মাজারে সিজদাহ কেমন করে যায়েজ হয়? দুনিয়াতে কোন পীরের মাজারে সিজদাহ

করার প্রচলন ছিল না, তাদের ইন্তেকালের বহুপরে অযোগ্যতা, অশিক্ষা ও আর্থিক দুর্বলতার সুযোগে কতিপয় ধর্মব্যবসায়ী এগুলো আমদানী করেছে— অর্থ উপার্জনের লক্ষ্যে। আর ধর্মের নামে ব্যবসা অমার্জনীয় অপরাধ।

তদ্রুপ ১০০ শত বছর পর হযরত ওয়সী পীরের মাজারে অনুরূপ শিরক বিদয়াত শুরু হতে চলেছে, কতিপয় ধান্দাবাজ অশিক্ষিত অযোগ্য লোকের মদদে।

যদি কবর সিজদাহ এবং চাদর চড়ানো অত্যাধিক নেক ও মর্যাদার কাজ হতো, তা হলে হযরত ওয়সী রহমাতুল্লাহ তাঁর পীর সূফী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী রহমাতুল্লাহ এর মাজারে সিজদাহ ও ফুল চাদর চড়াতেন এবং মুরীদদের তালীম দিতেন। দিওয়ানে-ওয়সী গ্রন্থে দু কলম লিখে যেতেন। নিযামপুরী হুযুরের পীর সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহমাতুল্লাহ এর মাজারে, তাঁর পীর শাহ আবদুল আযীয মোহাদ্দেস দেহলবী রহমাতুল্লাহ এর মাজারে, তার পীর শাহ ওয়ালিউল্যাহ মুহাদ্দেস দেহলবী রহমাতুল্লাহ এর মাজারে, তাঁর পীর শাহ আবদুর রহিম মুহাদ্দিস দেহলবী রহমাতুল্লাহ এর মাজারে সিজদাহ করা ও ফুল চাদর চড়ানো প্রচলন যদি থাকতো তাহলে স্ব স্ব মুরীদদের তালীম দিতেন ও কেতাব পত্রে লিখতেন, বরং এর বিরুদ্ধে ফৎওয়া তাদের বই পুস্তকে লেখা আছে। ফতেহা পড়া, কবর যিয়ারত করা, সওয়াব রেসানী করা, যখন কেতাবে লেখা পাই তখন কবর সিজদাহর কায়দা কানুন, ফুল চাদর চড়ানোর দোয়াও দরূদ ও কায়দা কানুন তাদের লিখিত কোন কেতাবে পাই না। এমন কি হযরত খাজায়ে আজমেরী হযরত ও পীরানেপীর গওসুল আযম রহমাতুল্লাহ কোন কেতাবে সমর্থন পাওয়া যায় না; বরং বড় পীর রহঃ কঠিনভাবে নিষেধাজ্ঞার কথা লিখেছেন।

প্রশ্ন — তবু ও তাদের মাজারে উক্ত কাজ হচ্ছে? জওয়াব — ঠিক যেমন একশত বছর পর একদল হযরত ওয়সী পীরের মাজারে শুরু করার অপচেষ্টা করছে। হযরত ওয়সী পীরের পুত্র - কন্যা খলিফারা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল? না, শত বছর পরের এসব অখ্যাত-কুখ্যাত তথা কথিত ভক্তরা? বড় বড় মহাত্মন, ধর্মীয় মহাজন ব্যক্তিরা জান-মাল কোরবান করেছেন—তাদের দরদ বেশী? না, রুটি-বুটির ধান্দাবাজ লোকের? সকলে সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রেখে দৃঢ়

প্রতিরোধ না করলে অদূরভবিষ্যতে পরিণাম কি হবে খোদা জানে। তবে এজন্য 'সাহেবে-কবর' কখনই দায়ী থাকবে না। যারা এ শিরক, হারাম, নাজায়েজ বিদয়াতী কাজ চালু করবে তাবৎ কাল পর্য্যন্ত সমস্ত গোনাহ তাদের পাওনা হবে। কাজেই হুঁশিয়ার।

হযরত ওয়সী পীরের কোন খলিফা তদ্রুপ কোন বিদয়াতী মত পোষণ করেন না। কেবলমাত্র তাঁর মুরীদ দাবীদার ফরিদপুরের সুরেশ্বরের মৌঃ আহমদ আলী সাহেব ছাড়া। আর তিনি ও তার পুত্র সুরেশ্বরে শিরক বিদয়াত করলেও, হযরত ওয়সী পীরের মাজারে শিরক বিদয়াত শুরু করতে পারেন নি। যতদিন ফুরফুরা শরীফের পীর মুজাদ্দেদে-যামান রহমাতুল্লাহ দ্বায়িত্বে ছিলেন, অন্যান্য খলিফারা হায়াতে ছিলেন, অতঃপর বড় হুযুর ও মেজ হুযুর দ্বায়িত্বে ছিলেন। তাদের এজাযতে মাওলানা পীর জালালী রহমাতুল্লাহ তদ্বীয় জামাতা মাওঃ জয়নূল আবেদীন আখতারী রহমাতুল্লাহ যতদিন হায়াতে ছিলেন —ততদিন হযরত ওয়সী পীরের মাজারে কবর সিজদাহ, ফুল চাদর চড়ানোর কোনই প্রচলন ছিল না। আখতারী সাহেবের অযোগ্য সন্তান এবং অজ্ঞ কর্মকর্তা বিদয়াতী-সুরেশ্বরের বিদয়াতী পোতাকে আমদানী করে কবর সিজদাহ, ফুলচাদর চড়ানো, বাদ্য যন্ত্রসহ স্ত্রীলোকদের যোগদান করার অপচেষ্টা করছে; ফুরফুরা শরীফের পীর পোতারা তথা নূরীয়া ফতেহীয়া সিদ্দিকীয়া ফাউণ্ডেশন উক্ত শিরক বিদয়াত কার্যকলাপের তীব্র প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করছে এবং সিলসিলার সকল মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। ইনশা আল্লাহ আমরা হযরত ওয়সী পীরের মাজার শিরক বিদয়াত মুক্ত করবই, আল্লাহ আমাদের সহায়।*

ঐ সব ভণ্ড ধর্মব্যবসায়ী ঈমান হরণকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের থেকে হুশিয়ার থাকুন, গর্জে উঠুন।

সাধারণ জ্ঞানে কি বলে জনাব বায়জুল হোসেন সাহেবের অকাট্য যুক্তি-চাদর চড়ানো যদি সম্মান প্রদর্শনের ও মনোবাঞ্ছা পূরণের সর্বউত্তম পন্থা হয়।

---

* কমিটি মোতাওয়াল্লী হয়ে হযরত ওয়সী পীরের মাজার শরীফে ফুল-চাদর চড়ানো ও শিরক-বিদয়াত মুক্ত হয়েছে। ইনশাআল্লাহ—রহমানী।

তা হলে ওয়সী ভক্ত হাজারে হাজার লোক যদি কবরে চাদর চড়াতে থাকে, তা হলে ঐ হাজার হাজার চাদর কি হবে? কবরে তো চাদরের জায়গা হবে না। আর চাদর গুলোয় উই পোকা (ডেমক) লাগবে, ঢাঁই হয়ে নোংরা আবর্জনার স্তুপ হবে। পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর হবে। যা বাঞ্ছনীয় নয়। তাহলে ঐ চাদর গুলো তুলে নিতে হবে, তখন চাদর দেওয়া ব্যক্তির মনে কি প্রভাব পড়বে? মনবাঞ্ছা পূরণের আগে কি বুঝে আপনি চাদর তুলে নিবেন? হুযুরের গায়ে কার দেওয়া চাদর থাকবে? সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ও অন্যান্যদের তখন চিন্তা হবে? নানান অবাঞ্ছিত প্রশ্ন দেখা দেবে, যার সদুত্তর বিদয়াতীদের জানা নেই। আসলে এ সব কিছু না বন্ধু! কতিপয় ধর্ম ব্যবসায়ীদের ধান্দাপানির ব্যাপার নয় কি? মহান অলি-উল্লাহরা কবরে বেহেস্তী পরিচ্ছদ, বেহেস্তী খুশবুর অধিকারী, তাদের গায়ে দুনিয়ার হারাম-হালাল, পাক-না পাক মিশ্রিত বস্ত্র দেওয়া কত খানি আহম্মকি কাজ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে কি?

আবার বলছি - ধর্মব্যবসায়ীদের কৌশল, তোমরা চাদর দাও আমরা তুলে এনে অন্যের কাছে বিক্রি করি। আবার দাও অমুক নিয়তে, আবার দাও তমুক নিয়তে, আমরা তুলে এনে বিক্রি করি, একই চাদর ২০/৫০ বার বিক্রি করি, বিনা পুঁজির এর থেকে বড় ধান্দা-পানি ব্যবসা আর কি হতে পারে? কথায় বলে "মোর্দ্দা জান্নাতমে ইয়া দোযখমে যায়ে তু হামারা কিয়্যা; হামারে লিয়ে হালুয়া-রুটি।" কাজেই এ্যাসোসিয়েশন থেকে অধিক সতর্ক হোন। ঈমান সালামতের খাতিরে দৃঢ়তার প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। হযরত ওয়সী পীর তথা সকল অলি-আল্লাহ বান্দার মাজার শরীফ শিরক বিদয়াত মুক্ত করুন। ইয়া আল্লাহ। ইয়া হাফিযু, ইয়া-আরহামার রাহেমীন। বেরহমাতিকা আস্তাগিসু। ওয়া সল্লাল্লাহু তায়ালা আলা খাইরে খালকিহী অ-আলিহী অসাহ্বীহি, অআহলে বায়তেহী অআউলিয়ায়ে উম্মাতিহী আজমাঈন।

পরিশিষ্ট- ১

আমাদের হস্তগত হয়েছে হযরত শাহ সূফী সাইয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়সী রহমাতুল্লাহ এর বংশ পরিচয় সম্বলিত—

মোহাম্মদ শাহ গাজী বাদশাহের সনদ

এই শাজরার প্রথম অংশ বিভিন্ন নতুন ও পুরাতন শাজারা থেকে নেওয়া হয়েছে। যাহা শাহ আলম বাহাদুর শাহ হাছান কলিখান এবং নানু মন্দ এর সময়কার সনদ থেকে নেওয়া হয়েছে। লেখক সৈয়দ মুফজজলুর রহমান ৬/৪/১৩০৬ হিঃ লিখিত। সৈয়দ নূরূল কবির (৭৭) এর জ্যেষ্ঠ পুত্র সৈয়দ মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আমিরাবাদ সৈয়দপুরী লোহাগাড়া, ১৫ নভেম্বর ২০০৯। আরবী ও ফারসী ভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন- মাওলানা আবুল হোছাইন আরমান সিনিয়র শিক্ষক জামেয়াতুল আনওয়ার হেমায়তুল ইসলাম, পদুয়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম। তাং-১৬/১০/২০১০, ইং- ৭/১১/৪১৩১ হিজরী। মোবা-০১১৯৫-০৪৪০১৪

"এতএব আমি বলিতেছি যে, সাইয়েদ আলহাজ্জ্ব মুত্তাকী হাকীম উল্লাহ বিন সাইয়্যেদ আতুফাতুল্লাহ বিন সাইয়েদ নূরুল্লাহ বিন সাইয়েদ হিদায়েতউল্লাহ বিন সাইয়েদ তৈয়ব উল্লাহ বিন সাইয়েদ আলী বিন সাইয়েদ ইছহাক বিন সাইয়েদ মৌলভী আবদুল গনি (যিনি দুদামীর হিসেবে প্রসিদ্ধ) বিন সাইয়্যেদ শাহ নেয়ামত উল্লাহ বিন সাইয়্যেদ শাহ খোদাবকশ আল ইসলাম আবাদী বিন সাইয়্যেদ ছোটমীর আস্সীরাজী বিন সাইয়্যেদ শাহ মীর আসসীরাজী যার বংশানুক্রমে কয়েক পিস্থানে রাসুলুল্লাহ পর্য্যন্ত পৌঁছেছে।

আমরা বিশেষভাবে নিরক্ষণ করলাম যে, যে সময়ে অনেকের নাম স্বাক্ষর ও সিলমোহর আছে সকলে আমিরাবাদ, সাতকানিয়া উল্লেখ করেছেন। কেহই মল্লিক ছায়াং বা মল্লিক সোবহান ফকির বাড়ী মল্লিক ছোয়াদী উল্লেখ করেন নাই। যদি কেউ আমিরাবাদ সাইয়্যেদ বাড়ীকেই মল্লিকসোবহান ফকিরবাড়ী মনে করেন তাতে আমাদের আর আপত্তির কিবা থাকতে পারে। গবেষকরা সাতকানিয়ার আমিরাবাদ সৈয়দ বাড়ী বা সাইয়্যেদ মহল্লা অনুস্বরণে অগ্রগামী হলেই সঠিক তত্ত্ব ও তথ্য সম্ভব। ইনশাআল্লাহ।

আর আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি হযরত ওয়সী রহমাতুল্লাহ শৈশবেই ৮/১০ বছর বয়সে পিতা-মাতা হারা হয়েছিলেন। বিধায় তিনিও সঠিকভাবে বিস্তারিত বলতে পারেননি। শৈশবে ১৮-২০ বছর বয়সে পিতা-মাতা ও দেশ পেলে তিনি নিশ্চয় বিস্তারিত বলতে পারতেন। কাজে কাজেই আমরা তাঁর জন্ম সন-২৪/২৫সাল ধরে নিতে পারি, তা কখনই ১৫/১৬ সাল নয়।*

খাকসার রহমানী

হযরত সূফী নিজামপুরী, সূফী ওয়সী রহমাতুল্লাহ ছিলেন শরিয়তের ধারক ও বাহক

প্রসঙ্গত ঃ উল্লেখ করতে চাই যে, হযত সূফী ওয়সী রহমাতুল্লাহ হযরত সূফী নিযামপুরী রহমাতুল্লাহ প্রমুখ উর্দ্ধতম পীরদের আদর্শের ধারা বাহিকতার নমুনা বিদ্যমান, কুরআন, হাদীস, ইজমা কিয়াসের মাফকাটিতে নীতি নির্দ্ধরণের উসুলিকায়দাকে সিলসিলা নামে পরিচিত। হাক্কানী রব্বানী পীর ও বাতীল বেশরা, বিদয়াতীদের তাৎপর্য্য নির্ণয় হয়।

বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানাজন ভর্ত্তি হয়, সবাই কি পাশ করে? পাশ করা ছাত্ররা দেশ ও দশের মুখ উজ্জ্বল করে, তাদের মধ্যে কেউ ঘুষখোর জ্বিনাখোর নেশাখোর হয় সে জন্য প্রতিষ্ঠান দায়ী নয়। তেমনী ফেল মার্কা ছাত্রদের কি রেকর্ড থাকে?

সুফী নিযামপুরী, সুফী ওয়সী পীর কিবলাদের জীবন চরিতে সীরাতে-সুরাতে শুদ্ধতার স্পষ্ট ছাপপাই, কোন রকম ধোয়াসা নেই।

বিজ্ঞ সুধী সমাজ অনুধাবন করুন পীর বুযর্গগণ সমাজের অনাচার ভ্রষ্টচার কুসংস্কার শিরক বিদয়াত উৎপাটনের জন্য প্রণিপাত করেছেন, তাদের অবদান অনস্বীকার্য্য। চারিত্র মাধুর্য্যে মানুষ মোহিত।

কবর সিজদা, পীর সিজদা, জিকরের নামে নর্দ্দন কুর্দ্দন, গীত-বাদ্য, অতি উচ্চস্বরে নারীপুরুষের মিলিত হয়ে বাদ্যযন্ত্র সহ যিকির করা, কোন হাক্কানী রব্বানী পীরের নমুনা নয়।

---

* ঘুরপথে বা দ্বিতীয় পন্থায় যারা গবেষণা করেছেন, তাদের উর্বর মস্তৃষ্কের কারসাজী প্রসুত উদ্ভাবন জন্ম সনের ন্যায় জন্মস্থান নির্ণয়ের কুফল।—রহমানী।

বেপর্দ্দা বিহারিণী মেয়েদের পীরের দরবারে একত্রে বসা। মেয়েদের হাত ধরে মুরীদ করা। আঙ্গুলি দিয়ে তাদের কলবের স্থান দেখিয়ে দেওয়া। পীরের কবরের মাটি নিয়ে নকল কবর বা মাজার করা এবং প্রদক্ষিণ করা (তাওয়াফ) বিধি বিধানগুলো শরিয়তে ইসলামে নিষিদ্ধ। এমন কি সূফী নিযামপুরী, সুফী ওয়সী রহমাতুল্লাহ এর সিলসিলায় স্বীকৃত নয়।

এসব শরিয়ত বহির্ভূত শিরক বিদয়াতী কারবারীদের কোন মতে সূফী নিযামপুরী ও সূফী ওয়সী পীরের মুরীদ বা খলীফার দাবী সর্বতোভাবে অবান্তর।

অনেকে পীরের জীবন তথ্যে বিভ্রান্তিকর ভুয়া, অসত্য কাল্পনিক ঘটনাবলী আমদানী করে সমাজকে বিভ্রান্ত ও ইসলামকে নিন্দনীয় করেছে। সময় করে পুস্তকের শেষে পরিশিষ্ট দেখার নিবেদন রাখছি।

হযরত ওয়সী পীর রহমাতুল্লাহ জীবন আলখ্যে বিভ্রান্তিকর ও অতিরঞ্জিত এবং অসত্য তথ্য আমপাবলিকের কাছে পরিবেশন করার মধ্যে গভীর চক্রান্ত থাকা অসম্ভব নয়।

এরা সুকৌশলে সিলসিলায়ে ফুরফুরা শরীফের মতাদর্শে' তথা কোরআন হাদীস শরীফের মাফকাটিতে নির্দ্ধারিত প্রচলিত বিধি বিধানগুলো চাতুরতার সাথে বর্জন করছে এবং বেদাতী বেশরা রীতি নীতির প্রচার প্রপাগণ্ডায় অত্যাধিক প্রাধান্য দিচ্ছে।

'শানে ওয়াসী লেখক জনাব চৌধুরী সাহেবের পীর সাহেব আজমগড়ের প্রখ্যাত শরিয়ত পন্থীপীরের খলীফা চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ মোহাক্কেক পীর হযরত মাওলানা আব্দুল মজিদ রহমাতুল্লাহ। তাঁর মাজার শরীফ জিয়ারত করেছি পদুয়ায় স্থাপিত সূফী ফতেহ আলী ওয়সী মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাতা জনাব হযরত মাওলানা শামসুদ্দীন সাহেবের সাথে। তথায় ঐ সব শিরক বিদয়াত নেই। অথচ শানে ওয়সী গ্রন্থে "হযরত ওয়সী পীরের নকল কবর সুরেশ্বরীতে" আছে উল্লেখ করেছেন। বেশরা কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে নীরব।

হযরত ওয়সী পীরের মাযার শরীফে শত বছর পর উক্ত বিদয়াতী দলেরা শিরক বিদয়াত আমদানী করার অপপ্রয়াস চালিয়েছিল, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ফুরফুরার সিলসিলার নূরীয়া ফতেহীয়া সিদ্দিকীয়ী ফাউণ্ডেশনেব ধর্মপ্রাণ মানুষ তা প্রতিহত করেছে।

এরা বলে থাকেন- আজমীর শরীফের কথা। আজমীর শরীফ, বাগদাদ শরীফ, শরিয়তের দলিল নয়। শরীয়তের দলিল কোরআন হাদীস, এজমাও সহি কিয়াস। তথাকার পীরেরা আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়।

চিশতীয়া তরীকার পীরানপীর সুলতানুল হিন্দ, খাজায়ে খাজেগান, গরীবে নওয়াজ হযরত খাজা মঈনুদ্দীন হাসান চিশতী রহমাতুল্লাহ কে সরওয়ারে কায়েনাত মোফাখখায়ে মৌজুদাত, শাফিয়ে মাহশর নূরে মোজাচ্ছাম হযরত আঁকা মাওলা মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনা মনোওরায় জিয়ারতের সময় খাজা সাহেব হুযুরকে হিন্দুস্থানে গমনের নির্দেশ দেন। হিন্দুস্থান কোথায় কোন্ দিকে খাজা সাহেব জ্ঞাত ছিলেন না। সে সময় হযরত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি অপেল ফল ম্যাপ বা গোলার্ধ হিসাবে তুলে ধরে চিহ্নিত করে তাঁকে বিদায় দিয়েছিলেন।

হিন্দুস্থানে তখন অরাজগতা অনাচার উৎপীড়ন ও শিরক কুফরে নিমর্জিত ছিল, খাজা সাহেব হুযুর নবীপাকের নির্দ্দেশ মত এসে রাজস্থানের আজমীরে কায়েম হন। মূলতঃ তাঁর জিহাদ ছিল শিরক বিদয়াতের বিরুদ্ধে, অসত্যের ও অনাচারের বিরুদ্ধে। আজমীর শরীফে হযরত খাজা সাহেবের মাজার শরীফে প্রথমে কয়েক শত বছর কোনরূপ শিরক বিদয়াতের লেশমাত্র ছিল না। বর্তমান শতাব্দীতে শিরক বিদয়াতের বাড়বাড়ন্ত দেখা দিয়েছে। আজমীর শরীফে বর্তমানে এখনও একদল খাদেম আছেন,* তারা ঐসব অবৈধ রীতির বিরোধী। ফুরফুরা শরীফের পীর কেবলা প্রায় সাত শত মুরীদ মোতাকেদ নিয়ে আজমীর শরীফ জিয়ারতে গিয়েছিলেন। খাদেমদেরকে মোরাকাবায় বসিয়ে খাজা সাহেবের সাথে জিয়ারতে কথা বলিয়ে দিলেন। —সীরাতে রুহুল আমিন দ্রষ্টব্য।

এ সফরে পীর কেবলার সাথী আল্লামা রুহল আমীন, আল্লামা ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ ব্যক্তিরা ছিলেন।

আমার মহামান্য উস্তাদ হযরত মাওলানা বজলুর রহমান দরগাহপুরী (খুলনা আশাশুনী থানার একটি গ্রাম) সাহেব বলেন একটি মসলার নিগূঢ় বুঝতে ত্রিশ বছর লেগেছে।

*

আজমীর শরীফের অন্যতম খাদেম পীরজাদা গোলাম দস্তগীর সাহেব ফুরফুরা শরীফের হযরত পীর কিবলাকে অত্যান্ত সম্মান প্রদর্শন করেন। জনাব দস্তগীর সাহেব চলন্ত কম্পিউটার। তাঁর সাথে আলোচনা করে দেখেছি শত বছরের ইতিহাস যেন তাঁর নখদর্পণে—রহমানী।

'কবর জিয়ারতের সময় হাত তুলে মোনাজাত করা সম্বন্ধে একদল এতরাজ করেন কেন ? ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে জায়েজ, অথচ একদল নিষেধ করেন। তারা বলেন হাত তুলে মোনাজাত যদি করতে হয় তো পশ্চিমদিকে ফিরেই করুন।

একবার আমরা জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের বার্ষিক অধিবেশন সুরাট গমন করি। বাংলার প্রতিনিধি দলে প্রায় তিরিশজন ছিলাম। আমরা দিল্লীতে দুদিন অবস্থান করে জিয়ারত করতে থাকি। একদিন হযরত কাকী রহমাতুল্লাহ এর মাজার জিয়ারত করে হাত তুলে মোনাজাত করি। যখন আমরা ফিরে আসছি সে সময় জনৈক খাদেম সাহেব আমাদেরকে দেখিয়ে সমাগত লোকদের জোরে জোরে বলছেন, "দেখুন বাংলা থেকে কত বড় বড় আলেম ও বুযগ জিয়ারতে এলেন। তারা হাত তুলে হুযুরের কাছে চাইলো। তোমরা ও চাও। হুযুরের কাছে চাও। (মাংগো হুযুর সে মাংগো)।"

আমরা তো হুযুরের কাছে চাইনি। চেয়েছি মহান মালিক আল্লাহপাকের শাহী দরবারে। খাদেমরা আম পাবলিককে ভ্রান্ত করছেন। সে দিন অনুধাবন করলাম কবরের দিকে হাত তুলে মোনাজাত করতে একদল উলামারা কেন মানা করেন। শিরক এমনি এক খাতারনাক বিষয় যে, শরীয়তে ইসলাম চুল পরিমাণ সন্দেহ থাকলেই সে সব বিষয় থেকে বিরত থাকা উচিৎ।

আল্লামা দরগাহপুরী রহমাতুল্লাহ পাকা মসজিদ নির্মাণ প্রসঙ্গে বলতেন- ইটের গাথানীর ফাঁকে কিছু চেলা, কালাস সাপ থাকতে পারে, সাবধান অর্থাৎ সুদ, ঘুষের হারাম টাকা থাকতে পারে। তদ্রূপ 'কবর' যখন 'পাকা মাজার' হয় তখনই শিরক বিদ্‌য়াত আমদানী হতে পারে অতএব সাবধান।

ইতিহাস পর্যালোচনা করতে দেখা যায় এসব বিদয়াতী বেশরা কার্য্যক্রম বিশেষ করে মাজার মকবরা কেন্দ্রিক কার্যকলাপ। কোন সুফী, দরবেশ ও অলিউল্লাহগণ ছিলেন উল্লেখিত শিরক বিদয়াতের মূল উচ্ছেদকারী শরিয়তের ধারক ও বাহক মহান নেতারা। তাঁরা তাদের জীবনে কত শত দরগাহ, থান, মেলায় শরিয়ত বিরোধী কার্য্যকলাপ বন্ধ ও বিনিষ্ট করেছেন,

তার ইয়াত্তা নেই। তাদের ইন্তেকালে তাদের কবরে বা মাজারে শতাধিক বছরের বেশী সময় যাবত শিরক বিদ্‌য়াত হয়নি। খন্দানে শরিয়তি ইলমের ঘাটতি, ইসলামী তাহ্‌জীব তামাদ্দুন সম্বন্ধে নাওয়াকেফ বা অবজ্ঞা অভক্তি, মালী হালাতের দুর্বলতা, চাটুকার, পার্শ্বচরদের প্রলভনে বিনা পুজিতে দরগা ও মাজার ব্যবসায় পরিণত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে এমন বিদয়াতী বেশরা দরগা ও কবর পুজারী বিদয়াতী পীরের অনেকগুলো আস্তানা পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ, হযরত সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী রহমাতুল্লাহ এর সার্থক উত্তরাধিকারী মহান খলীফা হযরত সূফী সাইয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়সী রহমাতুল্লাহ এর অন্যতম প্রধান খলীফা মোজাদ্দেদে যামান পীর আবু বকর সিদ্দিকী ফুরফুরাবী রহমাতুল্লাহ ছিলেন একই সূত্রে গ্রথীত মাহন বুযর্গ ও পীর। তাঁরা ছিলেন ভারতে হাদীস শাস্ত্রের পথিকৃত হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলবী রহমাতুল্লাহ। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগের বদৌলতে তিলে তিলে গড়া আদর্শ ও নীতি নিষ্ঠাকে কালিমালিপ্ত করার অপচেষ্টা করে চলেছে তথাকথিত পীর পূজক ও দরগা-কবর পূজকদের কতিপায়। ইতিপূর্বে চট্টগ্রাম জেলার কতিপয় এক্ষণে ফরিদপুর জেলার কতিপয় বেদাতী পীরের উপর বাংলার সচেতন মুসলিম সুধী সমাজকে এ বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি আকর্শন করছি।

বহুল প্রচলিত আছে—"অর্থ, অনর্থের মূল' মহাগ্রন্থ আলকোরআনে বর্ণিত আছে—'সহায় সম্পদ ও সন্তান সন্ততি তোমাদের জন্য ফিৎনা।"

"একই রাস্তা দিয়ে বাহির হয়—মুত ও পুত।
সুসন্তান হলে পুত, নচেৎ সেতো মুত।"

কোরআন পাকের অন্যতম বচনে আছে "বিষয় সম্পদ ও সন্তান সন্ততি তোমাদের সৌন্দর্য্য।

মহা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- "মানুষ মারা যাওয়ার পর তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়। কেবলমাত্র তিনটি আমল ছাড়া। সাদকায়ে জারিয়া। ঔপকারী ইলম এবং সুসন্তান।

আপনার রেখে যাওয়া সহায় সম্পদ যদি আপনার কুপুত্র সদ্ব্যবহার না

করে অসৎ কাজে ব্যায় করে কুপথগামী হয়, ইহকালে সম্মানহানী পরকালে কঠিন থেকে কঠিনতম আজাবের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনার রেখে যাওয়া সহায় সম্পদ যদি আপনার সুপুত্র অসদ্ব্যবহার না করে সৎপথে ব্যয় করে এবং সুপথ গামী হয়, তাহলে ইহকালে সম্মানী পরকালে পরমপুরস্কার মৌজুদ আছে।

এমন সন্তান যদি পিতামাতার জন্য মঙ্গল কামনা করে মহান আল্লাহ্ দয়া পরবতহয়ে আপনার কৃত কর্মের তালিকায় নেকী লেখা হবে। পক্ষান্তরে সন্তান যদি কুপথগামী হয় উদাসীন কৃতকার্য্যের তালিকায় পৌছাবেনা নেকী। বঞ্চিত হবে নেকী থেকে। আগুন না লাগলেও আগুনের আচতো লাগবে।

একই পথে নিষ্কাশন হয় মুত (পেসাব) ও পুত (পুত্র), সুপুত্র ও কুপুত্রের নমুনা বা তুলনা।

ক্কোরআন ও হাদীস শরীফের জ্ঞান না থাকলে, হক না হক, ভালো মন্দ জায়েজ নাজায়েজ হারাম হালাল পার্থক্য করা যায় না। অধিকাংশ পীরি খান্দানে পরিপক্ক আলেমের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। যে সব খান্দানে শরীয়তের ইলমের চর্চ্চা বা জারি আছে তথায় এখনও শিরক বিদয়াত স্পর্শ করতে পারেনি।

বহিরবঙ্গের একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরি- পাঞ্জাবের সিরহিন্দ বা সারহান্দ শরীফে যারা ৫০—৬০ বছর আগে গেছেন তারা আমার কথার সাক্ষ্য দেবেন, হযরত মোজাদ্দেদ আলফে সানী রহমাতুল্লাহ এর মাজার শরীফ, হযরত মাসুম রব্বানী রহমাতুল্লাহ প্রমুখ বুযর্গদের মাজারে শিরকের নাম গন্ধ পাওয়া যেত না। যতদিন হুযুরের আওলাদ হযরত মাওলানা এহইয়া মুজাদ্দেদী রহমাতুল্লাহ জীবিত ছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর ২০১২ সালে হযরতের মাজার শরীফে বিদয়াতের আমদানী হতে দেখলাম। বর্তমান সাজ্জাদানশীন সাহেবকে সবিস্তারে বললাম, তিনিও উপলব্ধি করেছেন এবং বললেন- আগামীতে যথাবিহীত ব্যবস্থা নিবেন। বিদয়াতী আমদানী কারক বাংলাদেশের একটি জেলার বিশেষ স্থানের বিদয়াতীরা। ভাবতে দুঃখ লাগে সারা জীবন যারা শিরক-বিদয়াতের মূল উৎপাটনে জীবনাপাত করলেন সে সব পীর বুযর্গদের মাজার শরীফে কেন? নিজ বাপ দাদার কবরে কি করবে না করবে সে তাদের ব্যাপার। আল্লাহপাক তাদের সুমতি আতা করুন।

পরিশিষ্ট-২

মোজাদ্দেদ সাহেব প্রসঙ্গে অপবাদ খণ্ডণ

আজ থেকে ৮৫/৯০ বছর আগের কথা। পাক-ভারতের অদ্বিতীয় পীর ও মুর্শিদ মোযাহেদে আযম, মোজাদ্দেদ হযরত সৈয়দ আহমাদ বেরেলী শহীদ রহমাতুল্লাহ সম্বন্ধে রংপুরের মৌলভী শেহাবুদ্দীন সাহেব তাহকিকাতে শেহাবিয়া নামে কেতাব লিখে মুসলিম জন মানসে অপপ্রচার করেছিল সে সময় ফুরফুরা শরীফের আলা হযরত মোজাদ্দেদে যামান পীর আবু বকর সিদ্দিকী রহমাতুল্লাহির অন্যতম বিশিষ্ট খলিফা ফকিহ, মোহাদ্দেস, আল্লামা পীর মাওলানা রূহল আমীন রহমাতুল্লাহ তার দাঁত ভাঙ্গা জওয়াবে 'রদ্দে-হাফায়াতে শেহাবিয়া' (রদ্দে বেদয়াত ৪র্থ ভাগ) কিতাব প্রকাশ (১৩৩৭ সন) করেন এবং কারামতে আহমদীয়া লেখেন। অদ্যবধি মৌলভী শেহাবুদ্দীন প্রমুখেরা টুশব্দটি আর করেননি।

ইদানিং কতিপয় ব্যক্তি 'মোজাদ্দেদ' সৈয়দ আহমদ শহীদ রহমাতুল্লাহ সম্বন্ধে অতি নিম্নমানের পরিচয় দিয়ে মুসলিম জন মানসে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপকৌশলে লিপ্ত হচ্ছে।

"তিনি 'নিরক্ষর' 'যোদ্ধা' ছিলেন, তার কাছে মানুষ জিহাদের বয়অত গ্রহণ করেছিল প্রভৃতি। তারা মনে করেন, হাজীউল হারামাঈন হযরত মাওলানা শাহ সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী রহমাতুল্লাহ-এর পীর ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন যুদ্ধের সহচর বা সেনানী। তিনি হযরত সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলভী রহমাতুল্লাহ এর খলিফা ছিলেন না। বেরেলভী রহমাতুল্লাহ পীরের উপযুক্ত ছিলেন না, তিনি ছিলেন মুর্খ।"

গত ২০১৬ সালের ২৮শে অক্টোবর (১৩ই কার্ত্তিক ১৪২৩) নিজামপুর হযরত শাহ সুফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী রহমাতুল্লাহএর বার্ষিক মাহফিলে হযরতের মাজার সংলগ্ন মসজিদে বাদ জুম্‌আ অনুষ্ঠান শুরুতে সভা পরিচালক সুফীয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা যিনি ফুরফুরা শরীফের পীর, মোজাদ্দেদে যামান রহমাতুল্লাহ

এর বিশিষ্ট খলিফা। প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা আব্দুল গণি রহমাতুল্লাহ এর পৌত্র মাহফিল পরিচালক (মাওলানা রেজাউল করিম সাহেব) সরাসরি ঘোষণা করেন, "সূফী নূর মহাম্মদ নিজামপুরী হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলী রহমাতুল্লাহ খলীফা ছিলেন না। তাঁর কাছে জেহাদের বয়অত নিয়েছিলেন। তিনি নিরক্ষর ছিলেন ইত্যাদি।" সঙ্গে সঙ্গে সভায় গুঞ্জন শুরু হয়ে যায়। এমনকি প্রতিবাদ ওঠে। মাগুরার কাজলা নিবাসী জনাব গোলাম রসুল সাহেব তীব্র প্রতিবাদ করেন। সভা পরিচালকের ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ কল্পে আমি রহমানী মসজিদের ভিতর প্রবেশ করি। ইতি মধ্যে ২।১ জন মৃদু প্রতিবাদ করেছেন। অন্যান্য বছরের ন্যায় ঐ সময় আমাকে আর বলার জন্য সময় দিলেন না। সে সময় আমি বলেছিলাম। যখন আজ কিছু বলার সুযোগ দিলেন না, খোদা চাহে তো আগামী মাহফিলে বই আকারে ইনশাআল্লাহ্ জওয়াব দেশবাসীদের খেদমতে পেশ করব। আল্লাহ পাকের শাহী দরবারে লাখো (শুকরিয়া) যে, সংক্ষেপ আকারে হলেও সুফী হযরত ওয়সী রহমাতুল্লাহ এর পীর ও মুর্শিদ হযরত শাহ সুফী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী রহমাতুল্লাহ এর পীর হযরত সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহমাতুল্লাহ এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট আলোচনা করলাম। আফসোস 'ঘর মে আগ লাগগ্যায়ী আপনা চেরাগ ছে।"

বঙ্গের হাদী, হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী রহমাতুল্লাহ সাহেব 'মোকাশফাতে-রহমত' কেতাবের ২৫/২৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—

"এই সময় সুন্নত জারি করিতে ও বেদয়াত লোপ করিতে সময়ের উপযোগিতা ইহা হচ্ছে যে, হযরত সৈয়দ আহমদ (কোঃ) এর তরিকায় দাখিল হয়। কেননা উক্ত জনাব সাইয়্যেদ সাহেব উচ্চ বংশধর হানাফী মজহাবালম্বী মোজাহেদ, শহীদ, আলেমে রাব্বানী। এই জামানার মোজাদ্দেদ ও অতি সাহেবে তাছির। তাঁর হাদিস, তফসির ও তরিকতের সিলসিলা সাইয়্যেদোল ওলামা, সনদোল আওলিয়া হুজ্জাতোল্লাহিল আলাল-আলামিন, ওয়ারেসোল আম্বিয়ায়েল মোরসালীন, হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল আযীয মোহাদ্দেস দেহলবী (কোঃ) এর সহিত মিলিত হয়। আর এই সিলসিলা অতি প্রসিদ্ধও বিশ্বাসযোগ্য। এই দেশের সমস্ত মোহাদ্দেস ও মোফাচ্ছেরের সিলসিলা তাঁর

সাথে মিলিত হয় আর প্রশংসিত মোহাদ্দেস হযরত সাইয়্যেদ আহমাদ সাহেবকে নিজের সমস্ত জাহেরী ও বাতেনী নিয়ামত দান করে তাঁকে নিজের খাস খলিফা করেছিলেন। আরও সাধারণ লোকদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে, সাইয়্যেদ সাহেব ইলম জানতেন না, ইহা ভ্রান্তিমূলক কথা। এর মূল বৃত্তান্ত এই যে, সাইয়্যেদ সাহেব নিজ মোর্শেদ প্রশংসিত মোহাদ্দেস সাহেবের মাদ্রাসায় জাহেরী ইলম শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে ছিলেন, এক দিবস উক্ত মোহাদ্দেস সাহেব হযরত সাইয়্যেদ সাহেবের ইলমে-লাদুন্নির যোগত্য দর্শন করে তাঁকে কেতাব পড়া বন্ধ করে দিলেন এবং বাতেনী ইলম্ শিক্ষা দিতে মনোনিবেশ করিলেন। ইহা প্রশংসিত হযরতের শিক্ষা প্রদানের বরকতে উল্লিখিত হযরত মোজাদ্দেদ সাহেব অবশিষ্ট সমস্ত জাহেরী ইলম শিক্ষা প্রাপ্ত হন।"

রদ্দে হাফাওয়াতে সেহারিয়া বা রদ্দে-বেদয়াত ৪।১১২-১১৩ পৃষ্ঠা।

সওয়ানেহে আহমদীর ৮ পৃষ্ঠায় আছে—

তিনি সাইয়্যেদ (আহমদ বেরেলভী সাহেব) কোরআন ও হাদিসের অর্থ বুঝার উদ্দেশ্যে কিছু নাহু সরফ শিক্ষা করলেন এবং মেসবাহ কেতাব পর্যন্ত তিনি অধ্যায়ণ করেছিলেন, এক রাতে যখন তিনি উক্ত কেতাব পড়তেছিলেন, উহার একটি অক্ষরও দৃষ্টিগোচর হতে ছিল না। কেবল কেতাবের কাল পৃষ্ঠা দৃষ্টিগোচর হতে ছিল। তখন তিনি ধারণা করলেন যে দর্শন শক্তির হ্রাস হওয়া সংক্রান্ত কোন পীড়া সৃষ্টি হয়েছে। তখন তিনি প্রভাতে মাওলানা শাহ আবদুল আযীয সাহেবের খেদমতে এ সমস্ত ব্যাপার বর্ণনা করলেন। তখন তিনি সাইয়্যেদ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, কেবল কেতাব এরূপ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, কিম্বা সমস্ত বস্তু এরূপ অনুভূত হচ্ছে? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, কেবল কেতাব সম্বন্ধে এরূপ অবস্থা হচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য সমস্ত বস্তু যেরূপ আছে সেরূপ দৃষ্টিগোচর হয়। তখন মাওলানা বললেন, কেতাব রেখে দাও, খোদাতায়ালা তোমাকে অন্যান্য কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এক্ষণে তোমার লেখাপড়ার আবশ্যক নেই। খোদাতায়ালা নিজেই কোন জাহেরী শিক্ষকের শিক্ষা প্রদান ব্যতীত তোমাকে সমস্ত ইলম ও হিকমত শিক্ষা প্রদান করবেন। তিনি সমস্ত লোকেব পূর্ব্বে কোরআন মজিদের উর্দ্দু তরজমা শিক্ষা করেছিলেন,

তিনি আদর্শ স্বরূপ তোতা পাখীর ন্যায় কোরআন মজিদ পড়া যেরূপ হিন্দুস্থানে প্রচলিত আছে। (তাহা) ছাড়াতে চাইয়াছিলেন।

''তাওয়ারিখে আজিবা কেতাবের ৮ পৃষ্ঠায় অনুরূপ বর্ণনা আছে।

ইতিহাসে এ সাক্ষ্যই হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী সাহেবের কথার অনুমোদন করছে। এতৎ সত্ত্বেও হযরত সাইয়্যেদ আহমদ সাহেবকে নিরক্ষর বলা হিংসার প্রমান নয় কি?

এরূপ ঘটনার প্রমাণ পীরগণের জীবনী চরিতে বিরল নহে। মোল্লা হোসাইন কাশেফী 'রশহত কেতাবের ২২৮।২২৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন— ''হযরত ওবায়দুল্লাহ আহরার ২২ বছর বয়সে উপনীত হলে, তাঁর মামু খাজা ইব্রাহিম তাঁকে তাশকান্দ হতে সামারকান্দে ইলম শিক্ষা প্রদানের জন্য নিয়ে যান, কিন্তু শোগলে বাতেনীর প্রবণতা তাঁকে জাহেরী ইলম শিক্ষার প্রতিবন্ধক হয়েছিল, এই হেতু পীরগণের সঙ্গ ও সাক্ষাৎ লাভে আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন।

আরও ২৩২।২৩৩ পৃষ্ঠা—

''হযরত পীর ওবায়দুল্লাহ বলেন, আমার মামু খাজা ইব্রাহিম ইলম শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমাকে তাশকান্দ থেকে সামারকান্দে নিয়ে গিয়েছিলেন, এবং বহু চেষ্টা চরিত্র করলেন। কিন্তু যতবার আমি ইলম শিক্ষাতে মনোনিবেশ করলাম, ততবার কোন না কোন পীড়া শিক্ষার প্রতিবন্ধক হয়, অবশেষে নিসবতে-বাতেনী প্রদান হল। আমি মামুকে বললাম, আমার একপ্রকার ভাব হচ্ছে যে, সেজন্য ইলম শিক্ষা করতে অক্ষম হচ্ছি। আপনি ছাড়েন না, যদি অধিক পীড়াপীড়ি করেন, তবে আমি নিজেই বিনষ্ট হওয়ার সন্দেহ করি। আমার এই কথায় বিস্ময়ান্বিত হয়ে তিনি বললেন, আমি তোমার অবস্থা উত্তমরূপে জানতাম না, এরপর তোমাকে ছেড়েই দিলাম যে পথে তোমার অন্তর ধাবিত হয় তুমি তাতেই মনোনিবেশ কর। দ্বিতীয় বার ইলম শিক্ষা করার ইচ্ছা করলাম। তাতে আমার চোখে বেদনা আরম্ভ হল, ৪৫ দিন উক্ত পীড়া থাকলো, কাজেই আমি পড়া ত্যাগ করলাম। আমি নাহুর মেসবাহ পুস্তকের দু পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়েছিলাম। খাজা ফজলুল্লাহ বলেন— তিনি জাহেরী ইলমের যৎসামান্যই পড়েছিলেন।

হযরত সাইয়্যেদ আহমদ সাহেব যে পরিমাণ ইলম শিক্ষা করেছিলেন, ইনিও তাহা অপেক্ষা কিছু কম ইলম শিক্ষা করেছিলেন। কিন্তু এতবড় পীর ও বুযর্গ হলেন যে, হযরত খাজা বাকিবিল্লাহ সাহেবের পরদাদা পীর ছিলেন।

নাফহাতুল উনছ, ৩৩১ পৃষ্ঠা—

"পীর আবু আলী ফারমাদী বলেছেন, আমি ইলম শিক্ষা করতে আত্মনিয়োগ করেছিলাম। এক দিবস দোয়াত হতে কলম তুলে দেখি যে কালি সাদা হয়ে গেছে, তখন আমি নিজ শিক্ষক ইমাম আবুল কাসেম কোশায়রির খেদমতে উপস্থিত হলাম এবং উক্ত অবস্থা তাঁর নিকট প্রকাশ করলাম। তিনি বললেন, যখন ইলম তোমা হইতে হস্ত সংকোচ করেছে, তখন তুমি তাহা হতে হস্ত সংকোচ কর। নিজের কাজে রত হও। আমি মাদ্রাসা থেকে আছবাব পত্র নিয়ে খানকাহে উপস্থিত হলাম। তাঁর খেদমতে আত্মনিয়োগ করলাম। একদিন তিনি যে গোসলখানাতে গিয়েছিলেন, আমি কয়েক বালতি পানি ঢেলে দিলাম। তিনি বললেন, "হে আবু আলি, আমি যাহা ৭০ বছরে লাভ করেছি, তুমি এক বালতি পানি দ্বারা তাহাই লাভ করিলে।" রদ্দে বেদয়াত-৪।১১৫-১৭ পৃষ্ঠা।

"মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী রহমাতুল্লাহ 'মোকাশাফাতে রহমত কেতাবের ২৬পৃষ্ঠায় লিখেছেন— মাওলানা আবুল হাই সাহেব হযরত শাহ আবদুল আযিয মোহাদ্দেস দেহলবীর কাছে বলেছিলেন, আমি সাইয়্যেদ (আহমদ মোজাদ্দেদ) সাহেবের আদেশ মতে তাহাজ্জদ নামায পড়ায় সাহাবাগণের ন্যায় মিষ্টতা অনুভব করিয়া তাঁহারর নিকট মুরীদ হইয়াছি। আমি অধিকাংশ তরীকাধারিদের তাওয়াজ্জোহ প্রদানের হালকাতে বসিয়াছি। কিন্তু সাইয়্যেদ সাহেবের আদেশমত যে উপকার পাইয়াছি, এইরূপ কখনও পাই নাই। এই সাইয়্যেদ সাহেবের শিক্ষা কোন তরীকার শিক্ষা ? তদুত্তরে হযরত শাহ সাহেব বলিলেন, মিয়া এইরূপ লোক যাহা মুখ দিয়া বলেন, তাহাই তরীকা, ইহারা সাহেবে -তরীকত হয়ে থাকেন।" রদ্দে-বেদয়াত-৪।১২পৃষ্ঠা।

হযরত পীর হাবিবে আজমী, হযরত আবু এজিদ বাস্তামী, তাঁর পীর সেখ আবু আলী, শায়খোল ইসলাম আহমদ নামেকি, পীর আবুল হাসান খেরকানী, বড় পীর সাহেবের পীর পীর হাম্মাদ দাব্বাছ পীর আবুল আব্বাছ

আমেলি, পীর আলি বেনে হাম্মাদ, পীর খায়েরচা, এরূপ অন্যান্য বহু পীর মাশায়েখ ইলমে জাহেরী জানতেন না, কিন্তু তাঁরা শ্রেষ্ঠ পীরত্বের আসন গ্রহণ করেছিলেন। প্রগুক্ত- ৪।১৬৫ পৃঃ

পীর আবুল আব্বাছ আমেলি, ইনি কসাই ছিলেন। আমেল ও তেবরেস্থানের পীর ছিলেন এবং তিনি জামানার গওস ছিলেন। তিনি উম্মি ছিলেন।

পীর মো'মাল জাচ্ছাজ সিরাজের প্রধান পীর ছিলেন, কিন্তু তিনি উম্মি ছিলেন। তিনি লিখতে জানতেন না।

পীর ইবরাহিম বেনে আহমদ এর পীর, পীর মোসলেম মাগরেবি উম্মি ছিলেন, সুরা ফাতেহা 'শুদ্ধ করে পড়তে পারতেন না। অথচ তিনি বাঘের কান মলে দিতেন।

রাখাল শায়বান উম্মি ছিলেন কিন্তু ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহ এর মহামান্য পীর ছিলেন।

নবীপাক হযরত মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদেশে তিনি মোজাদ্দেদ সাইয়্যেদ আহমদ রহমাতুল্লাহ দস্তে বায়অত/ ও সোহবত এখতিয়ারঃ—

তদ্রূপ হযরত সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলী রহমাতুল্লাহ উম্মি ছিলেন— কিন্তু ভারত উপমহাদেশও আরব আজমের পীরানে পীর ও মোজাদ্দেদ ছিলেন। **নবীপাকের নির্দেশে হযরত সূফী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী** রহমাতুল্লাহ **কোলকাতা গমন করে বায়অত হয়ে খিলাফত ও কামালিয়াত হাসিল করেছিলেন, যা দিবা লোকের ন্যায় সত্য।**

হযরত সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী সাহেব জাহেরী বাতেনী তালীম সমাপ্ত করে নকশাবন্দীয়া মোজাদ্দেদীয়া তরীকায় কামিয়াবী হাসেল করতঃ এশায়াতে ইসলামে যখন রত ছিলেন। সে সময় তিনি **একদিন স্বপ্নযোগে হযরত রিসালাতমায়াব ছরকারে দোআলম হযরত নবী পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া**

সাল্লাম এর বাশারত হয়। "আমার সন্তান সৈয়দ আহমদ কলিকাতা এসেছেন। তুমি তাঁর হতে বয়অত গ্রহণ কর।"

অতঃপর সূফী সাহেব অতি সত্তর চট্টগ্রাম থেকে কোলকাতায় নবী পাকের নির্দেশমত আমীরুল মো'মেনীন হযরত সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলীর রহমাতুল্লাহ এর দস্ত মোবারকে বয়অত গ্রহণ করেন এবং তাঁর খেদমতে রত থাকেন। এ সময় হযরত বেরেলভী রহমাতুল্লাহ তাঁর প্রখ্যাত খলিফা ও আলেম হাফেয জামালুদ্দীন রহমাতুল্লাহ এর সিন্দুরীয়া পট্রি মসজিদের (কোলকাতা নাখোদা মসজিদের সন্নিকট) কামরায় অবস্থান করছিলেন। হযরত সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহমাতুল্লাহ কোলকাতা থেকে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে জুলাই হিজরী ১২৩৬ সনের ২০শে শওয়াল ৪৩০ জন সাথী সহ হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ শরীফ রওয়ানা হন। পথিমধ্যে কাফেলার সংখ্যা ৭০০ জনে পৌছে, এ কাফেলায় পীরের সাথে সাথী ছিলেন হযরত সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী, হযরত মাওলানা ইমানুদ্দীন সাদুল্লাহপুরী রহমাতুল্লাহ হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ ওয়ারেস আলী প্রমূখ। ১২৩৭ হিজরীর সফর মাসে (১৮২২খ্রীষ্টাব্দে) হযরত সাইয়্যেদ আহমদ রহমাতুল্লাহ কাফেলা সহ হজ্জ শেষে কোলকাতায় ফিরে আসেন এবং তিন মাসকাল অবস্থান করেন।

সূফী সাহেব কিবলা ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৩১ সালের ৬ই মে পর্যন্ত বুযর্গ পীর ও মুর্শিদ মোজাহেদে আযম হযরত সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহমাতুল্লাহ এর সোহবত এখতিয়ার করেন। এ সুদীর্ঘ সময়ে পিছন ফিরে অর্থাৎ ঘরসংসারের দিকে আর তাকান নাই। পীরগতপ্রাণ হযরত সুফী সাহেব অধিকাংশ জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি প্রধান সেনানীর দায়িত্ব পালন করেন।

হযরত সাইয়্যেদ আহমদ রহমাতুল্লাহ ১৮২৬ সালের ৭ই জানুয়ারী প্রায় ১২ হাজার মোজাহেদ সহ জিহাদে রওনা দেন। উত্তর পশ্চিম পাহাড় অঞ্চলে প্রবেশ করেন এবং কাবুল কান্দাহার হয়ে সিন্ধু নদীর মধ্যে দিয়ে ইউসুফ জাই এলাকায় প্রবেশ করেন। নওশেরার যুদ্ধে কোন সাফল্য পাননি। পরে পাঞ্জতন কেল্লা দখল করেন।

এক্ষণে কতিপয় ব্যক্তি অপপ্রচার করছে—"সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলী মূর্খ ছিলেন। তিনি একজন যোদ্ধা বা সিপাহ সালার ছিলেন। তিনি জিহাদের বয়য়ত নিয়ে ছিলেন। তিনি উপযুক্ত পীর ছিলেন না।"

হযরত মাওলানা শাহসূফী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী তাঁর কাছে জিহাদের বয়য়ত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর খলিফা নন। তাঁর পীর ছিলেন ঢাকার আজিমপুরের হযরত দায়েম রহমাতুল্লাহ।"

আমি ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি তিনি হযরত দায়েম রহমাতুল্লাহ খলিফা ছিলেন। তদ্রূপ তিনিও হযরত মোজাদ্দেদ সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলভী রহমাতুল্লাহ এর খলিফা ছিলেন। আর হযরত সাইয়্যেদ আহমদ সাহেব অত্যান্ত উচ্চ পর্য্যায়ের বোজর্গপীরও সাহেবে কাশফ, জামানার মোজাদ্দেদ ছিলেন। তাঁর বুযর্গ পীর হযরত শাহ আব্দুল আজীজ দেহলভী তাঁর উচ্চ প্রশংসা করেছেন এবং নিজ খান্দানের মাওলানা আব্দুল হাই সাহেব। (ইনি শাহ সাহেবের জামাতা)। মাওলানা আব্দুল গণি সাহেব (ইনি শাহ্ রফিউদ্দীন সাহেবের পুত্র)। মিয়াঁজী নূর মোহাম্মদ ঝনঝনাবী। (ইনি হাজী মাওলানা ইমদাদুল্লাহ সাহেবের পীর মোর্শেদ) শেখ মোহাম্মদ ওমর, মুফতীয়ে মক্কা, (ইনি শাইখুল উলামা আবদুর রহমান সাহেবের উস্তাদ) সৈয়দ আকিল ও সৈয়দ হামজা, এ দুই বোজর্গ মক্কা শরীফের ওলি ছিলেন, কাশফের দ্বারা সৈয়দ সাহেবের দরজা অবগত হয়ে মুরীদ হন।

খাজা আলমাস, (ইনি মদীনা শরীফের গওস ও প্রধান অলি ছিলেন) শেখ শামসুদ্দীন শাত্তা মিসরী। (ইনি বায়তুল্লাহ শরীফের ওয়ায়েজ) শেখ মোহাম্মদ আলী হিন্দী, (ইনি মক্কা শরীফের মোদার্রেস)। হাফেজ মাগরেবী শেখ আহমদ বেনে ইদরিস, (ইনি হাফেযে সহীহ বোখারী) ওমর বেনে আব্দুর রাসুল, (প্রসিদ্ধ ওলি ও মোহাদ্দেস) শেখ বোখারামী (মদিনা শরীফের মোদার্রেস) মাওলানা হাফেয জামালুদ্দীন সাহেব কোলকাতার কোতব।

এরূপ আরব রুম, শাম, মিসর, ভারতের হাজার হাজার আলেমও সূফী দরবেশ, তাঁর নিকট মুরীদ হয়েছিলেন।

মোজাহেদে আযম, মোজাদ্দেদ, সাইয়্যেদ আহমদ ইলমে-লাদুন্নি প্রাপ্ত উচ্চস্তরের কাশফ শক্তি সম্পন্ন বুযর্গ পীর ছিলেন—

উল্লিখিত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, হযরত সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলভী রহমাতুল্লাহ পীরে মোকাম্মল, সাহেবে তরীকত এবং মোজাদ্দেদ ছিলেন।

হালাতে মাশায়েখে নকশাবন্দীয়া মোজাদ্দেদিয়া-১৪৭পৃষ্ঠা।

খাজা বাহাউদ্দিন রহমাতুল্লাহ বলেন— তরিকত পন্থিগণ দুই প্রকার হইয়া থাকেন, এক প্রকার কঠোর পরিশ্রম সাধ্যসাধনা ও মোজাহাদা করিয়া থাকেন, এবং তদানুযায়ী উহার ফল প্রাপ্ত হন। আর এক প্রকার ফজলি হইয়া থাকেন, খোদার অনুগ্রহ ব্যতীত কিছুই জানেন না, এবাদত ও রিয়াজাত ও তাঁহার অনুগ্রহ জানেন, এই দল জলদি সফল মনোরথ হইয়া থাকেন।" রদ্দে বিদয়াত ৪/৯৫ পৃষ্ঠা।

হালাতে মাশায়েখে নকশন্দীয়া-১৭৪-১৭৫ পৃষ্ঠা।

"হযরত খাজা বাকিবিল্লাহ্ এক রাতে হযরত খাজা বাহাউদ্দিন সাহেবের রুহানী ফয়েজ ও তিন রাতে হযরত মাওলানা খাজাকি আমকিনকি সাহেবের দ্বারা ফয়েজ প্রাপ্ত হয়ে এত বড় অলি হয়েছিলেন যে, হযরত ইমাম আহমদ সারহান্দীর পীর হয়ে ছিলেন।" —রদ্দে বেদয়াত ৪।১০১ পৃষ্ঠা।

হযরত ইমাম রব্বানী সাহেব দুই মাস ও কয়েক দিবসে নকশাবন্দীয়া তরীকার সমস্ত নিসবত লাভ করেছিলেন। হালাতে মাশায়েখে নকশাবন্দীয়া-১৯০পৃষ্ঠা।

'হযরত পীর আবুবকর বেনে হাওয়ার একরাতে এবং পীর আবু মোহাম্মদ শাম্বাকী তিন দিবসে মহা অলি হয়ে ছিলেন।—রদ্দে বেদয়াত ৪।১০১ পৃষ্ঠা।

এমাম গাজ্জালী এহইয়াউল উলুম-৩।১৫ পৃষ্ঠা—

অন্তর সমূহের চক্ষু হতে পরদা সকল দূরীভূত হলে, লওহে মহফুজে যাহা লিখিত আছে, উহার কতক সংবাদ উক্ত চক্ষুগুলিতে প্রকাশিত হয়ে পড়ে।—রদ্দে বেদয়াত-৪।১০৭ পৃষ্ঠা।

পীরগণ মোকাশাফা শক্তিতে লওহো মাহফুজ্জের সংবাদ অবগত হয়ে থাকেন। আর দুনিয়ার কিতাবগুলোর সংবাদ অবগত হয়ে থাকেন, তা কেন অযৌক্তিক হবে?

হযরত মোজাদ্দেদ সৈয়দ আহমদ বেরেলভী রহমাতুল্লাহ এর জলন্ত কারামত

হযরত ইমাম রব্বানী মোজাদ্দেদে আলফে সানি, রহমাতুল্লাহ আলাইহে মকতুবাত শরীফের ২২৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—

"কোন কোন ওলি মোকাশাফা শক্তির বলে লওহে মাহফুজের লিখিত বিষয় দর্শন করিয়া থাকেন। উক্ত মোজাদ্দেদ সাহেব লওহো-মাহফুজের কোন কোন অবস্থা জানিতে পারিয়াছিলেন।"

তফসিরে রূহল মায়ানী - ৭।৬৪-৬৫ পৃষ্ঠা—

"হুজ্জাতুল ইসলাম গাজ্জালী নিজের কেতাব আল-মেনকেজ মেনাদ্দালালে' এই নেতৃস্থানীয় পীরগণের প্রশংসা বর্ণনা উপলক্ষে বলিয়াছেন, নিশ্চয় তাঁহারা জাগরিত অবস্থায় ফেরেশতা ও নবীগণের রূহদিগকে দেখিয়া থাকেন এবং তাহাদের শব্দ শুনিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের নিকট লাভ জনক বিষয়গুলি শিক্ষা করিয়া থাকেন।"

"তাঁহার একজন শিষ্য মালেকী মাজাহালম্বী এমাম আবু বকর বেনেন আরাবী নিজের কিতাব কানুনূত্তাবিলে বলিয়াছেন— সূফীগণ এই মতাবম্বন করিয়াছেন যে, মানুষের পক্ষে নফসের পবিত্রতা, অন্তরের শুদ্ধি, পার্থিব সম্বন্ধ সমূহ বর্জন, সম্মান, সম্পদ ও পার্থিব উপকরণগুলির মূলোচ্ছেদ, সমশ্রেণীর মিলন ত্যাগ এবং অবিরত জ্ঞান ও কার্য্যে আল্লাহতায়ালার দিকে মনোনিবেশ সহজসাধ্য হয়, তখন তাহার পক্ষে লতিফা সমূহ প্রকাশিত হয় এবং সে ফেরেস্তাগণকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহাদের কথা শ্রবণ করিয়া থাকে এবং নবিগণের রূহ ও ফেরেশতাগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকে।"

ফুরফুরা শরীফের আলা হযরত পীর আবু বকর সিদ্দিকী রহমাতুল্লাহ এর বিশিষ্ট খলিফা। আল্লামায়ে হিন্দ, হযরত মাওলানা পীর মুহাম্মদ রূহল আমীন রহমাতুল্লাহ ফিরিস্তাকে সালাম করে ছিলেন। বোডলা গাড়ীর মাহফিলের নামাযের জামায়াতে কত লোক হয়েছে, তা পীরের জিজ্ঞাসায় তিনি লওহে মাহফুজের লেখা দেখে বলে দিয়েছিলেন— সীরাতে রুহল আমীন-১৮৩পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আরও তিনি উক্ত কেতাবের ৬০।৬১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন।

"কেহ কেহ বলিয়াছেন, হযরত ইছা (আঃ) আসমান হইতে নাজেল হওয়ার পরে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাক্ষাতে তাঁহার নিকট হইতে শরিয়তের আহকাম শিক্ষা করিবেন। আর ইহাও সম্ভব যে, রুহানী (আত্মিক) ভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাক্ষাৎ করিয়া শিক্ষা করিবেন। ইহা কোন অভিনব মত নহে। কেননা হযরতের ওফাত শরীফের পরে, এই উম্মতের একাধিক কামেল পীরগণ উক্ত হযরতের সহিত চৈতন্যাবস্থায় সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

মোল্লা হোসায়েন কাশেফীকৃত-রশহাত শেখ তাজদ্দীনকৃত লাতায়েফুল মিনাল। শেখ সিরাজদ্দীনকৃত তাজকেরাতু আউলিয়া, বড় পীর কৃত-বাহজাতোল আছরার, সিয়ারুল আকতাব কেতাবে বিস্তারিত দেখা যেতে পারে।

"শেখ সিরাজদ্দিন তাবাকাতোল আওলিয়া কেতাবে লিখিয়াছেন। শেখ আবদুল কাদের জিলানী (কোঃ) বলিয়াছেন, আমি যোহরের নামাযের পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দর্শন লাভ করিয়াছিলাম। তিনি আরও বলিয়াছেন। হে প্রিয় পুত্র, তুমি উপদেশ প্রদান কর না কেন? আমি বলিলাম, হে পিতা আমি একজন আজামী পুরুষ, বাগদাদের সহিহ (শুদ্ধ প্রাঞ্জল ভাষাভাষী) দিগের নিকট কিরূপে উপদেশ প্রদান করিব? ইহাতে হযরত বলিলেন, তুমি নিজের মুখ খুলিয়া দাও। আমি মুখ খুলিয়া দিলে, তিনি উহাতে সাতবার থুথু দিলেন এবং বলিলেন, তুমি লোকদিগকে উপদেশ প্রদান কর হেকমত এবং উৎকৃষ্ট উপদেশ দ্বারা (তাহাদিগকে) তোমার প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান কর। আমি যোহর পড়িয়া বসিলাম এবং আমার নিকট বহু লোক সমবেত হইল এবং আমার শরীরে কম্পন উপস্থিত হইল। এমতাবস্থায় আমি মজলিসে আমার সম্মুখে হযরত আলী (রাঃ) কে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখিলাম তৎপরে তিনি আমাকে বলিলেন, হে আমার পুত্র, তুমি কেন ওয়াজ বর্ণনা করিতেছ না? আমি বলিলাম, হে পিতা, আমার শরীরে কম্পন উপস্থিত হইয়াছে। উহাতে তিনি বলিলেন, তুমি তোমার মুখ খুলিয়া দাও। আমি মুখ খুলিয়া দিলে, তিনি উহাতে ছয়বার থুথু দিলেন। আমি বলিলাম, কেন আপনি সাতবার পূর্ণ করিলেন না? তিনি বলিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহিত আদব রক্ষার্থে (উহা পূর্ণ করি নাই)। তৎপর তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

আর ও তিনি শেখ খলিফা বেনে মুছা নহর মুলকির ইতিবৃত্তে লিখিয়াছেন, তিনি জাগতিক ও নিদ্রিক অবস্থায় হযরত নবী করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু সাক্ষাৎকারী ছিলেন, এমন কি বলা হয় যে, তিনি জাগতিক ও নিদ্রিত অবস্থায় নিজের অধিকাংশ কার্য্য হযরতের শিক্ষায় করিতেন। একরাত্রে তিনি হযরতকে ১৭বার দর্শন করেন, একবার হযরত তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, হে খলিফা, তুমি আমার উপর বিরক্ত হইও না, অনেক অলি আমার সাক্ষাৎ না পাওয়া দুঃখে মরিয়া গিয়াছেন।

"শেখ তাজদ্দীন আতায়েফোল মেনান কেতাবে লিখিয়াছেন-এক ব্যক্তি শেখ আবুল আব্বাস মারছিকে বলিয়াছিলেন- হে আমার অগ্রণী, আপনি এই হাতের দ্বারা আমার সহিত মোসাফাহা করুন, কেননা আপনি বহুলোক ও বহু শহর দর্শন করিয়াছেন। ইহাতে তিনি বলিলেন, খোদাতায়ালার শপথ, আমি এই হস্ত দ্বারা কেবল রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহিত মোসাফাহা করিয়াছি। আরও তিনি বলিলেন, যদি রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চক্ষের পলক মারা পরিমাণ আমা হইতে অন্তহিত হন। তবে আমি নিজেকে মুসলমান মধ্যে গণ্য করি না।"

ফুরফুরা শরীফের পীর আবু বকর সিদ্দিকী রহমাতুল্লাহ এর অন্যতম খলিফা আবদুল মোমেন রহমাতুল্লাহ দীর্ঘ ছায়ের করে ফুরফুরা শরীফের দরবারে স্বীয় পীর কেবলার মজলিসে বসেছিলেন এমন সময় হিন্দুস্থানের একজন বড় আলেম দরবার শরীফে পীর কেবলার সাথে সালাম মোসাফাহা করেন। উপস্থিত সকলের সাথেও মোসাফাহা করেন। তিনি সূফী আবদুল মোমেন সাহেবের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেও তিনি মোসাফাহা না করে হাত গুটিয়ে নেন। পীর কেবলা বলেন- বাবা আব্দুল মোমেন, মোসাফাহা করলেন না কেন? তিনি বিনীত ভাবে বলেন হুযুর বেআদবী মাফ করবেন এই মাত্র কয়েকদিন আগেও বিশ্বনবী হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে মোশাফাহা করেছি, সেই হাত একজন ধূমপানকারীর হাতে হাত দিই কি করে।

বাহজাতোল আসরার-২৬ পৃষ্ঠা—

এক সময় হযরত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড়পীর সাহেবের দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন, ইহাতে তিনি আলী বেনেল হিতি নামক একজন মুরীদের উপর এস্তেগরাকের ফয়েয নিক্ষেপ করে তাঁহার সাক্ষাৎ করিয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী সাইয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়সী সাহেব মাওলানা সায়াদাত হোসেন সাহেবকে ঐরূপ করেছিলেন। কারামতে আহমদীয়া, রদ্দে বেদয়াত-৪।১৩৭পৃষ্ঠা।

নাফহাতোল উনস্-১৭৩ পৃষ্ঠা—

"শায়খোল ইসলাম বলিয়াছেন লোক (পীর) আবু বকর কাত্তানিকে হজরত নবী মুস্তফা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাগরেদ বলতেন, যেহেতু তিনি বহুবার স্বপ্নে তাঁকে দেখতেন, তিনি জানতেন যে কোন দিন কিম্বা কোন রাতে হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখবেন। লোকে তাঁর নিকট প্রশ্ন করতেন, তিনি উক্ত প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে জিজ্ঞাসা করতেন এবং জওয়াব শ্রবণ করতেন।

উক্ত কেতাব ১৯৬ পৃঃ।

পীর আবুল আলী কাতেব মিসরী বলেন, যখন আমার উপর কোন বিষয় জটিল হয়ে পড়তো, তখন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে স্বপ্নে দেখতাম তাঁর থেকে (উক্ত বিষয়) জিজ্ঞাসা করতাম।

উক্ত কেতাব- ৪৫০ পৃষ্ঠা—

মাওলানা জালালুদ্দীন আবু এজিদ পুবানি বলেছেন, যখন আমার পক্ষে কেন সমস্যা উপস্থিত হয়, হযরত রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রূহ কোন মধ্যস্থ ব্যতীত উহা সমাধান করেন।— রদ্দে বেদয়াত-২৩৮ পৃষ্ঠা।

আখবারুল আখইয়ার-১৫০পৃষ্ঠা—

"পীর সাইয়্যেদ ইউসুফ জামাল হোসাইনি প্রত্যেক জুমার রাতে হযরত রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে স্বপ্নে দেখতেন।

আখবারুল আখইয়ার-১৮৯পৃষ্ঠা—

পীর আহমদ আবদুল হক রহমাতুল্লাহ বলতেন যেরূপ সাহাবাগণের হজরত নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গলাভ ছিল। সেইরূপ হাল সম্পন্ন ও আল্লাহতায়ালার প্রেমিকদিগের অবস্থায় (হযরত) নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে এখনও রেয়েছে। সুবহানাল্লাহ।

নাফহাতুল উনস্—২০৭ পৃষ্ঠা—

পীর এবরাহীম বেনে আহমদ বর্ণনা করেন-আমি আমার প্রথম অবস্থায় পীর মোসলেম মাগরিবী সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছায় তাঁর মসজিদে উপস্থিত হলাম। উক্ত এমাম সাহেব ইমামত করলেন, এবং সুরা ফাতেহাতে কয়েক স্থানে ভুল পড়লেন। আমি মনে মনেবললাম আমার কষ্ট করে আসাই বৃথা হয়েছে। উক্ত রাতে আমি তথায় থাকলাম। দ্বিতীয় দিন পাক হওয়ার উদ্দেশ্যে ফোরাতের কুলে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম। পথিমধ্যে একটি বাঘ নিদ্রিত ছিল, তদ্দর্শনে আমি প্রত্যাবর্ত্তন করলাম, দ্বিতীয় একটি বাঘ আমার পশ্চাতে আসতে দেখলাম, আমি গমন করতে অক্ষম হয়ে চিৎকার করতে লাগলাম। পীর মোসলেম সাহেব ইবাদাতগাহ হতে বাহির হলেন, বাঘেরা তাঁকে দেখতে পেয়েই নম্রতা আরম্ভ করলো। পীর সাহেব প্রত্যেকের কান ধরে মলে বললেন হে খোদার কুকুরেরা। আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই, তোমরা আমার মেহমানদের প্রতি উপদ্রব করিও না। সেই সময় পীর সাহেব আমাকে বলনে, হে আবু ইসাহক, তোমরা বাহ্যভাব সংস্কার করতে ব্রতী হইয়াছ, এই হেতু সৃষ্টজীব হইতে আশঙ্কা করে থাক, আমরা অন্তর শুদ্ধ করতে সংলিপ্ত হয়ে থাকি। এ হেতু সৃষ্ট জীব আমাদিগকে দেখিয়া ভয় পেয়ে থাকে।

হযরত মোজাদ্দেদ সাহেবের প্রতি ওহাবি হওয়ার মিথ্যা অপবাদ

অতি অল্প সময়ের মধ্যে হযরত সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহমাতুল্লাহ ও তাঁর খলিফাদের দ্বীনি খেদমত ব্যপকভাবে প্রসার লাভ করার ফলে সমাজে শরিয়ত বিরোধী কার্য্যকলাপ ও অসামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড লোপ পেয়ে যায়। হাজার হাজার মানুষ সাইয়্যেদ সাহেবের অনুগামী হতে দেখে, শরিয়তের দুশ্মনদের গাত্রদাহ হয়ে পড়ে। পীরি মুরিদীকে যারা ঘৃণা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে, মজহাব মান্যকারীদের যারা মোশরেক ধারণা করে, নবীপাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে যারা হায়াতুন্নাবীর আকীদা পোষণ না করে, অশান্তি প্রিয় প্রবঞ্চক ইত্যাকার কতিপয় মতালম্বীদের গাত্রদাহ করতে থাকে, তারাই সাইয়্যেদ সাহেবের জনপ্রিয়তা দেখে হিংসার জ্বলে পুড়ে মরিতে থাকে। এমতাবস্থায় উক্ত

হিংসুকেরা অপপ্রচার করতে থাকে, তিনি ওহাবী ছিলেন। বস্তুতঃ এ দাবি ছিল মিথ্যা এবং সারশূন্য। ইদানিং লামজহাবী, জাময়াতিতের * চক্রান্ত কতিপয় পীরানা ঘরনার লোকদের মুখে ঐ রূপ অমুলক কথা শোনো যাচ্ছে।

হযরত মোজাদ্দেদ সাইয়্যেদ আহমদ রহমাতুল্লাহ অন্যতম খলীফা। দ্বীনের হাদী, হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী রহমাতুল্লাহ 'মোকাশাফাতে রহমত কেতাবে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। হযরত আল্লামা রূহল আমিন রহমাতুল্লাহ কারামতে আহমদিয়ার ১৩-১৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—

(সংক্ষেপ) "অবশ্য লোকদিগের মুখে তাহাদের অবস্থা এতটুকু বুঝা যায় যে, তাহারা শেরেক হতে পাক থাকে, কিন্তু তাহারা এত হটকারি যে নিজেদের দল ব্যতীত অন্য লোকদিগকে মুসলমান বলিয়া ধারণা করে না, সমস্তকে মোশরেক বলিয়া থাকে, আর সমস্তের প্রতি কুধারণা করিয়া থাকে, এমন কি মক্কা ও মদিনার লোকেরাও তাহাদের মতে মোসলমান নহে। বেদাতিদিগকে অতিরঞ্জিত ভাবে মোশরেক বলিয়া থাকে। এই ওহাবি দল সৈয়দ সাহেবের ঘোর বিরোধী, কেননা সৈয়দ সাহেব শেরক বেদয়াত বিশেষভাবে নিষেধ করিয়াছেন এবং শেরক ও বেদয়াত এতদুভয়ের পার্থক্য খুব বুঝাইয়া দিয়াছেন। যেরূপ তাহার দলের সমস্ত কেতাবে এই কথা প্রকাশ রহিয়াছে।

উপরোক্ত প্রতারক ফাছাদি দল অবশ্য জেদে পড়িয়া সুন্নত জামায়াতকে অহাবি বলিয়া ও দ্বীনদারগণকে বেদ্বীন বলিয়া অহাবিদের অনুরূপ মতধারী হইয়াছে।"

"উল্লিখিত মিথ্যা অপবাদের দ্বিতীয় কারণ এই যে, লা-মজহাবিদের মধ্য হইতে একদল লোক সৈয়দ সাহেবকে মন্দ বলিয়া থাকে, তকলিদ করা ও

---

* জল-খাবার আর খাবার-জল, যেমন এক নয়, তদ্রূপ জাময়াতে ইসলামি আর ইসলামি জামায়াত এক নয়।

মুরিদ হওয়া নাজায়েজ। আর তাহাদের অন্য একদল প্রবঞ্চনা করতঃ লোকদিগকে ধোকা দিবার উদ্দেশ্যে নিজদিগকে সৈয়দ সাহেবের দলভূক্ত করিবার চেষ্টা করে, অথচ সৈয়দ সাহেব এইরূপ লোকদিগকে নিজের জামায়াত হইতে বহির করিয়া দিয়াছিলেন।

সৈয়দ ছাহেবের দলের কুওয়াতোল ঈমান, নেজামোল ইসলাম, মেয়াতে মাছায়েল প্রভৃতি কেতাবে উক্ত লামজহাবীদের খুর রদ লেখা হইয়াছে.................।"

"কতক দাড়ি মুণ্ডনকারী, বেনামাজী, ফাছেক, গোর পুজক, কামরিপুর বশীভূত শরিয়তের বিরোধী, অত্যাচারীদের সহায়তাকারী মন্দ আলেম। নফছও শয়তানের উত্তেজনায় সৈয়দ সাহেবের মোজাদ্দেদ হওয়া অস্বীকার করিয়া বসিল। উল্লিখিত প্রবঞ্চক ফাছাদকারীগণের সহিত মিলিত হইল। ভিন্ন ভিন্ন ফাছাদকারীদের কর্ত্তৃক শত্রুতা প্রকাশ করিতে লাগিল এবং দুই জগতে লঞ্চিত হইতে লাগিল।"

আল্লামা রূহল আমিন রহমাতুল্লাহ কারামতে আহমদিয়া পুস্তকে সিরাতল মোস্তাকিম ১৪৯-১৫২ পৃষ্ঠা ও তাওয়ারিখে-আজিবা ১০-১১পৃষ্ঠা বরাতে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

"সৈয়দ সাহেব কামালাতে নবুওয়াতে ও কামালতে বেলায়েত এই দুই ছুলুক পূর্ণ করার পরে একদিবস মোরাকাবা অবস্থায় হজরত খাজা বখতিয়ার কাকির রহমাতুল্লাহ রূহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, সেই সময় সৈয়দ সাহেব খাজা সাহেবের মস্তকের উপর একটি জ্যোতিষ্মান ছত্র এবং তাঁহার মস্তকের উপর দুটি ছত্র ছায়া প্রদান করিতে দেখিলেন। হজরত সৈয়দ সাহেব নিজকে উক্ত খাজা সাহেবের সামান্য মুরিদ বলিয়া ধারণা করিতেন, কিন্তু ব্যাপারটি বিপরীত দেখিয়া তিনি নিতান্ত লজ্জিত হইলেন। হঠাৎ মোরাকাবা শেষ করিয়া ভীত কম্পিত অবস্থায় মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ সাহেবের খেদমতে হাজির হইয়া ভয় ও লজ্জার সহিত এই ঘটনা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন। হজরত মাওলানা অত্যান্ত আনন্দিত হইয়া হাস্যমুখে বলিলেন, হে পুত্র! ইহা আশ্চর্য নহে, বেলায়েতে নবুয়তের এইরূপ লক্ষণ হইয়া থাকে। হে

প্রিয়পাত্র! ইহাত! উহার প্রথম অবস্থা, সমুদ্রের এক বিন্দু সমান এখন তোমার উপর প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পরে দিন দিন ইহা অপেক্ষা সহস্র সহস্রগুণ বৃহৎ অবস্থা তোমার উপর প্রকাশিত হইবে।"

আর ও উক্ত কেতাবের ১৫/১৬ পৃষ্ঠায়—

মখজেন লেখক বলেছেন- দ্বিতীয়বার সৈয়দ সাহেব পৌছাবার সাতদিন আগে হযরত মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ রহমাতুল্লাহ স্বপ্নে দেখেন যে জনাব হযরত রাসুলুল্লাহ রহমাতুল্লাহ দিল্লীর জামে মসজিদে তশরীফ আনেন। চারিদিক থেকে তাঁর জিয়ারতের জন্য দৌড়ে দৌড়ে আসছেন। প্রথমে শাহ সাহেব জিয়ারত করলেন। সে সময় নবীপাক শাহ সাহেবের হাতে একটি যষ্টি দিয়ে বললেন, তুমি যষ্টি হাতে নিয়ে মসজিদের দরওয়াজায় বসে থাক। যে ব্যক্তি আমার জিয়ারতে আসবেন। তার অবস্থা আমার কাছে প্রকাশ কর। আমি যাকে আসতে অনুমতি দিব, তাকেই তুমি আমার সাক্ষাতে আনবে। আর আমি যাকে নিষেধ করব তাকে নয়। শাহ সাহেব হাতে যষ্টি নিয়ে মসজিদের দরওয়াজায় বসলেন এবং সেই নিয়মে অনুমতি প্রাপ্ত মানুষেরো নবী পাকের জিয়ারত নসীব পান।

শাহ সাহেব এ স্বপ্ন দেখে সকালে হযরত শামসুদ্দীন শহীদ সাহেবের প্রধান খলিফা হযরত শাহ গোলাম আলি সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করে, উক্ত সত্যস্বপ্ন তাঁর কাছে প্রকাশ করে মর্ম জিজ্ঞাসা করলেন। হযরত গোলাম আলি শাহ বললেন, 'কি আশ্চার্য্য যে আপনি দ্বিতীয় ইউসুফ হয়ে স্বপ্নের মর্ম আমার কাছে জানতে চান, শাহ সাহেব বললেন, এ আশ্চর্য্যজনক স্বপ্নের বৃত্তান্ত আপনার পাক জবান থেকে শুনতে ইচ্ছা করে।

শাহ গোলাম আলি সাহেব বললেন— আমার ধারণায় স্বপ্নের মর্ম বিবেচিত হয় যে, হযরত সৈয়দ হাসান (রাঃ) যিনি মুরিদগণকে হযরত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দর্শন লাভ করে দিতেন। অদ্য দেড় শত বছর গত হয়ে গেছে। সে হতে লোকদিগকে হযরত নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেদায়েতের জন্য তাওয়াজ্জোহ রহিত হয়ে গেছে। এ স্বপ্নে বোঝা যায় যে আপনার কিম্বা আপনার কোন উপযুক্ত মুরিদের হস্তে যে হেদায়েতের দেড়শত বছর হতে বন্ধ হয়ে গেছে তা প্রসারিত

হবে। মাওলানা তা শুনে বললেন, আমার ধারণায় এ স্বপ্নের মর্ম বিবেচিত হয়। এ স্বপ্নের পরে এক সপ্তাহ হতে না হতেই এমতাবস্থায় সৈয়দ সাহেব দ্বিতীয় বার দিল্লীতে উপস্থিত হয়ে পূর্বের ন্যায় আকবর আবাদি মসজিদে অবস্থিতি স্থান স্থির করলেন। তিনি ছয় বছর কাল অরণ্যে নির্জন অবস্থায় দুপ্রকার সলুক সমাপন করে এরূপ পরিস্কৃত ও অলৌকিক হয়ে ছিলেন যে, তার প্রতিবিম্ব প্রত্যেক পবিত্র অন্তরে প্রতিফলিত হতেছিল। তখন লোক চারিদিক থেকে তাঁর দিকে ধাবিত হতে থাকে। আরও ১৬-১৯ পৃষ্ঠা কারামতে আহমদিয়া- ২৩-২৫ পৃষ্ঠা।

"মাওলানা আবদুল কাদের সাহেব উক্ত আকবরাবাদী মসজিদে অবস্থিতি করতে ছিলেন, সে সময় তিনি একদিন মাওলানা আবদুল হাই সাহেবের সাথে দেখা করতে গিয়ে ছিলেন, কথা প্রসঙ্গে নামাজের নিগূঢ়তত্ত্ব ও হুযুরে কালবের সমালোচনা হয়। মাওলানা আবদুল কাদের সাহেব বললেন— 'উক্ত বিষয়ের বিস্তারিত তত্ত্ব তাছাওয়াফ ও চরিত্র গঠন সংক্রান্ত পুস্তকে সুন্দর ভাবে বিবরণ আছে কিন্তু কামেল মোর্শেদের অসিলা ছাড়া উহা লাভ অতি সঙ্কট বরং অসম্ভব। যদি এই আগন্তুক যুবক সৈয়দ সাহেবের কাছে শিক্ষা করা যায়, তবে অতি উত্তম।' তৎশ্রবণে মাওলানা আবদুল হাই সাহেব তৎক্ষণাৎ সৈয়দ সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হয়ে গেলেন এবং তার কাছে মতলব পেশ করলেন। তখন সৈয়দ সাহেব নামাজের নিগূঢ় মর্ম ও হুযুরে কলবের বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করে বললেন—'হে মাওলানা, কেবল মৌখিক শিক্ষায় এ শ্রেষ্ঠ নিয়ামত লাভ হতে পারে না। বরং আপনি আমার সাথে মোক্তাদি হয়ে দুরাকায়াত নামাজ পড়ুন।' সে সয় মাওলানা আবদুল হাই সাহেব দণ্ডায়মান হয়ে তাঁর পশচাতে দুরাকায়াত নামাজ পড়লেন। ঐ দুরাকায়াত নামাজে নামাজের সমাপ্ত গুপ্ততত্ত্ব তাঁর পক্ষে প্রকাশ হয়ে পড়লেন। তিনি বলেন- "আমি যা উক্ত দুরাকাত নামাজে পেয়েছি তা সমস্ত জীবনে ও সমস্ত কেতাবে পাই নাই। তাঁর দুরাকায়াত নামাজে সোবহে সাদেক হয়ে গেল বরং তিনি ঐ সময় চর্ম্মচক্ষে কাবা ঘর সম্মুখে দেখিতে পেলেন। তখন তিনি তাঁর প্রেমে বিভোর হয়ে তারই হস্তে বয়অত হলেন। এ সংবাদ লোকেরা অবগত হলে, তন্মধ্যে অন্ত-অন্ধ

লোকেরা মাওলানার দুর্নাম করে বলতে লাগলেন যে, ইনি এত বড় অদ্বিতীয় আলেম ও সুবক্তা ফাজেল হয়ে একজন সামান্য লোকের মুরীদ ও সেবক হয়ে গেলেন। অতঃপর এই অন্ধরা মাওলানা শাহ আব্দুল আজীজ সাহেবকে জানালে, তিনি সৈয়দ সাহেবের উচ্চ মর্যাদার কথা প্রকাশ করে তাদিগকে সৈয়দ সাহেবের কাছে মূরীদ হতে উৎসাহিত করেন। অনেক সৌভাগ্যবানেরা তওবা করে তার কাছে মুরীদ হয়ে গেলেন। এ সময় দূর দূরের শত শত আলেম ফাজেল ও ইমানদার পুরুষ তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে মুরিদ হতে লাগলেন। মাওলানা শাহ আব্দুল আজীজ সাহেবের সমস্ত খান্দান, মৌলভী আজিমুদ্দিন, হাকিম মোঃ গিয়াছদ্দিন, হাফেজ মইনদ্দিন, মৌলুভী মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেবগণ ও তাঁর শত শত মুরীদ হযরত নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জিয়ারত লাভে ধন্য হলেন।

আরও ২১।২২ পৃষ্ঠা—

এবার সৈয়দ সাহেব দিল্লীতে অবস্থান করলেন। বহুলোক তাঁর থেকে ফয়েজ লাভ করলেন। সে সময় পার্শ্ববর্ত্তী কসবা ও শহর সমূহ হতে শত শত লোক পত্র সহ তাঁকে দাওয়াত দিতে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমরা দিল্লীতে এসে আপনার কাছে বয়অত ফয়েজ লাভ করতে পারি কিন্তু আমাদের আত্মীয় স্বজন স্ত্রী পুত্রগণ আপনার ফয়েজ হতে বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছে। তখন সৈয়দ সাহেব ঐ সব পত্রগুলো হযরত শাহ আবদুল আজীজ সাহেবের কাছে পেশ করে উক্ত কসবা ও শহরগুলির দিকে রওনা হওয়ার অনুমতি চাইলেন। সে সময় মাওলানা সাহেব আনন্দিত ভাবে নিজের পরিধেয় একটি কালো পাগড়ী ও একটি শুভ্র (সাদা) পিরহান তাঁকে স্বহস্তে পরিয়ে বিদায় দিলেন। প্রথমে তিনি ফুল্‌ত নামক পল্লীতে উপস্থিত হলেন, তথায় শাহ অলিউল্লাহ ও শাহ আহলোল্লাহ সাহেবদ্বয়ের আত্মীয় স্বজনেরা বাস করতেন। তাঁরা সকলেই সৈয়দ সাহেবের নিকট মুরীদ হয়ে গেলেন। তৎপর মোজাফফরনগর, লোহারি, সাহারানপুর, গড়মুক্তির, রামপুর, বেরেলী শাহজাহানপুর ইত্যাদি বহু শহরে আগমন করে বহু সহস্র লোককে মুরীদ করে সত্য পথে আনয়ন করেন।

আরও ৭৪ পৃষ্ঠা—

মৌলবী আবদুল আহাদ সাহেব বলেছেন, হযরত সৈয়দ সাহেবের পাক হস্তে চল্লিশ হাজারের অধিক হিন্দু ইত্যাদি অমুসলমান, মুসলমান হয়েছিল। প্রায় ৩০ লক্ষ মুসলমান তাঁর হস্তে মুরীদ হয়েছিল। আর তাঁর খলিফাগণ ও খলিফাগণের মুরীদের সংখ্যা কয়েককোটি হবে।

তাওয়ারিখে আজিবা, ১৩৯-১৪১, ৬০-৬৫ পৃষ্ঠা—

সৈয়দ সাহেবের কয়েক হাজার খলীফা ছিলেন, তাঁর অধিকাংশ খলীফা কারামতধারী অলি ছিলেন। এখানে হিন্দুস্থানের বিশিষ্ট বিশিষ্ট ৮০ জন খলীফার নাম আছে।

সম্মানীয় পাঠক / পাঠিকা এবার উপলব্ধি করুন শাহ সৈয়দ আহমাদ রহমাতুল্লাহ হাক্কানী রব্বানী পীর ছিলেন কি না। তিনিই ছিলেন গাজীয়ে বালাকোট, কুতবুল আলম হযরত শাহসূফী নূর মুহাম্মদ নিয়ামপুরী (যিনি মলিয়াসে বর্তমান মিঠানালা) শায়িত বুযর্গ পীর ও মুর্শিদ। অস্বীকারকারীদের হেদায়েত করুন। তাদের প্রতি উপযুক্ত বিধান প্রদান করুন। ইয়া রব্বাল আলামীন। আমীন।

আল্লামা রূহল আমিন রহমাতুল্লাহ কারামতে আওলিয়া পুস্তকে ৮১-৮৫ পৃষ্ঠা কোলকাতা মাদ্রাসা আলীয়ার মোদার্রেস সাহেবান কর্ত্তৃক মূদ্রিত ফাতাওয়ার উল্লেখ করে লিখেছেন—

প্রশ্ন ঃ— এক ব্যক্তি বলে যে, জনাব সৈয়দ আহমদ সাহেব মরহুম যিনি মাওলানা কারামত আলী মরহুম মর্গফুরের মোর্শেদ ছিলেন। মোহাম্মদী অহাবী ছিলেন। আর এক ব্যক্তি বলে যে, জনাব আমিরুল মোমেনীন মাওলানা গাজী সৈয়দ আহমদ সাহেব খাঁটি হানাফি ছিলেন। তিনি কিছুতেই লামজহাবী ছিলেন না।

উত্তর ঃ মাওলানা সৈয়দ আহমদ সাহেব ছালেক ও অলিদিগের নেতা ছিলেন। তিনি সুন্নতল জামায়াতভূক্ত ছিলেন। চারি মজহাব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, ইহা তাঁহার মলফুজাত হইতে প্রমাণিত হয়। তাঁহার শিষ্য মাওলানা কারামত আলী সাহেব কুওয়াতোল ঈমান ও নছিমোল হারামাত্রনে অহাবি লামজহাবিদের প্রতিবাদ করিয়াছেন। আরব, আজম, হিন্দুস্থান ও বাঙ্গালার জাহেরী ও বাতেনী কামালত পূর্ণ বড় বড় অদ্বিতীয় আলেমগণ যাহাদের দ্বারা শেরক বেদয়াত দূরীভূত হইয়াছে, তাঁহারা উক্ত সৈয়দ সাহেবের মুরিদ ছিলেন।

তাঁহারা সকলেই মাজহাবলম্বী ছিলেন। আর হযরত সৈয়দ সাহেব, হজরত মাওলানা আবদুল আজীজ সাহেবের খাস শিষ্য ছিলেন। যে ব্যক্তি এইরূপ তরিকত ও শরিয়তের হাদী, শহীদ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বংশধর ও কামেল মোর্শেদের উপর অযথা অপবাদ প্রয়োগ করে সে ব্যক্তি গোনাহগার বদকার মিথ্যাবাদীও অপবাদকারী ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে ব্যক্তি এই ধ্রুব সত্যকে অস্বীকার করে, তবে সে ব্যক্তি ভ্রান্ত, সত্যপথ ভ্রষ্ট।

সৈয়দ আবদুর রসিদ

(ষষ্ঠ মোদাররেস মাদ্রাসা আলিয়া কোলকাতা)

বিচক্ষণ মুফতী যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সত্য, সৈয়দ সাহেবের সম্বন্ধে ইহার বিপরীত ধারণা করা ভ্রান্তি ও (গোমরাহি)।

মোহাম্মদ আব্দুল গণি

চতুর্থ মোদার্রেস মাদ্রাসা আলিয়া কোলকাতা।

আল্লাহতায়ালা জনাব সৈয়দ সাহেব রহমাতুল্লাহর দ্বারা বহু মুসলমানকে বেদয়াত হইতে মুক্ত করিয়া উজ্জ্বল সুন্নতের দিকে হেদায়েত করিয়াছেন। যে ব্যক্তি তাঁহার অনুস্মরণ করিয়াছে, সত্যপথ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে একজন মাওলানা ক্বারী হাফেজ হাজী কারামত আলি জৌনপুরী। দ্বিতীয় হাফেজ হাজী গাজী মাওলানা জামালুদ্দীন সাহেব ছিলেন, যে ব্যক্তি তাহাদের বিরুদ্ধচারণ করিবেন এবং তাহাদের হেদায়েতের প্রতি ইনকার করিবে, সে ব্যক্তি মেধাহীন, গোমরাহ এবং হেদায়েত ও সত্য পথভ্রষ্ট।

মোহাম্মদ এছমাইল

(অষ্টম মোদার্রেস মাদ্রাসা আলিয়া কোলকাতা

"দ্বীনদারগণের শিরভূষণ,পরহেজগারগণের অগ্রণী, প্রবীন হাদী শ্রেণীর আদর্শ, প্রবীন অলিগণের নেতা সৈয়দ আহমদ রহমাতুল্লাহ হানাফি ধর্ম্মভীরু, অলিউল্লাহ ও উজ্জ্বল শরিয়তের আলেম ছিলেন। ছোট বড় সকলেই তাহা কর্ত্তৃক সত্য পথ প্রাপ্ত হইয়াছে। যে ব্যক্তি তাঁহার হেদায়েত গ্রহণ করিয়াছেন, সে ব্যক্তি তরিকত ও শরিয়তের নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইয়াছে।

আহমদুল্লাহ

(সপ্তম মোদার্রেস মাদ্রাসা আলিয়া কলিকাতা)

জনাব সৈয়দ আহমদ সাহেব ও মাওলানা কারামত আলি সাহেব ধর্ম্মভীরু ও পরহেজগার ছিলেন, তিনি অহাবী ছিলেন না।

মোহাম্মদ আশরাফ

(নবম মোদার্রেস, মাদ্রাসা আলিয়া কোলকাতা আলি জনাব মাআলি আলকব, জাহেরী বাতেনী কামালতের অধিকারী, দ্বীন ও দুনিয়াবী গুণাবলীর ভাণ্ডার, বেদয়াত ধ্বংসকারী, শরিয়ত প্রচারক, জামানায় গওছ জামানার অদ্বিতীয় ও আল্লাহতায়ালা হইতে সাহায্য প্রাপ্ত জনাব হজরত সৈয়দ আহমদ রহমাতুল্লাহ ছুন্নি হানাফী ছিলেন, তাঁহার খলীফা আলেমে রব্বানী ও অদ্বিতীয় ফাজেল জনাব মৌলভী কারামত আলী মরহুম মগফুর ও হানাফী মজহাবাবলম্বী ছিলেন, কখনও কেহ যেন উক্ত দুই বোজর্গের সম্বন্ধে বাতীল ধারণা না করেন।

বেলায়েত হোছাএন

(দ্বিতীয় মোদার্রেস মাদ্রাসা আলিয়া কোলকাতা)

জনাব হজরত অলিগণের শিরোভূষণ সৈয়দ আহমদ রহমাতুল্লাহ বড় দরের অলি হানাফী মজহাবাবলম্বী ছিলেন। এই সমুজ্জ্বল সূর্য্য দ্বারা একটি জগত আলোকময় হইয়াছে, যে কেহ তাঁহার দূর্ণাম ও অপবাদ করে, সে ব্যক্তি গোমরাহ (ভ্রান্ত) ভ্রান্তকারী, অপবাদকারীকে এইরূপ কুধারণা হইতে তওবা করা উচিৎ।

গোলাম ছালমানী আব্বাসী

(চতুর্থ মোদার্রেস, মাদ্রাসা আলীয়া কোলকাতা)

জনাব সৈয়দ আহমদ মরহুম ও মৌলভী কারামত আলী মরহুম অতিশয় ধর্ম্মভীরু ও পরহেজগার ছিলেন। বহু সহস্র লোক তাঁহার সঙ্গলাভে সত্যপথ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেহ যেন কিছুতেই তাঁহাদের সম্বন্ধে কুধারণা পোষণ না করেন, নচেৎ নিজের ক্ষতি সাধন করিবেন।

ছায়াদাত হোছাএন

(তৃতীয় মোদার্রেস মাদ্রাসা আলীয়া কোলকাতা)

ছালেকদিগের অগ্রণী ও অলিগণের নেতা, হজরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ রহমাতুল্লাহ আলায়হেকে অহাবী বলা একেবারে মিথ্যা অপবাদ। দ্বীনের বোজর্গগণের দুর্নাম ও অপবাদ করা অন্যায় আচরণ ও গোমরাহী। হজরত মাওলানা যে বড় দরের অলি ছিলেন, ইহা অতি প্রকাশ্য ও জ্বলন্ত সত্য কথা। প্রবীন প্রবীন আলেম ও ফকিহগণ তাঁহার অনুস্মরণ (তাবেদার) করিয়াছিলেন। ইহাই উক্ত কথার প্রকাশ্য ও অকাট্য দলীল।

আহমদ

প্রথম মোদার্রেস, মাদ্রাসা আলীয়া কোলকাতা)

আরও ৮জন মাওলানা ও এমাম উক্ত ফাতওয়া সমর্থনে স্বাক্ষর

২০০৮ সালে সরেজমিনে হযরত ওয়সী পীরের জন্ম স্থান ও বংশ পরিচয় নির্ণয়ে বিশিষ্ট সাংবাদিক ও গ্রন্থকার আহমদ মমতাজের প্রতিবদেন

পরিশিষ্ট-৩

ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্ত ও সরেজমিনে সাক্ষ্য প্রমাণের আলোকে কুতুবুল ইরশাদ সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়াইসির জন্মস্থান ও বংশধর প্রসঙ্গ

।। আহমদ মমতাজ।।

প্রাক কথন ঃ

বাংলাদেশ ইসলামের প্রবেশদ্বার ও সর্বশ্রেষ্ঠ উলামা কেন্দ্র হিসেবে সমগ্র বিশ্বে চট্টগ্রামের নাম সর্বজন বিদিত এবং এখানকার মানুষ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত মতে খ্রীষ্টিয় ৮ম-৯ম শতকে এখানে মুসমানদের আগমন ঘটলেও ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র এবং প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্র হিসেবে চট্টগ্রামের খ্যাতি ও পরিচিতি আরো বহু শত বছর আগে। সে সাথে বিশেষভাবে স্বরণযোগ্য যে, চট্টগ্রামের এ সুখ্যাতি ও মর্যাদার পেছনে উল্লেখযোগ্য অবদান আরবজাহান সহ বিশ্বের মুসলিম দেশের ব্যবসায়ী, পর্যটক, ধর্মপ্রচারক এবং বিশেষত ভূগৌলবিদও ইতিহাস বেত্তাগণের।

ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আরব দেশের খ্যাতি ছিল বিশ্বব্যাপী। আরবীয় বণিকগণ প্রাচীনকাল থেকে চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে আরাকান, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া, সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও ও শ্যাম দেশ (থাইল্যাণ্ড) হয়ে চীন পর্যন্ত গমনাগমণ করে পণ্য সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় করতেন। ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের পর মুসলিম ধর্ম প্রচারকগণ দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়েন এবং বণিকদের সাথে পণ্যবাহী জাহাজ চড়ে কেউ কেউ চট্টগ্রাম হয়ে বার্মা আরাকান সহ উল্লেখিত অঞ্চল সমূহে ধর্ম প্রচার শুরু করেন। পরবর্ত্তী আরকান অধিকৃত হওয়ার পর চট্টগ্রাম আরাকান একই রাষ্ট্র হয়ে যায়। সমগ্র চট্টগ্রাম ধীরে ধীরে ইসলামী শিক্ষা দীক্ষায় অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়, যার প্রভাব বার্মা ও আরাকানে বিস্তার লাভ করে।

চট্টগ্রাম ও বার্মা ও আরাকানে ইসলামের প্রথম প্রচারক হলেন হযরত বদর শাহ ও তাঁর সঙ্গীরা। যাঁদের চার আউলিয়া নামে অভিহিত করা হয়। চট্টগ্রাম শহরের লালদীঘির পূর্ব প্রান্তে তাঁর মাজার শরীফ বা সমাধি রয়েছে। বার্মার আরাকান থেকে

কক্সবাজার হয়ে চট্টগ্রাম শহর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে তাঁর স্মৃতি বিজাড়িত 'বদর মোকাম'রয়েছে। যেখানে ছিল মসজিদ, খানকাহ্ ও দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এমনকি ভারতের আসাম রাজ্যের বদরপুরে হযরত বদর শাহ'র একটি স্মারক দরগাহ শরীফ রয়েছে। বদরপুর হযরত বদর শাহের নামানুসারে হয়েছে বলে জানা যায়। যেখানে ইসলাম প্রচারে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল বলে গবেষকদের অভিমত। ঐতিহাসিকদের মতে, হযরত বদর শাহ রহমাতুল্লাহ ইসলাম প্রচারক বিজেতা হযরত শাহ জালাল ইয়েমেনী রহমাতুল্লাহ এর সঙ্গী ৩৬০ জন আউলিয়ার অন্যতম ও 'তরফ' রাজ্য বিজেতা হযরত শাহ বদর এবং চট্টগ্রাম আরাকানে ইসলাম প্রচারক হযরত বদর শাহ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে মনে করেন। অবশ্য কেউ কেউ চট্টগ্রাম বিজেতা ও ইসলাম প্রচারক হযরত বদর শাহকে ভারতের বিহারে, সমাধিস্থ হযরত বদরুদ্দীন আল্লামা বা পীর বদর একই ব্যক্তি এবং চট্টগ্রামের বদরপট্টির সমাধি বা মাজার শরীফ, আস্তানা শরীফ ? বলে (হযরত বদর শাহের কবর নয়) মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর আবদুল করিম ও অন্যান্য বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ গবেষকদের অভিমত ও তথ্য উপাত্ত মতে, চট্টগ্রামের বদরপট্টিতে হযরত বদর শাহ রহমাতুল্লাহ সমাহিত আছেন এবং বিহারের উল্লেখিত বদরপীর সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি। (উপরোক্ত বিষয়ে আমার লিখিত চট্টগ্রামের সূফী সাধক দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা-২০৫-২৩৯ দ্রষ্টব্য)।

আজ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত মতে, চট্টগ্রামে মুসলিম শাসন ব্যবস্থা কায়েম হয় ১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ এর নির্দেশে সেনাপতি কদল খাঁ গাজীর যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে। যুদ্ধে হযরত বদর শাহ ও অন্যান্য সূফীগণ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। অতপর চট্টগ্রামে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি দ্রুত বিস্তার লাভ করে। ইসলামী শিক্ষা দীক্ষা তথা কুরআন হাদীস শিক্ষা দেওয়ার জন্য চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় বহু দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ধর্ম প্রচারকদের সাথে বহু সংখ্যক কুরআন ও হাদীস শাস্ত্রবিশারদ আলেম ওলামা চট্টগ্রামে আগমণ করেন, যাঁদের প্রায় সবই আরব-ইয়েমেন, ইরান ও মধ্য এশিয়া থেকে। পশ্চিম ও উত্তর ভারত থেকেও অনেকে আসেন। এঁদের অনেকেই চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সম্পদ এবং আধ্যাত্মিক মোহে বসতি স্থাপন ও পারিবারিক জীবনে আবদ্ধ হন বংশপরম্পরায় দ্বীনের সেবা কাজ চালিয়ে যান। চট্টগ্রামের সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে যাঁদের প্রভাব আজো বিদ্যমান।

জন্ম ও বংশ পরিচয় ঃ—

চট্টগ্রামের বিস্তীর্ণ আঞ্চলে এমন অসংখ্য আলেম ওলামা দ্বীন ইসলাম ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর খেদমতে আত্মনিয়োগ করেছেন। দক্ষিণ চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার (সাবেক সাতকানিয়া থানা) আমিরাবাদ মৌজার সৈয়দ মহল্লায় অধিবাসী সৈয়দ ওয়ারেশ আলী (রহঃ) সে সকল খ্যাতিমান আলেম ওলামাদের অন্যতম যিনি একাধারে আরবী-ফারসী ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। অন্যদিকে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে এবং জেহাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। ১৮০১ স্মলে তিনি কলকাতাস্থ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ফারসী বিভাগের শিক্ষক (মতান্তরে মুন্সী) ছিলেন বলে জানা যায়। তিনি সৈয়দ হারিস আলীর প্রপৌত্র সৈয়দ ওয়ায়েস আলীর পৌত্র ছিলেন। পূর্বপুরুষদের কেউ একজন বাগদাদ থেকে দিল্লী হয়ে চট্টগ্রামের আমিরাবাদে বসতি স্থাপন করেন। এই সৈয়দ বংশের লোকেরা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তায়ালা ওয়াআলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা বিবি ফাতেমা (রাঃ) এবং সে সূত্রে হযরত বড়পীর গওসে সামদানী, মাহবুবে সোবহানী, সাইয়্যেদেনা মহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী সৈয়দ এর বংশধর।

বিভিন্ন ইসলামী পণ্ডিত ও সুফীতাত্ত্বিক গবেষকদের মতে, আমিরাবাদের এই সৈয়দ পরিবারের কোন এক পূর্বপুরুষ ইরাকের বাগদাদ শরীফ থেকে আফগানিস্থান হয়ে দিল্লীতে আগমন করেন, অতপর সেখান থেকে চট্টগ্রামের (মোঘল আমলে ইসলামাবাদ) দক্ষিণে আমিরাবাদ এসে বসতি স্থাপন করেন। বংশপরম্পরায় তাঁরা দ্বীন-ইসলাম ও জনগণের খেদমত করেছেন। সৈয়দ মহল্লায় ওসমান দীঘির পাড়ে এই বংশের লোকদের কবর রয়েছে। সৈয়দ বংশের কোন কোন লোক তাঁদের জীবদ্দশায় ও মৃত্যু পরবর্তীতে বুজুর্গী ও কেরামতির জন্য সুখ্যাতি অর্জন করেছেন, তন্মধ্যে গাজী মুহাম্মদ ওসমান ও হযরত ইবরাহিম আলমাদানী রহমতুল্লাহ অন্যতম। প্রথম জন দিল্লীর সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে (১৬২৮-৫৮) রাজকীয় পদের অধিকারী ছিলেন। (**সুফী সম্রাট হযরত ওয়সী রহমতুল্লাহ-ড. আহমদ আলী কলকাতা পৃষ্ঠা-১০**)। আমিরাবাদের সৈয়দ মহল্লায় ওসমানের দীঘি তাঁর স্মৃতি বহন করছে। এই দীঘির দক্ষিণ পাড়ে রয়েছে হযরত ইবরাহিম আল মাদানীর মাজার শরীফ। জনশ্রুতি ও বিভিন্ন লেখকের মতে তিনি গাজী ওসমানের অধঃস্তন এবং

স্থানীয় সৈয়দ বংশের পূর্বপুরুষ। তাঁর বেশ কয়েকজন সঙ্গী ছিলেন। যাঁরা ধর্মপ্রচার ও মানব কল্যাণে জীবন অতিবাহিত করেছেন। চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে তাঁদের মাজার শরীফ রয়েছে। তন্মধ্যে হযরত আমির আলী শাহ্ ওরফে মুল্লুক শাহ্ (আমিরাবাদ গ্রামের মুল্লুকের দীঘির দক্ষিণে রাস্তার পাশে উঁচু স্থানে মাজার), সৈয়দ আবু মুসা প্রকাশ শাহ পীর (দরবেশ হাট, লোহাগড়), শাহ মোয়াজ্জেম (কাখাড়া, চকরিয়া) অন্যতম। হযরত ইবরাহিম আল মাদানী রহমতুল্লাহ এর অনেক কেরামতির কথা জানা যায়। এই নিবন্ধ লেখক বিগত ২৯-৩০ অক্টোবর ২০০৮ সরেজমিনে গ্রন্থকারের সাথে আমিরাবাদ গিয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের মুখে হযরত ইবরাহিম আলমাদানী রহমতুল্লাহ এর মাজার জেয়ারতকারীদের শারিরীক অসুস্থতা ও বিপদ-আপাদ থেকে মুক্তি সহ নানা কেরামতির কথা জানতে পারেন। সৈয়দ মহল্লার প্রাচীন জামে মসজিদটি ওসমানদীঘির পশ্চিমপাড়ে অবস্থিত ছিল। ৭০-৮০ বছর আগে মাটির তৈরী এই মসজিদটি ভেঙ্গে যায়। সেস্থানে কবর স্থান গড়ে উঠেছে। দীঘির কিছু দূর দক্ষিণে স্থাপন করা হয়েছে পাকা মসজিদ। মসজিদের ইমাম সাহেবদের (অতীত ও বর্তমানের) অনেকের মতে ওসমান দীঘির পাড়ে অবস্থিত হযরত ইবরাহিম আল মাদানী ছিলেন একজন সুফী ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতার অধিকারী। শতাধিক বছর পূর্বে দোহাজারী থেকে হযরত লুধি ফকির নামে একজন আধ্যাত্মিক সাধক এসে হযরত ইবরাহিম মাদানীর মাজার স্থান চিহ্নিত করেন। ধারণা করা হয় এই গাজী ওসমান ও হযরত ইবরাহিম আল মাদানী রহমতুল্লাহ এর অধঃস্থন বংশধর হচ্ছেন হযরত শাহসূফী সৈয়দ ওয়ারেস আলী রহমতুল্লাহ ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র কুতুবল ইরশাদ, রাসুলে নোমা পীর, শাহ সুফী সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়াইসী রহমতুল্লাহ। হযরত সৈয়দ ওয়ারেস আলী পূর্বপুরুষের মতই আরবী ও ফারসী ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম পর্বে ইংরেজ সিভিলিয়ানদেরকে ফারসী শিক্ষাদানের জন্য কলকাতায় দশজন বিশিষ্ট ফারসী ভাষায় শিক্ষিত ব্যক্তিকে নিয়োগ দেয়, তন্মধ্যে একজন ছিলেন হযরত ওয়ারেশ আলী (শানে ওয়াইসি-আহমেদুল ইসলাম চৌধুরী পৃষ্ঠা-৩৯) পরবর্তীতে তিনি উনিশ শতকের প্রথমার্থে ভারতের মুসলমানদের পুনর্জাগরণের অগ্রদূত ও শিখ-ইংরেজ কর্তৃক নির্যাতিত মুসলমানদের রক্ষাকল্পে ভারতবর্ষে মুসলমানদের জেহাদী আন্দোলনের মহান নেতা হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (১৭৭৬-১৮৩১) এর

শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও যুদ্ধে যোগ দেন। উল্লেখ্য যে, পাঞ্জাবের শাসক রণজিৎ সিং এর অত্যাচার থেকে মুসলমানদের রক্ষার জন্য ১৮২৬ সালের ২০ডিসেম্বর শিখদের বিরুদ্ধে আকোড়ার যুদ্ধ ও ১৮২৯ সালের জুন মাসে পাঞ্জতারের যুদ্ধ এবং ১৮৩১ সালের ৬ই মে, ১২৪৬ হিজরী রোজ শুক্রবার বালাকোট প্রান্তরে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সৈয়দ ওয়ারেশ আলী কলকাতায় থাকাকালে হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (রহমাতুল্লাহ এর শিষ্যত্ব ও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। হযরত বেরেলভী ১৮২৬ সালে ১৭ জানুয়ারী তাঁর তৃতীয় ও জীবনের শেষ সফরে বের হন, সঙ্গে ছিল বিশাল এক মুজাহিদ বাহিনী। সে বাহিনীর অন্যতম সদস্য ছিলেন চট্টগ্রামের আমিরাবাদ নিবাসী সৈয়দ ওয়ারেশ আলী বাঙ্গালী ও মীরসরাই'র মলিয়াইশ নিবাসী সুফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী রহমাতুল্লাহ। ১৮২৯ সালে অনুষ্ঠিত পাঞ্জতারের যুদ্ধে সৈয়দ ওয়ারেশ আলী ও ১৮৩১ সালে বালাকোট প্রান্তরে শাহাদাত বরণ করেন সৈয়দ আহমদ বেরেলভী রহমাতুল্লাহ। তবে সৈয়দ ওয়ারেশ আলী বাঙ্গালী তাঁর পীরের সাথে একই যুদ্ধে অর্থাৎ বালাকোট যুদ্ধে শহীদ হন বলে কোন কোন গ্রন্থে উল্লেখ আছে (সীরাতে ওয়সী মুহাঃ মুবারক আলী রহমানী, কলকতা, আয়নায়ে ওয়সী ড. মতিউর রহমান প্রভৃতি)।

হযরত সৈয়দ ওয়ারেশ আলী (রহঃ) এর শাহাদাতের সময় স্ত্রী সৈয়দ সাঈদা খাতুন (মতান্তরে শাহেদা খাতুন) ও দুই পুত্র এক কন্যাকে জন্মস্থান আমিরাবাদের সৈয়দ মহল্লায় রেখে যান। পুত্র কন্যারা হলেন যথাক্রমে সৈয়দ সালেহা খাতুন, সৈয়দ সালেহ আলী ও সৈয়দ ফতেহ আলী। সৈয়দ মহল্লা চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলাধীন (তৎকালীন সাতকানিয়া) আমিরাবাদ ইউনিয়নের আমিরাবাদ গ্রামের অন্তর্ভূক্ত। চট্টগ্রাম কক্সবাজার সড়কে আমিরবাদ একটি সুপ্রসিদ্ধ স্থান, ব্যবসা বাণিজ্য সহ ঐতিহাসিক তাৎপর্যের কারণে এই গ্রামের নাম দেশের সীমানা ছাড়িয়েছে। এ স্থান থেকে ১ মাইল উত্তর-পশ্চিমে সৈয়দ মহল্লা অবস্থিত। সৈয়দ মহল্লার উত্তরে উত্তর মুহরী পাড়া পূর্বে পূর্ব মুহুরী পাড়া দক্ষিণে ডেটার পাড়া ও পশ্চিমে পালপাড়া রয়েছে, এছাড়া বেশ কিছু পাড়া মিলিয়ে আমিরাবাদ গ্রাম।

সৈয়দ পাড়ার সৈয়দ বাড়িতে সৈয়দ ফতেহ আলীর জন্ম। তবে নির্দিষ্ট সন ও তারিখ অজ্ঞাত। ইতিহাস গবেষক, শায়খুল মাশায়েখ, খ্যাতিমানপীর ও সুফী

তাত্ত্বিক গবেষকদের মতানুসারে হযরত শাহ সুফী সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়াইসীর জন্ম তাঁর পিতার ১৮২৬ সালের জেহাদের যোগদানের বছর খানেক পূর্বে অর্থাৎ ১৮২৫ সাল নাগাদ। বিশেষ করে হযরত ওয়াইসীর প্রিয় ও প্রধানতম খলিফা ফুরফুরার মোজাদ্দেদে জামান হযরত আবু বকর সিদ্দিকি রহমাতুল্লাহ এর জবানে শুনে এবং বিশ্বস্ত সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে যাচাই বাছাই পূর্বক তাঁরই খলিফা ও জীবনী লেখক আল্লামা রুহুল আমিন রহমাতুল্লাহ তাঁর দাদা পীর হযরত সুফী ফতেহ আলীর জীবনী লিখেছেন সর্ব প্রথম। সে সময় হযরত ওয়াইসী পীরের বুজুর্গ কন্যা সৈয়দ যোহরা খাতুন এবং হযরত ওয়াইসী রহমাতুল্লাহ এর অন্যতম খলিফা হযরত শাহ সুফী একরামুল হক প্রমূখ জীবিত ছিলেন। তাই হযরত আল্লামা রুহুল আমিন রহমাতুল্লাহ এর লেখা অধিকতর গ্রহণযোগ্য বিবেচনার দাবী রাখে। পিতার জেহাদী আন্দোলন ও যুদ্ধে যোগদানের সময় দ্বিতীয় পুত্র সৈয়দ ফতেহ আলী এক বছরের শিশু ছিলেন।

বংশধর প্রসঙ্গে সরেজমিন প্রতিবেদন ঃ

ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, আরবী, উর্দু ও ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত হযরত মাওলানা সৈয়দ ওয়ারেস আলী রহমাতুল্লাহ কর্মসূত্র, ইসলামের প্রচার, প্রসার এবং সংস্কার আন্দোলনে জড়িত থেকে কলকাতায় অবস্থান করছিলেন। তিনি সেখান থেকে জেহাদে শরীক হন। সে সময় জন্মস্থান ও পৈত্রিক ভিটায় বিদূষী স্ত্রী সৈয়দা সাঈদা খাতুন দুই পুত্র সৈয়দ সালেহ আলী, সৈয়দ ফতেহ আলী ও কন্যা সালেহা খাতুনকে নিয়ে অবস্থান করছিলেন। সেকালে লোক মাধ্যম কিম্বা পত্র যোগাযোগ ব্যতীত যোগাযোগের অন্য কোন বিকল্প ছিল না। ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম অংশে জেহাদে অংশগ্রহণকারী স্বীমার শাহাদাতের সময় কিছু কমবেশী ছাব্বিশ শ' কিলোমিটার দূরে অবস্থানরত সৈয়দা সাঈদা খাতুনের নিকট পৌঁছতে মাসাধিককাল এমনকি বছর সময়ও লেগেছিল ধারণা করা যায়।

সৈয়দ ওয়ারেশ আলী রহমাতুল্লাহ এর শাহাদাতের খবর পাওয়ার পর আরো কিছুকাল সৈয়দা সাঈদা খাতুন আমিরাবাদে অবস্থান করেন। কনিষ্ঠ সন্তান সৈয়দ ফতেহ আলীর বয়স ছিল খুব কম। ১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়ে থাকলে মাত্র চার বছর বয়সে পিতৃহারা হন। সংসারে অসচ্ছলতা ছিল। কিছুকাল সন্তানদের নিয়ে সৈয়দ সাঈদা খাতুন পিত্রালয়ে অবস্থান করেন এবং ফতেহ আলী ওয়াইসী রহমাতুল্লাহ

প্রাথমিক শিক্ষা মাতুলালয়ে পেয়েছিলেন বলে কোন কোন গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায়। (সীরাতে ওয়সী মুহাঃ মুবারক আলী রহমানী, কলকাতা -২০০৭ পৃষ্ঠা-৫) চট্টগ্রাম অঞ্চলের ঐতিহ্য এই যে, স্বামীর অকাল মৃত্যু হলে বা আর্থিক সহ বিভিন্ন সংকট সময়ে মেয়েরা পিত্রালয়ে বা ভাই বোন সহ আত্মীয় স্বজনের সহানুভুতি বা সহযোগিতা পেয়ে থাকেন।

হযরত ফতেহ আলী রহমাতুল্লাহ এর জীবনী ছাপার অক্ষরে প্রথম প্রকাশ করেন হযরত আল্লামা রুহুল আমিন রহমাতুল্লাহ। তিনি লিখেছেন হযরত ওয়ারেশ আলী রহমাতুল্লাহ এর তিন সন্তানের কথা যাঁদের প্রথম জন কন্যা সন্তান সৈয়দা সালেহা খাতুন দ্বিতীয় সৈয়দ সালেহ আলী ও তৃতীয় জন সৈয়দ ফতেহ আলী। কিন্তু এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত মতে শেষোক্ত জন অর্থাৎ শাহ সুফী সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়াইসী (রহঃ) ব্যতীত অন্যভাই সম্পর্কিত কেবল বিভ্রান্তিমূলক তথ্য মেলে। ফুরফুরা শরীফের ইতিবৃত্ত, হায়াতে একরাম; সীরাতে ওয়সী, সেজলা হুজুরের জীবনী, হয়াতে আহমাদুল্লাহ সহ বহু গ্রন্থের লেখক, ফুরফুরা শরীফের বিশিষ্ট খলিফা মুহাঃ মুবারক আলী রহমানী এই দু'ভাই বোনের ব্যাপারে তেমন কোন তথ্য উল্লেখ করেননি। তিনি ও কলকাতার মানিকতলা শাহসুফী ফতেহ আলী ওয়াইসী রহমাতুল্লাহ দরবারস্থ নুরীয়া ফতেহীয়া সিদ্দিকীয়া ফাউণ্ডেশনের অন্যমত কর্ণধার জনাব কাজি মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ সহ বিগত ২৯-৩০ অক্টোবর আমিরাবাদ সফরকালে মল্লিক সোবহান গ্রামে গিয়ে হযরত ওয়াইসী পীর সাহেবের কথিত বংশধর হাজী আবুল কাশেম চৌধুরীর সাক্ষাতে জানা যায় হযরত ওয়ারেশ আলী শহীদ রহমাতুল্লাহ এর জ্যেষ্ঠ্য কন্যার অকাল প্রয়ান ও দ্বিতীয় সন্তান সৈয়দ সালেহ আলির রেঙ্গুনে গমন ও সেখানে অজ্ঞাত বাসের কথা। যদিও এর সমর্থনে কোন উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ কেউ দিতে পারেনি।

এছাড়া কলকাতা থেকে প্রকাশিত ড. সেখ আহমদ আলী লিখিত সুফী সম্রাট হযরত ওয়সী রহমাতুল্লাহ পুস্তিকা মতে, সৈয়দ সালেহ আলী যিনি চট্টগ্রামের গভীর জঙ্গলে যে ধ্যানে গিয়েছিলেন বাড়িতে আর ফেরেননি। সম্ভবত তিনি রেঙ্গুনে (বার্মা) চলে গিয়েছিলেন। বর্তমানে তাঁর বংশধরেরা সেখানেই বসবাস করছেন। একথা জানিয়েছেন তাঁরই বংশের এক শাখা জনাব আশরাফ আলী চৌধুরী সাহেব।

এক বোনের নাম সালেহা খাতুন শৈশবেই তাঁর মৃত্যু হয়। '(পৃষ্ঠা-২) তাঁর বর্ণিত একথা জানিয়েছেন.......... আশরাফ আলী চৌধুরী সাহেব'' - তথ্যটিই বিভ্রান্তিমূলক। জনাব চৌধুরী উক্ত তথ্য কাকে, কখন কোথায়, জানিয়েছেন তাঁর কোন উল্লেখ নেই। লেখক সেখ আহমাদ আলী সাহেব বা হাজী আবুল কাশেম চৌধুরী এঁদের কাউকেই নিশ্চয়ই নয়। কারণ আশরাফ আলী চৌধুরী বর্তমানে ৭৬ বছর বয়স্ক হাজী আবুল কাশেম চৌধুরীর পিতামহ ছিলেন, যিনি ১৯০৪ সালের দিকে মারা যান (হাজী আবুল কাশেম চৌধুরীর সাক্ষাৎকার ৩০ অক্টোবর ২০০৮) ।

অপর একজন লেখক তাঁর 'শানে ওয়াইসী' পুস্তকে লিখেছেন 'হযরত সাইয়েদা সালেহা খাতুনের দাম্পত্য জীবন কোথায় গড়েছে তথা শ্বশুরবাড়ী কোথায় তা জানতে পারা যায়নি।........ তথ্য তালাশে আরও জানতে পারি হযরত সাইয়েদ সালেহ আলী রহমতুল্লাহ অবিবাহিত ছিলেন। সম্ভবত তিনিই মায়ানমারে হিজরত করেন। (আহমদুল ইসলাম চৌধুরী পৃষ্ঠা-৩৫-৩৬)।

অর্থাৎ এই দু'ভাই বোন সম্পর্কিত এ সকল তথ্য মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকি স্ব-বিরোধিতায় পূর্ণ। অপরদিকে হযরত ফতেহ আলী ওয়াইসী রহমতুল্লাহ এর সুযোগ্য খলিফা ও তাঁর কন্যার জীবদ্দশায় ও তাঁদের নিকট থেকে তথ্য প্রাপ্ত হয়ে যাঁরা হযরত ওয়াইসী পীর রহমতুল্লাহ এর জীবনী কাহিনী রচনা করেছেন সেখানে এই সংক্রান্ত তথ্য বিবরণ পাওয়া যায় না। অতএব কাগজপত্র বা যাচাই বাছাই মূলক সুনির্দিষ্ট তথ্য বিবরণ ব্যতীত কারো ধারণা মূলক বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হতেপারেনা।

দ্বিতীয় হযরত ওয়ারেশ আলী রহমতুল্লাহ এর উক্ত দু'জন পুত্র ও এক কন্যা ব্যতীত আরো এক পুত্রের সম্প্রতি আবিস্কার হয়েছে। উপরোক্ত ড. সেখ আহমাদ আলী ও সুরেশ্বর দায়রা শরীফ থেকে শাহসুফী সৈয়্যেদ নূরে আখতার হোসাঈন আহমদীনরা কর্তৃক প্রকাশিত হযরত সুফী সৈয়্যেদ জানে আলম বঙ্গানুবাদকৃত হযরত সৈয়দ ফতেহ আলী রচিত দিওয়ানে ওয়াইসী গ্রন্থে এই বিষয়ে আলোকপাত করা না হলেও চট্টগ্রামের আহমদুল ইসলাম চৌধুরী তাঁর 'শানে ওয়াইসী বইয়ে হযরত সুফী ফতেহ আলী রহমতুল্লাহ এর অন্য এক ভাই ছিলেন বলে লিখেছেন। যদিও

তিনি এই ভাইয়ের নাম না দিয়ে সাইয়্যেদ আশরাফ আলীর পিতা লিখেছেন (পৃষ্ঠা-৩৬) এবং ''অপর ভ্রাতা তথা সাইয়্যেদ আশরাফ আলী চৌধুরীর পিতার ওয়ারিশরা বর্তমান মল্লিক সোহবান গ্রামে বসবাসরত। (পৃষ্ঠা-৩৫) ২৯ ও ৩০ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত মানিকতলা সুফী ফতেহ আলী ওয়াইসী দরবার শরীফের দায়িত্বশীল হাক্কানী আলেম গবেষকদ্বয় সহ দু'দিনব্যাপী আমিরাবাদের সৈয়দ মহল্লা ও মল্লিক ছোবহান গ্রামে সরেজমিনে অবস্থান করে গ্রামবাসী, প্রধান আলেম-ওলামা ও সংশ্লিষ্ট পরিবারের দায়িত্বশীল সদস্যদের সাথে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করেছি। সৈয়দ ওয়ারেশ আলীর কথিত তৃতীয় পুত্র সম্পর্কে মল্লিক ছোহবান গ্রামের মৃত হাবিবুর রহমান চৌধুরীর (১৯৬৫ খ্রীঃ) পুত্র হাজী আবুল কাশেম চৌধুরী (৭৬) জানান, উক্ত ব্যক্তির নাম সৈয়দ রমজান আলী। যাঁকে শানে ওয়াইসী বইয়ের লেখক আশরাফ আলী চৌধুরীর পিতা বলেছেন কিন্তু সৈয়দ রমজান আলী যে সৈয়দ ওয়ারেশ আলীর কথিত তৃতীয় পুত্র সন্তান বা ফতেহ আলী ওয়াইসির তৃতীয় ভ্রাতা সে সম্পর্কিত কোন লিখিত কাগজপত্র, সম্পত্তির দলিল-দস্তাবেজ বা অন্য কোন রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি তিনি। তাহলে কিসের আলোকে বা কোন যুক্তিতে তিনি বা তাঁরা সৈয়দ বংশ বা সৈয়দ ওয়ারেশ আলী বা সৈয়দ ফতেহ আলীর বংশধর দাবী করছেন? এমন প্রশ্নের জবাবে শিক্ষিত, সচেতন ও বিজ্ঞ হাজী কাশেম চৌধুরী বলেন, তাঁর পিতা মৃত হাবিবুর রহমান চৌধুরী পিতামহ মৃত আশরাফ আলী চৌধুরী (১৮৫০-১৯০৫) এবং তৎপিতামহের নাম সৈয়দ রমজান আলী। **তবে রমজান আলী যে সৈয়দ বংশের লোক এবং সৈয়দ ফতেহ আলীর ভ্রাতা বা সৈয়দ ওয়ারেশ আলীর সন্তান এ নিয়ে কোন প্রমানাদি নেই তাঁর কাছে।** তিনি এসব শুনেছেন তাঁর দাদী হাবিবা খাতুনের (মৃত ১৯৪৮ খ্রীঃ) কাছে। এছাড়া সম্প্রতি কলকাতা, সুরেশ্বর দরবার ও চট্টগ্রাম শহর থেকে যথাক্রমে ড. সেখ আহমদ আলী, নূরে আখতার হোসাইন আহমদ নূরী ও আহমদুল ইসলাম চৌধুরী এসেছিলেন তাঁর বাড়িতে যাঁদের কাছে শুনেছেন তিনি সৈয়দ ওয়ারেশ আলীর বংশধর এবং সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়াইসি (রহঃ) মল্লিক ছোবহান গ্রামে তাঁদের বাড়িতেই জন্মগ্রহণ করেন। যদিও এই বিষয়ে কোন তথ্য প্রমানাদি তাঁর কাছে নেই।

হাজী আবুল কাশেম চৌধুরী এই বিষয়ে সুস্পষ্ট ভাবে জানিয়েছেন, তিনি বা তাঁরা সৈয়দ ওয়ারেশ আলীর বংশধর হয়ে থাকেন সেজন্য তাঁরা গর্বিত কিন্তু এ

নিয়ে যেহেতু কোন সাক্ষ্য প্রমানাদি বা দলিল পত্র দেখাতে পারছেন না তাই তিনি এই নিয়ে কোন দাবী উত্থাপন করছেন না বা তাঁর বংশধরগণও করবেন না। (টেপ রেকর্ডে ধারণকৃত সাক্ষাৎকার)।

একই বিষয়ে আমরা সাক্ষাৎ করি হযরত সুফী ফতেহ আলী ওয়াইসী (রহঃ) এর একমাত্র পুত্র সৈয়দ মুহাম্মদ মুস্তফা আলী (রহঃ) এর পুত্র সৈয়দ মুহাম্মদ জানে আলম রহমাতুল্লাহ এর কন্যা সৈয়দা সেতারা বেগম (স্বামী বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী) এর সাথে। উক্ত সাক্ষাৎকারে উপস্থিত ছিলেন পীরজাদা সৈয়দ আবদুস সালাম এডভোকেট (তাঁর পিতা আলহাজ্জ এ, বি, এম সৈয়দ বশিরউদ্দিন রহমাতুল্লাহ ছিলেন ফুরফুরার পীর হযরত আবু বক্কর সিদ্দিকি রহমাতুল্লাহ মোজাদ্দেদে জামানের অন্যতম খলিফা, পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত গবেষকদ্বয়, সৈয়দা সেতারা বেগমের সুযোগ্য পুত্র বিচারপতি জোবায়ের রহমান চৌধুরী, সৈয়দা সেতারা বেগমের কন্যা এবং আমি নিবন্ধ লেখক। এই বৈঠক থেকে মল্লিক সোহবান গ্রামের হাজী আবুল কাশেম চৌধুরীর সাথে মোবাইল ফোনে কথা বলা হয়। তিনি (হাজী আবুল কাশেম চৌধুরী) জানান, সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়াইসি রহমাতুল্লাহ কোন তথ্য প্রমাণ যেহেতু নেই তাই তিনিও এমন দাবী করেন না।

আমরা 'শানে ওয়াইসি' বইয়ের লেখক আহমদুল ইসলাম চৌধুরীর সাথে আমিরাবাদ থেকে আসার পথে তাঁর শহরে কাতালগঞ্জ বাসভবনে আতিথ্য ও আপ্যায়ণ গ্রহণ করেছি। উপরোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানিয়েছেন এসব তথ্য তিনি সরেজমিনে গিয়ে যাচাই বাছাই করে এবং প্রাপ্ত তথ্যাদি সৈয়দ জানে আলম রহমাতুল্লাহ এর কন্যা সৈয়দা সেতারা বেগম ও তাঁর পুত্র কন্যার অনুমোদন নিয়ে লিখেছেন। আর সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়াইসী রহমাতুল্লাহ জন্মস্থান, জন্ম ভিটা, বংশধর ও জন্ম সন ইত্যাদি তাঁর বইতে বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

আমরা উপরোক্ত বিষয়ে সৈয়দা সেতারা বেগম, ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র কন্যার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বলেন, এসব বিষয়ে কেউ তাঁদের সাথে কখনো যোগাযোগ করেননি বা এই নিয়ে কোন লেখক তাঁদের কাছে আসেননি।

প্রকৃতপক্ষে উপ-মহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ/রাসুলেনোমা পীর, কুতুবুল ইরসাদ সুফী ফতেহ আলী ওয়াইসির (দীওয়ানে ওয়াইসি নামক ফার্সী কাব্য গ্রন্থের রচয়িতা)

জন্ম তারিখ, জন্মস্থান ও বংশধরগণকে নিয়ে এ যাবত তাঁরই বিশিষ্ট খলিফা, নিজ কন্যা সৈয়দ জোহরা খাতুন এর কাছে শুনে বিশিষ্ট আলেম ওলামা ও গবেষকগণের লেখা মতে এ যাবতকাল সুপ্রতিষ্ঠিত, সর্বজনমান্য ও গৃহীত সত্যকে মিথা প্রমাণ এবং বিভ্রান্তমূলক তথ্য উপস্থাপনের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। যেমন করে কলকাতাস্থ মানিকতলায় হযরত ওয়াইসীর মাজার মসজিদ ও ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি নিয়ে জটিলতা ও পাল্টা পাল্টি দল সৃষ্টি করে আল্লাহর রসুল ও সুফী প্রেমী মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য ও বিভ্রান্তিমূলক ধারণার অবতারণা করা হচ্ছে। যাতে মুসলিম সমাজের ঐক্যে ও বিভেদের দেওয়াল তুলতে সহায়তা করবে মাত্র।

উপরোক্ত বিষয়ে আলোচনা শেষে উপসংহার টানা যায় এভাবে হযরত মোজাদ্দেদে জামান সৈয়দ আহমদ বেরেলভী রহমাতুল্লাহ আহুত ধর্মীয় সংস্কার ও বিধর্মী আগ্রাসী ইংরেজ, শিখ, হিন্দু এই ত্রিশক্তি মোকাবেলায় ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের রক্ষার জন্য যে জেহাদের ডাক দিয়েছিলেন চট্টগ্রামের আমিরবাদের সৈয়দ মহল্লা নিবাসী বিশিষ্ট আলেম ও জেহাদী ব্যক্তিত্ব সুফী সৈয়দ ওয়ারেশ আলী তাতে সাড়া দেন। তিনি ওয়ারেশ আলী বাঙ্গালী নামে খ্যাতি পান। কলকাতায় অবস্থানস্থল থেকে তিনি হযরত বেরেলভীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও জেহাদী আন্দোলনে শরীক হন। ১৯২৯ সালে অনুষ্ঠিত পাঞ্জতারের যুদ্ধে (মতান্তরে ১৮৩১ সালে অনুষ্ঠিত বালাকোট প্রান্তরের যুদ্ধে) শাহদাত বরণ করেন। স্ত্রী সৈয়দা সাঈদা খাতুন দুই পুত্র ও এক কন্যা নিয়ে অসহায় ভাবে জীবন কাটাতে থাকেন। দুঃখিনী মা, সৈয়দ ফতেহ আলী ব্যতীত বাকী দু'সন্তানকে কিছু দিনের মধ্যেই হারিয়ে ফেলেন। পুত্র সৈয়দ সালেহ আলী নিখোঁজ অথবা মৃত ও কন্যা সৈয়দা সালেহা খাতুন মারা যান (অথবা বেঁচে থাকলেও এই কন্যার কোন বংশধরের খোঁজ অদ্যাবধি মেলেনি।

সৈয়দ ফতেহ আলীর বালক বয়সে মা সৈয়দা সাঈদা খাতুন নদীপথে পুত্রকে নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে হিজরত করেন। স্বামী হযরত সৈয়দ ওয়ারেশ আলীর কর্মস্থল কলকাতা অথবা মক্কা শরীফে পবিত্র হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে নৌকাযোগে যাচ্ছিলেন কলকাতা বন্দরের অদূরে ঝড়ের কবলে পড়ে নৌকাডুবিতে মা সাঈদা খাতুন মারা যান। ১২-১৪ বছরের বালক নদী সাঁতরে আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে তীরে উঠে পশ্চিমবঙ্গে তাঁর আশ্রয়, লেখাপড়া, কর্মজীবন কাটে এবং মুর্শিদাবাদ জেলার পুনাশী গ্রামের বিবি ফাতেমা খাতুনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং পুন্যময় কর্মবহুল আধ্যাত্বিক ও শেষ জীবন অতিবাহিত করেন।

জন্মস্থান ও সন ঃ

কুতুবুল ইরশাদ সৈয়দ ফতেহ্ আলীর জন্মস্থান চট্টগ্রাম শহর থেকে ৭০ কিমি দক্ষিণে লোহাগড়া (পূর্বতন সাতকানিয়া থানা) উপজেলাধীন আমিরাবাদ ইউনিয়ন ও গ্রামের সৈয়দ মহল্লা এই তথ্য এযাবত কালের প্রতিষ্ঠিত ও মীমাংসিত সত্য। চট্টগ্রাম কক্সবাজার সড়কে আমিরাবাদ একটি ব্যস্ততম ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান সেখান থেকে এক মাইল উত্তর পশ্চিমে সৈয়দ মহল্লা। এই সৈয়দ মহল্লায় সৈয়দ বাড়িতে ১৮২৫ সালে তাঁর জন্ম। এযাবত লিখিত ও প্রকাশিত উপমহাদেশের গবেষক শিক্ষাবিদ ও পীর মাশায়েখদের বই ও বর্ণনা মতে এটা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত। এতে বিভ্রান্তির কোন অবকাশ নেই। তবে সরেজমিনে না যেতে পারা বা সঠিকভাবে খোঁজখবর নিতে না পারার কারণে অনেক লেখক আমিরবাদকে আমিরাবাজার লিখেছেন এবং সৈয়দ মহল্লার সৈয়দ বাড়ি উল্লেখ করেননি। উপরোক্ত সৈয়দ ফতেহ্ আলীর জন্মস্থান নিজামপুর উল্লেখ করে নামের শেষে নিজামপুরী যোগ করেছেন। এর অন্যতম কারণ হতে পারে সৈয়দ ফতেহ্ আলীর মুর্শিদ প্রখ্যাত পীর ও সংস্কারক বালাকোট যুদ্ধের গাজী সুফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (বর্তমান মীরসরাই উপজেলার মলিয়াইশ গ্রামে মাজার শরীফ) ছিলেন তাঁর পিতা সৈয়দ ওয়ারেশ আলীর পীরভাই এবং সুফী সাহেবের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ও প্রধান খলিফা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ও ইতিহাসের আলোকে যুক্তি বিচার বুদ্ধি দিয়ে যাচাই বাছাই না করে লেখালেখি ও গ্রন্থ রচনার ফল বিকৃতি ও বিভ্রান্তির জন্ম দেয় পরবর্তী প্রজন্মের লেখক গবেষকগণ এতে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিভ্রান্তিতে পড়েন। ব্যক্তিগতভাবে আমি (নিবন্ধ লেখক) নিজেও বিভ্রান্তির শিকার হয়ে আমার লিখিত প্রথম গ্রন্থ 'চট্টগ্রামের সুফী সাধক প্রথম খণ্ডে সুফী ফতেহ্ আলীর জীবনীতে তাঁর নামের শেষ 'নিজামপুরী' উল্লেখ করেছি। প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশ-উনিশ শতকে চট্টগ্রামে নিজামপুর পরগণা কলকাতা সহ দেশ বিদেশে বহুল পরিচিত ছিল। তাছাড়া সুফী ফতেহ্ আলী ছোটবেলা থেকেই ছিলেন জন্মভিটা ত্যাগী এবং মুর্শিদ হযরত নিজামপুরীর সাথে সার্বক্ষণিক সম্পর্কের কারণে সবাই তাঁকেই নিজামপুরের অধিবাসী মনে করেছিলেন।

২০০৫ এর ১লা অক্টোবর চট্টগ্রাম থেকে 'শানে ওয়াইসি' গ্রন্থ সাড়ম্বরে প্রকাশ করেছেন আহমদুল ইসলাম চৌধুরী। উক্ত গ্রন্থে তিনি হযরত সৈয়দ ফতেহ্ আলীর জন্মস্থান নিয়ে অযথা বিতর্ক সৃষ্টি করে শতাধিক বছর ধরে প্রচলিত ও একটি প্রতিষ্ঠিত সত্যকে অসত্য প্রমাণের জন্য সৈয়দ মহল্লার সৈয়দ বাড়ির পরিবর্তে কয়েক মাইল দূরবর্তী মল্লিক সোহবান গ্রামের হাজীপাড়াকে তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন।

আহমদুল ইসলাম চৌধুরীর মতে—

১। সৈয়দ মহল্লার সৈয়দ বাড়ির অধিবাসী জনাব সৈয়দ নুরুল কবির (৭৫) ও তাঁর পুত্র সৈয়দ মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম হযরত সৈয়দ ওয়ারেশ আলীর বংশধর হিসেবে কোন তথ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এমনকি দলিল খতিয়ান ইত্যাদি দেখাতে পারেননি।

২। হযরত ওয়াইসী রহমাতুল্লাহ দাদা দিল্লী থেকে এ দেশে এসেছেন। অতএব হযরত মাওলানা ইবরাহিম আল মাদানী রহমাতুল্লাহ এর বংশধর এবং হযরত ওয়াইসী রহমাতুল্লাহ এর বংশধর এক হতে পারে না। (পৃঃ, ৩২)।

৩। তাঁরা (সৈয়দ নুরুল কবির) হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ ইবরাহিম আল মাদানী রহমাতুল্লাহ এর বংশধর বলেই সম্ভাবনা প্রবল হযরত ওয়াইসী (রহমাতুল্লাহ এর বংশধর কিনা স্পষ্ট নয়। (পৃঃ-৩৩)।

অতএব তিনি সিদ্ধান্ত দিয়ে ফেলেছেন মল্লিক সোবহান গ্রামের হাজী পাড়ায় হযরত সৈয়দ ওয়ারেশ আলীর ঔরসে সুফী ফতেহ্ আলী রহমাতুল্লাহ জন্ম গ্রহণ করেছেন। কারণ হিসাবে তিনি জানান—

এক। "এই বাড়িকে (তাঁদের দাবী মতে, হযরত ওয়াইসী রহমাতুল্লাহ এর বাড়ি) ফকিরের বাড়ি বলে থেকে। যেহেতু দীর্ঘযুগ থেকে আজ পর্যন্ত এই বাড়িতে কোন সময় চুরি ডাকাতি হয়নি। সেকালে চোররা একাধিকবার প্রবেশ করতে চেয়েও নাকি ব্যর্থ হয়েছিল।" (পৃঃ ৩৪)।

২। "তারা প্রত্যেকেই (প্রবীন আলেম সহ বয়স্ক, শিক্ষিত সচেতন লোক) এক বাক্যে বলেন যে, তাঁদের শুনামতে হযরত ওয়াইসি রহমাতুল্লাহ এর জন্মস্থান মল্লিক সোবহান। মাত্র দেড়শ-দুই'শ বছরের আগের ইতিহাস, অতএব একাধিক ব্যক্তিব শোনা কথাকে ফেলে দেওয়া যায় না।" (প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-৩৪)।

উপরোক্ত বিষয়ের অলোকে "আমি (গ্রন্থকার) মল্লিক সোহবানকেই হযরত ওয়াইসী রহমাতুল্লাহ এর জন্মস্থান ধরে নিয়ে অগ্রসর হব। (পৃষ্ঠা-৩৪)।

হযরত শাহসুফী ফতেহ আলীর জন্মস্থান বিতর্কে লেখক আহমদুল ইসলাম চৌধুরী 'তথ্য প্রমাণ বা দলিল খতিয়ান দেখাতে পারেননি বলে' সৈয়দ মহল্লার সৈয়দ বাড়ির পরিবর্তে মল্লিক সোহবান গ্রামের হাজিপাড়ায় (ফকির বাড়িতে) জন্মস্থান মেনে নিচ্ছেন কিন্তু হাজিপাড়ার জনাব আবুল কাশেম চৌধুরী কি সে সব কাগজপত্র তাঁকে দেখাতে পেরেছেন ? দ্বিতীয়ত ঃ সৈয়দ ইবরাহিম মাদানী ও সৈয়দ ফতেহ আলী রহমাতুল্লাহ এর একই বংশধর কেন হতে পারেন না, তার কোন ব্যাখ্যা তিনি দেননি। তাছাড়া ফকিরের বাড়ি নাম, চুরি ডাকাতি না হওয়া এবং কিছু লোকের শোনা কথার উপর ভিত্তি করে হযরত সৈয়দ ফতেহ আলীর জন্ম সৈয়দ মহল্লার সৈয়দ বাড়ির পরিবর্তে মল্লিক সোবহান গ্রামের হাজিপাড়া বলে রায় দিয়ে ফেলেছেন। যা একান্তই মনগড়া সিদ্ধান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। তাছাড়া সৈয়দ বংশের মত মর্যাদাবানদের বাড়ি কেন ফকির বাড়ি হতে যাবে, বা ঐতিহাসিক তথ্যের চাইতে শোনা কথাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন কারণ হিসেবে উক্ত শানে ওয়াইসী গ্রন্থে কয়েকটি প্রশ্ন তিনি নিজেই উত্থাপন করেছেন। আবুল কাশেম চৌধুরী পিতা হাবিবুর রহমান চৌধুরী পিতামহ আশরাফ আলী চৌধুরী এসব নাম দেখে লেখক আহমদুল ইসলামের মনে প্রশ্ন জেগেছে।

১। আমি পুনঃ প্রশ্ন করি তাদের নামের আগে সাইয়েদ নেই কেন ? এবং নামের পরে চৌধুরী কেন ? (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৩)।

২। আবুল কাশেম চৌধুরীর কাছে "হযরত ওয়াইসী রহমাতুল্লাহ গোষ্ঠী হিসেবে তাঁর পক্ষে প্রমাণ কি আছে?

প্রশ্ন দুটি ছিল মৌলিক ও যথাযথ, কিন্তু লেখক অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে না দেখে সাধারণ ভাবে প্রশ্নের সুরাহা করে ফেলেন। তিনি লিখেন এবং "জবাবে তিনি জানান হযরত ওয়াইসী রহমাতুল্লাহ এরা তিন ভাই। তৎমধ্যে এক ভাই হযরত ওয়াইসী রহমাতুল্লাহ অপর ভাই হযরত সাইয়েদ সালেহ আলী রহমাতুল্লাহ বার্মায় (মায়ানমার) হিজরত করেন, তৃতীয় ভাইয়ের ওয়ারিশ তাঁরা এবং দাদা আশরাফ আলী চৌধুরী হযরত ওয়াইসী রহমাতুল্লাহ এর আপন ভাতিজা। (পৃষ্ঠা-৩৩)। "পরক্ষণেই লিখেছেন "ব্রিটিশের শেষের দিকে এসে জমিদারী প্রচলন ও প্রভাবের কারণে নামের টাইটেলের মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়। " (পৃষ্ঠা-৩৩)। এবং তাঁর দাদা হযরত ওয়াইসি রহমাতুল্লাহ

এর ভাতিজা আশরাফ আলীর নাম হযরত ওয়াইসি (রহঃ) এর মূল নামের সাথে মিলে যায়। অর্থাৎ হযরত ফতেহ্ আলী এবং আশরাফ আলী। তবে নামের আগের সাইয়েদ নেই, নামের পরে চৌধুরী।'' (পৃষ্ঠা-৩৪)।

উপরোক্ত দুটো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মিমাংসা অকাট্য তথ্য প্রমাণ ব্যতীত অতটা সাদামাটা ভাবে যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হতে পারে না। ফারসী যামিন (জমিন) ও দাস্তান (ধারণ বা মালিকানা) এর বাংলা অপভ্রংশের সঙ্গে 'দার' সংযোগে জমিদার শব্দের উৎপত্তি। মুঘলদের বাংলা জয়ের পর জমিদার একটি বিশেষ পদবী হয়। জমিদারগণ শাসকদের পরিতুষ্ট করার বিনিময়ে খিলাত ও খেতাব লাভ করতেন। জমিদার বলতে প্রকৃত চাষীর উর্দ্ধে সকল খাজনা গ্রাহককে বোঝাতো। মধ্যযুগ ইংরেজ আমল পর্যন্ত জমিদার ও ভূমি মালিকানা সংক্রান্ত অনেক উত্থান পতন ও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। জমিদারী ভারতের অঞ্চলভেদে বৈশিষ্ট্যগতভাবে পার্থক্য ছিল। সৃষ্টির শুরুতে অর্থাৎ মুঘল আমলের জমিদারী প্রথা ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনামলে এসে নানা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। জমিদারগণ অনেক অধিকার ও সুযোগ সুবিধা হারান এবং একই সাথে নতুন অনেক অধিকার ও সুযোগ সুবিধা লাভ করেন। পুরানো জমিদারদের অনেকে জমিদারী হারান আবার নতুন নতুন জমিদার ও পদ পদবীর প্রবর্তন ঘটে। ১৯৫১ সালে জমিদারী ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক বিলোপ ঘটে। অতএব বৃটিশের শেষ দিকে জমিদারী প্রচলন হয়েছে তথ্যটি সঠিক নয়।

মল্লিক সোবহান গ্রামের হাজী পাড়ায় চৌধুরী বংশের শুরু আশরাফ আলী চৌধুরী থেকে তাঁর জীবনকাল আনুমানিক ১৮৫০-১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ (সূত্র-আবুল কাশেম চৌধুরী সাক্ষাৎকার ৩০/১১/০৮) আমাদের মল্লিক সোবহান গ্রাম পরিদর্শনকালে আবুল কাশেম চৌধুরী একটি সিলমোহর আমাদের দেখিয়ে বলেন, এটি তাঁর দাদা আশরাফ আলীর এবং সিলটি ক' বছর আগে মাটি কাটতে গিয়ে উদ্ধার হয়েছে। আমরা সিলটি পাঠ ও পরীক্ষা করে তাতে 'আশরাফ আলী ও ১২৯৫ হিজরী সন লিখা দেখতে পাই। জানতে চাইলে আবুল কাশেম চৌধুরী জানান, সিলমোহরে আশরাফ আলীর নামের শেষে চৌধুরী নাই কেন? তিনি বলেন, সিলমোহর চৌধুরী খেতাব পাওয়ার পূর্বেকার। ১২৯৫ সনটি খ্রীষ্টাব্দে করলে ১৮৭৩ এর কাছাকাছি সময় দাঁড়ায়, যে সময় তাঁর বয়স পাওয়া যায় মাত্র ২৩ বছর (১৮৫০-৭৩ খ্রীষ্টাব্দ)।

১৮৭৩ সাল পর্যন্ত আশরাফ আলী চৌধুরী খেতাব পাননি একথা তাঁর পৌত্র আবুল কাশেম চৌধুরীর প্রদত্ত তথ্য মতে জানা যায়। আহমদুল ইসলাম চৌধুরীর মতে "জমিদারী প্রচলন ও প্রভাবের কারণে নামের টাইটেল' পরিবর্তন হয়েছে অর্থাৎ আশরাফ আলী কিনা বিশ্ব মুসলমানদের সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ 'সৈয়দ' পদবী ছেড়ে বৃটিশ প্রদত্ত চৌধুরী উপাধি গ্রহণ করলেন। কিন্তু তার ও কোন প্রমাণ মেলেনি। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে উল্লেখিত সিলমোহরে চৌধুরীর পরিবর্তে সৈয়দ পদবী থাকতে পারতো। অর্থাৎ কোন কিছুই হিসেবে মিলছে না। হাজী আবুল কাশেম চৌধুরী থেকে প্রাপ্ত তথ্যনুযায়ী এ বংশের একটি বংশতালিকা

রমজান আলী (সৈয়দ বংশ বলে কথিত-(অপ্রমাণিত)

↓

আশরাফ আলী চৌধুরী (আনুমানিক ১৮৫০-১৯০৫)	নেজামত আলী চৌধুরী
স্ত্রী হাবিবা খাতুন (মৃত্যু আনুঃ১৯৪৮	১। সিদ্দিকুর রহমান চৌধুরী
হাবিবুর রহমান চৌধুরী (মৃত্যু-১৯৬৫)	২। সায়েদুর রমহান চৌধুরী
স্ত্রী আলমাস খাতুন (মৃত্যু-১৯৩৭)	৩। মফজলুর রহমান চৌধুরী
↓	↓
আবুল কাশেম চৌধুরী (৭৬)	মোহাম্মদুর রহমানচৌধুরী (মৃত্যু ১৯৯০)
১। নাজমুল হাসান চৌধুরী	১। মাহফুজুর রহমান চৌধুরী
২। শারমীন চৌধুরী	২। রোকেয়া সুলতানা
৩। রাকিবুল হাসান চৌধুরী	৩। আতাউর রহমান চৌধুরী
৪। কামরুল হাসান চৌধুরী	৪। রুমানা পারভিন
৫। রাজিবুল হাসান চৌধুরী	৫। হাসিনা পারভিন
	৬। লুৎফর রহমান চৌধুরী
	৭। আসাদুর রহমান চৌধুরী

আর একটি বিষয় ফয়সালা হওয়া জরুরী, আর তা হলো, সৈয়দ বংশ মুসলিম সমাজে শীর্ষস্থানীয় ও সাধারণ মানুষ সর্বদা এ বংশের লোকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করে থাকে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কন্যা হযরত বিবি ফাতেমা (রাঃ) এর বংশধরগণকে সৈয়দ বলা হয়। অতএব সৈয়দ বংশের লোকদের একটা বংশতালিকা থাকতে হবে, যাতে হযরত রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা ইমাম হোসেন (রাঃ) অথবা ইমাম জয়নুল আবেদীন (রাঃ) পর্যন্ত মিল থাকবে। কোন মুসলমান

ধন জন অর্থ বিত্ত, জ্ঞান মর্যাদায় যতই শীর্ষস্থানীয় হোন না কেন ইচ্ছে করলেই কেউ সৈয়দ হয়ে যেতে পারবে না। 'সৈয়দ বংশের লোকেরা জন্ম সূত্রেই মুসলিম সমাজে প্রাধান্য পেয়ে থাকেন।' (বাংলা পিডিয়া, খণ্ড-১০ পৃষ্ঠা-২৬১, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ)।

পক্ষান্তরে চৌধুরী উপাধি সংস্কৃত জাত শব্দ। বাংলায় মধ্যযুগীয় সাহিত্যে ভূস্বামী এবং কখনও রাজস্ব কর্মকর্তা হিসাবে চৌধুরীর উল্লেখ আছে।(প্রাগুক্ত)। ভারত উপমহাদেশে ইংরেজ রাজত্ব পাকাপোক্ত হওয়ার পর দেশীয় ভূস্বামী ও সুবিধাভোগী শ্রেণীর মধ্যে চৌধুরী উপাধি প্রশাসনের সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে চৌধুরী হওয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর এমনকি বাংলাদেশ আমলে শিক্ষায় ও ধন সম্পদে প্রাচুর্যতা এনে এক শ্রেণীর লোকের মাঝে চৌধুরী হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

এখন কথা হল হযরত রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বংশধরগণের ব্যবহৃত মর্যদাপূর্ণ ও অতি সম্মানের প্রতীক 'সৈয়দ' বংশজাত শিক্ষিত ও সমাজ সচেতন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বৃটিশ প্রদত্ত 'চৌধুরী' খেতাব গ্রহণ করে 'সৈয়দ' পদবী বর্জন করবেন-এটা শুধু অসম্ভব নয়, অভাবনীয় বটে। আহমদুল ইসলাম চৌধুরীর মনে জাগা দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়। আবুল কাশেম চৌধুরীর কাছে সৈয়দ বংশের বা সৈয়দ ওয়ারেশ আলী বাঙ্গালী বা সৈয়দ ফতেহ আলীর বংশধর হিসেবে কোন প্রমাণাদি নেই। যা তিনি আমাদের সাথে তাঁর ৩০ অক্টোবর ২০০৮ তারিখে সাক্ষাতে এবং পরবর্তীতে ঢাকা থেকে ১ নভেম্বর ঢাকা থেকে যে টেলিফোন সাক্ষাৎ হয় তাতে তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, সৈয়দ ফতেহ আলী সাহেব যে মল্লিক সোবহান গ্রামের হাজিপাড়ায় জন্মেছেন বা আবুল কাসেম চৌধুরী নিজেও তাঁর বংশধর বলে দাবী করেননা-এমন কোন কাগজপত্র ও তাঁর কাছে নেই এবং তিনি নিজে এসব শুনেছেন মাত্র।

আহমদুল ইসলাম চৌধুরী লিখেছেন সুফী ফতেহ আলীর নামের সাথে আবুল কাসেম চৌধুরীর পিতামহ আশরাফ আলী ও তাঁর পিতা রমজান আলীর নাম মিলে যায়। শুধু নামের মিল অমিলের কারণে কারো বংশধর হয়ে যান না বা এমন হতে বাধা হতে পারে না।

হযরত সৈয়দ ওয়ারেশ আলীর বংশধর প্রসঙ্গে এ যাবত যত লেখালেখি হয়েছে তাতে দেখা যায় তাঁর দুই ছেলে এক কন্যা। যথাক্রমে সৈয়দ সালেহ্ আলী, সৈয়দ ফতেহ্ আলী এবং কন্যা সালেহ্ খাতুনের নাম জানা যায়। আহমদুল ইসলাম চৌধুরী তাঁর শানে ওয়াইসি গ্রন্থে তৃতীয় এক সন্তানের কথা বলেছেন কিন্তু তাঁর নাম দিতে পারেননি। তবে আমাদের (লেখক সহ পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত মেহমানদ্বয়) মল্লিক সোহবান গ্রাম সফরকালে আবুল কাশেম চৌধুরী বলেছেন 'তৃতীয় ভাইয়ের নাম ছিল রমজান আলী। তিনি সৈয়দ ছিলেন বলে শুনেছি। আমার কাছে কোন কাগজপত্র নেই।" তিনি আরো বলেন, গত ৮-৯ বছর ধরে সুরেশ্বর দরবার শরীফ, গারাঙ্গিয়া দরবার শরীফ, কলকাতা থেকে ড. সেখ আহমদ আলী ও লেখক আহমদুল ইসলাম চৌধুরী সহ বহু আলেম ওলামা, লেখক গবেষক যাওয়া আসা করছেন, তাঁদের কাছেই আমরা শুনছি সৈয়দ ফতেহ আলী এই বাড়িতে জন্মেছেন। তবে আমাদের কাছে কোন কাগজপত্র নেই বা আমরা এমন দাবীও করি না। এ কথা ১৯৪৪-৪৫ সালের দিকে আমার দাদী হাবিবা খাতুনের কাছে শুনেছি। আমি তখন ১২-১৩ বছরের বালক।" (সাক্ষাৎকার)

আহমদুল ইসলাম চৌধুরী তার শানে ওয়াইসি বইতে হযরত ফতেহ্ আলীর দুপুত্র দুকন্যার মধ্যে (এক পুত্র ও এক কন্যা শৈশবে মারা যান) সৈয়দ মোস্তফা আলীর নামের আগে গোলাম যোগ করে (পৃষ্ঠা-৯০) বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। অবশ্য তাঁর পূর্বে সুরেশ্বর দরবার শরীফ কর্তৃক প্রকাশিত দীওয়ানে ওয়াইসী গ্রন্থে (হযরত ফতেহ আলীর পৌত্র সৈয়দ জানে আলম অনূদিত ফার্সী দেওয়ান এর অনুবাদ) সৈয়দ মোস্তফা আলীর নামের আগে গোলাম যোগ করা হয়েছে (পৃষ্ঠা-২০) অথচ এ যাবতকাল প্রকাশিত বই ও লেখালেখিতে তাঁর নাম সৈয়দ মোস্তাফা আলী লিখিত হয়ে আসছে, তাঁর বংশধরগণের মতও তাই।

আমাদের আমিরাবাদ যাত্রা ঃ

হযরত সৈয়দ ফতেহ্ আলীর জন্মস্থান বিষয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে আমাদের আমিরাবাদ যাত্রা। প্রথমে আমরা সৈয়দ মহল্লায় অবস্থিত সৈয়দ বাড়িতে যাই। ২৯ অক্টোবর দ্বিপ্রহর থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত আমরা সৈয়দ নুরুল কবির

এর বাড়িতে অবস্থান করি। আছর, মাগরীব, এশা ও পরদিন ফজরের নামাজ আমরা সৈয়দ বাড়ির সম্মুখস্থ মসজিদে আদায় করি। মসজিদের মাইকে জনাব মোবারক আলী রহমানী সাহেব গ্রামবাসীর উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন ও আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য জানিয়ে হযরত ফতেহ আলী ওয়াইসি ও তাঁর জন্মস্থান সম্পর্কে এবং স্থানীয় সৈয়দ মহল্লা, সৈয়দ বাড়ি ও এসব সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সহযোগিতা চান। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও মুসল্লিরা তাতে সাড়া দেন। দীর্ঘ আলোচনা আমি রেকর্ডে ধারণ করি।

গ্রামবাসীরা আমাদেরকে জানান, পূর্বপুরুষের কাছে তাঁরা জেনেছেন, এখানকার সৈয়দ মহল্লায় সৈয়দ বাড়ির লোকেরা সম্মানিত ও ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত। বহু আলেম ওলামা ও কামেল দরবেশ এই বংশে জন্মেছেন, তন্মধ্যে ওসমান দীঘির পাড়ে শায়িত হযরত সৈয়দ ইব্রাহিম আল মাদানী রহমাতুল্লাহ সৈয়দ মাওলানা ছানায়তউল্লাহ (১৮৩০-৯৫) তৎপুত্র সৈয়দ মাওলানা রাঘাউল্লাহ (১৮৫০-১৯২০) এর তাঁদের পরবর্তী বংশধর মৌলবী সৈয়দ আবদুল হাই (১৮৯৩-১৯৩৩), সৈয়দ হাফেজ আবদুল আলিম (মৃত্যু-২০০২), সৈয়দ মৌলবি আবুদল আজিম (মৃতু ১৯৮৮), প্রমুখ বংশপরম্পরায় ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন এবং এই অঞ্চলের জনগণের সেবা করে গেছেন। অনেকেই পীরগীরি করেছেন, তাঁদের অনেক মুরিদ রয়েছেন। উল্লেখিত আলেমগণ যুগযুগ ধরে বিভিন্ন মসজিদে ইমামতি করেছেন। হযরত সৈয়দ রাঘাউল্লাহ কলকাতা মাদ্রাসা আলিয়া থেকে টাইটেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে লোহাগাড়া অঞ্চলের সুবিখ্যাত ও সুপ্রাচীন মোহাম্মদ খান নায়েবে উজিরের মসজিদে দীর্ঘকাল ইমামতি করেন। ওসমান দীঘির পাড়ে তাঁর কবর রয়েছে।

সৈয়দ রাঘাউল্লাহর মৃত্যুর পর তৎপুত্র সৈয়দ হাফেজ আবদুল আলিম ১২ বছর নায়েবে উজির মসজিদে ইমামতি করেন। তিনি বৃটিশ সেনা বাহিনীতে যোগ দিলে বড় ভাই সৈয়দ আবদুল আজিম ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন। অর্থাৎ এই বংশের লোকেরা একাধারে মসজিদে ইমামতি, মক্তব, মাদ্রাসায় শিক্ষকতা জনগণের বিমারে-অসুবিধায় দোয়া তাবিজ দিয়ে দ্বীন ও সমাজের খেদমত করেন। এই বংশে বহু কোরআনে হাফেজের সন্ধান পাওয়া যায়। (সূত্র মোহাঃ মুবারক আলী রহমানী রচিত সীরাতে ওয়সী পৃষ্ঠা-৪ কলকাতা)। উল্লেখ্য যে, সেকালে ধর্ম প্রচার ধর্মীয় শিক্ষা দান

মসজিদে ইমামতি ও মাদ্রাসা মক্তবে শিক্ষকতা সৈয়দ-খোন্দকার বংশের লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রামের সাধারণ মানুষ উচ্চ শিক্ষায় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না।

সৈয়দ মহল্লার অধিবাসীদের মধ্যে মোহাম্মদ ইউসুফ (৬০), আহমদ কবির (৫৩) মোহাম্মদ ইদ্রিস (৫৬) সহ অনেকের সাথে আমাদের কথা হয়েছে। তাঁরা জানান, সৈয়দ বংশের পুর্বপুরুষ সৈয়দ মাওলানা রাঘাউল্লাহর বহু মুরিদ ছিলেন, লোহাগড়া উপজেলার কলাউজান, মল্লিক সোবহান, আদার চর, বিলবিল্লাহ সহ চকরিয়া, টেকনাফ পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিলেন। মুরিদরা ৮-১০ বছর আগেও এসকল মুরিদ ও তাঁদের বংশের লোকেরা নজর নেয়াজ নিয়ে আসতেন। মাওলানা রাঘাউল্লাহর বংশধর সৈয়দ হাফেজ আবদুল আলিম (পিতা পীরজাদা সৈয়দ মাওলানা আবদুল হাই) এর পুত্রদের মধ্যে সৈয়দ মাওলানা আবদুল মান্নান (৫৩) পুর্বপুরুষের সেই উত্তরাধিকার বহন করে চলেছেন। তিনি আজো মুরিদ মহলে সমাদৃত, দাওয়াতে যান ও মান -মর্যাদা পান। অতএব আমিরাবাদের সৈয়দ মহল্লার সৈয়দ বংশের লোকেদের বিশেষ মান মর্যাদা এ কথাই প্রমাণ করে হযরত সৈয়দ ওয়ারেশ আলী, তৎপুত্র সৈয়দ ফতেহ আলী ও তাঁদের পূর্ব পরবর্তী বংশধরদের জন্মভিটা হওয়ার মত মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান প্রাচীন কাল থেকেই এখানে বজায় রয়েছে।

কেরামতি ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ ঃ

উসমান দীঘির পাড়ে বহু প্রাচীন কবর রয়েছে। যেগুলো সৈয়দ বংশের পূর্বপুরুষদের বলে গ্রামবাসীরা জানান। এলাকার মানুষ বিপদে আপদে সেখানে ছুটে যান, দোয়া চান। কামেল বুজুর্গদের ওছিলায় মহান আল্লাহর রহমতে তাঁদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সৈয়দ মহল্লার হাজী আব্দুর রহমান (৮৮ বছর বয়সে মৃত্যু-২৬ অক্টোবর ২০০৮) নিয়মিত গভীর রাতে মহল্লা জামে মসজিদে আসতেন, ও সারা রাত এবাদত করতেন। শেষ রাতে উসমান দীঘির পাড়ে, ফজরের পূর্ব পর্যন্ত সেখান থেকে কবর জেয়ারত ও কোরআন তেলাওয়াত করতেন। তিনি সব সময় বলতেন, দীঘির পাড়ে ওলী দরবেশদের যাতায়াত আছে। এই মসজিদের ইমাম সাহেব ছিলেন মাওলানা কুতুবউদ্দিন (আমিরাবাদ বাড়ি) মাওলানা দিদারুল আলম, মৌলানা নুরুল আলম। তাঁরা বলছেন, এখানে সুফী দরবেশদের আনাগোনা

রয়েছে। মৌলানা নুরুল আলম এখনও জেয়ারতে আসেন। তিনি বর্তমান ইমাম সাহেব মৌলানা মোহাম্মদ ইসমাইল খাকীকে বলেছেন, আল্লাহর ওলীদের অবস্থানের কথা, বলেছেন-আপনিও সাধনা করলে দেখতে পাবেন।

মাগরীব, এশা ও ফজরের নামাজ আদায় করতে আসা মুসল্লীদের সাথে আমাদের কথা হয়েছে। উসমান দীঘির পাড়ে শায়িত হযরত ইব্রাহিম আল মাদানী রহমাতুল্লাহ এর কেরামতি সম্পর্কে গ্রামবাসীদের কয়েকজনের বর্ণনা।

১। ২০০২ সালের দিকে সৈয়দ মহল্লার মোহাম্মদ ইদ্রিসের (৫৩) ধান ক্ষেতে পোকার আক্রমণ হয়। কীটনাশক প্রয়োগে কাজ হচ্ছে না। তাঁর ৭৬ বছর বয়সী মা বললেন, ইব্রাহিম মাদানী রহমাতুল্লাহ মাজারের পাশে এক বোতল পানি রেখে আসতে। তিনি মায়ের কথামত কাজ করেন। সকালে সে বোতল ভর্তি পানি এনে মা'র নির্দ্দেশে ধান ক্ষেতে ছিটিয়ে দেন। আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে ধান ক্ষেত পোকা মুক্ত হয়, এমনকি পাশের জমিও রক্ষা পায়।

২। মোহাম্মদ ইউসুফ (৬০) পিতা গনু মিয়া (গ্রাম গাথিয়া ভাঙ্গা, থানা-সাতকানিয়া) কঠিন রোগ হয়। রক্ত বমি হতো। একরাতে স্বপ্নে দেখেন উসমান দীঘির দক্ষিণ পাড়ের মাজারের ভেতর থেকে এক অলি 'আল্লাহু আকবর' বলে উঠে তাঁকে বলেন তোমার কি অসুখ হয়েছে ? ইউসুফ মিয়া তাঁকে নিজ অসুখের কথা বলেন। দরবেশ তিনবার ফুঁদিয়ে আল্লাহু আকবর বলে পুনরায় কবরে শুয়ে পড়েন। এরপর এইসুফ মিয়া সুস্থ হয়ে যান। তবে গলার শব্দ অস্পষ্ট থেকে যায়। এখনও তিনি নিয়মিত হযরত ইব্রাহিম মাদানীর কবর জিয়ারত করেন ও দোয়া চান।--

৩। মোহাম্মদ ইউসুফ (৬০) আরো বলেন লাল মিয়া নামে এক রিকশা চালকের কথা। যিনি মারাত্বক অসুখে পড়ে পঙ্গু হয়ে যান। হযরত ইব্রাহিম রহমাতুল্লাহ এর মাজারে নিয়ে সারা গায়ে ধূলা মেখে সুস্থ হয়ে যান। এখনও লাল মিয়া রিকশা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছেন।

৪। আহমদ কবির (৫২) জানান তিনি তাঁর আব্বার কাছে শোনা এক সত্য কাহিনী। সৈয়দ বংশের কোন লোক ওসমান দীঘির পাড়ে শিরনী রান্না করছিলেন। এক লোক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তিনি শিরনী রান্নারত সৈয়দ

বংশের লোকের উদ্দেশ্যে কটুক্তি করে বলেন, এটা সৈয়দ-খোন্দকারদের ধান্ধাবাজি মাত্র। লোকটি যাচ্ছিলেন বাজারে। বাজারে যাওয়ার আগেই তিনি অসুস্থতা রোধ করেন। রাতে তাঁর গলা দিয়ে অনবরত রক্ত বেরুতে থাকে। ডাক্তার-চিকিৎসা হল, কিছুতেই ভাল হচ্ছে না। অনুশোচনা হলো তাঁর। তিনি অতি কষ্টে ওসমান দীঘির পাড়ে এসে কান্নাকাটি করে জেয়ারত ও কিছু মানত করেন।

তখন হযরত ইব্রাহিম মাদানী রহমতুল্লাহ র মাজার পাকা ছিল না। লোকজনের কাছ থেকে খবরাখবর নিয়ে দোহাজারী থেকে হযরত লুধি ফকির ওরফে লুলা ফকির নামে এক কামেল অলীকে নিয়ে আসেন। হযরত লুনা ফকির এসে দীঘির পাড়ে তিন দিন অবস্থান করেন। তিনি হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে ঘুরে ঘুরে মাজারের একটা চিহ্ন করে দেন। সে অনুযায়ী ভদ্রলোক গিয়ে স্থানীয় রাজমিস্ত্রী হাজী আবদুর রহমানকে (আহমদ কবিরের পিতা) দায়িত্ব দেন মাজার শরীফ পাকা করে দিতে। হাজী সাহেব তাঁর পুত্রদের বলেছেন, কবর কিছুটা খুঁড়তেই পাওয়া যায় তরতাজা মানুষের হাঁড়। পাকিস্তান আমলের শুরুর দিকে এই ঘটনা ঘটে। মাজার গৃহ তৈরির খরচ বহন করেন ওই ভদ্রলোক। তিনি নিয়মিত আসতেন। কান্নাকাটি করে ক্ষমা চাইতেন ও দোয়া জেয়ারত করতেন। পরে লোকটি সুস্থ হয়ে যান। উল্লেখ্য যে, মল্লিক সোবহান গ্রামে লুধি ফকিরহাট নামে হাট ও সেখানে তাঁর মাজার রয়েছে।

৫। মোহাম্মদ ইদ্রিস (৫৬) জানান, ৫/৬ বছর বয়সে একবার দীঘির পাড়ে প্রসাব করে ফেলেন। প্রস্রাবের রাস্তায় জ্বালা যন্ত্রণা শুরু হয়। মা তাঁকে নিয়ে যান মৌলবি সাহেবের কাছে। মৌলবি সাহেব জানতে চাইতেই শিশু ইদ্রিস স্বীকার করেন দীঘির পাড়ে প্রস্বাব করার কথা। জায়গায়টা দেখিয়ে দিতেই তাঁর মা কলসি ভরে পানি দিয়ে জায়গা ধুয়ে পরিস্কার করে দেন ও মৌলবি সাহেবকে দিয়ে জেয়ারত করান। এর পর থেকে ইদ্রিস মিয়া সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন।

৬। ইদ্রিস মিয়া আরো জানান তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে ফল প্রাপ্তির কথা। তিনি ১৭-১৮ বছর বয়সে বুকের ব্যাথায় কষ্ট পেতেন। অনেক ডাক্তারী চিকিৎসা করেও সুস্থতা ফিরে পাচ্ছিলেন না। তিনি হযরত ইব্রাহিম মাদানী রহমতুল্লাহ এর মাজারে গিয়ে কান্নাকাটি করতেন, তাঁর ওছিলায় আল্লাহর রহমত চাইতেন। এক রাতে স্বপ্নে দেখেন, কে যেন তাঁকে বলছেন আদামুনি পাতার রস খেতে। সে রস খেয়ে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করেন।

৭। ২০০৩ সালে ইদ্রিস মিয়া আবারো মারাত্মক অসুখে পড়েন। রাতে স্বপ্ন দেখেন মাজার ঘাটে নেমে পুকুরের পানি পান করছেন। পরদিন সকালে মাজার শরীফে গিয়ে জেয়ারত করেন ও কান্নাকাটি করে দোয়া চান। অতপর পুকুরে নেমে পানি পান করেন। আল্লাহর অশেষ দয়ায় তিনি ভাল হয়ে ওঠেন।

গ্রামবাসী আরো নানা কেরামতির কথা জানান। বিশেষতঃ কোন নির্যাতিত বা অন্যায় ভাবে জুলুমের শিকার হলে হযরত ইব্রহামি রহমতুল্লাহ এর মাজারে গিয়ে নালিশ করলে ফল পাওয়া যায়। অতীত কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত মানুষ কোন বিপদে পড়ে দোয়া চাইলে মুশকিল আছান হয়। তাই দূর দুরান্ত থেকে মানুষ এখানে দোয়া চাইতে আসেন। অনেক কামেল, ফকির শ্রেণীর লোকও আসেন।

সৈয়দ মহল্লায় উসমানের দীঘি ও সৈয়দ বাড়িকে কেন্দ্র করে প্রাচীন কাল থেকে বিরাজ করছে এক পবিত্র আধ্যাত্মিক পরিবেশ। দীঘির পশ্চিমপাড়ে ছিল মাটির মসজিদ। প্রাচীন সেই মসজিদটি সংস্কারাভাবে ভেঙ্গে পড়লে বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হয়। আমরা ২৯ অক্টোবর রাতে সৈয়দ মহল্লায় অবস্থান করি। হাফেজ মুবারক আলী রহমানী ও কাজী মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ রাতে অবস্থান করেন মসজিদে, আর আমি সৈয়দ নুরুল কবির সাহেবের ঘরে। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে আমি তৈরী হচ্ছিলাম মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হবো বলে। কাজী সাহেব ও রহমানী সাহেব আগেই বের হয়ে ছিলেন। আমি এসময় অনুভব করছিলাম। কর্পূরের অনাবিল সুবাস। এ গন্ধ আমাদের অতি পরিচিত। আমি অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে উৎস খোঁজার চেষ্টা করলাম। আশপাশে কাউকে দেখলাম না, ঘরের ভেতর থেকে আসছে বলেও মনে হলো না। আমার ধারণা, খুব কাছেই এই সুবাসের উৎপত্তি। মনে তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন জাগে, আমি কে, কেন এ স্থানে এসেছি, কিসের সন্ধানে? অতপর প্রশ্নের উত্তরও পেয়ে যাই। আমি হযরত সুফী ফতেহ আলী ওয়াইসির উদ্দেশ্যে জেয়ারত ও দোয়া করি। এক পরিতৃপ্ত মন নিয়ে আমি মসজিদের উদ্দেশ্যে চলি। পরদিন সকালে কাজী আব্দুল্লাহ সাহেব আমার কাছে জানতে চান কোন বিশেষ কিছু টের পেলেন কিনা! তিনি জানান, মিষ্টি সুগন্ধিতে তাঁর মন ভরে গেছে। আমি কাজী সাহেবকে আমার কোন অনুভূতির কথা বললাম না। তবে যে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমাদের এই দীর্ঘ পথ যাত্রা ও মুসাফির হওয়া তার সমাধান পেয়ে গিয়েছি বৈ কৈ। ফজরের নামাজ

আদায়ের পর আমরা গ্রামবাসী সহকারে উসমান দীঘির পাড়ে হযরত সৈয়দ ইব্রাহিম মাদানী রহমতুল্লাহ সহ বিভিন্ন ওলী বুজুর্গের কবর জেয়ারত করি ও দোয়া চাই। এক অনাবির আনন্দ ও পরিতৃপ্তি সহকারে আমরা সৈয়দ মহল্লা ত্যাগ করে মল্লিক সোবহান গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি।

হযরত সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়াইসীর নামে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা

মল্লিক সোবহান গ্রামে হযরত সুফী ফতেহ আলী ওয়াইসী রহমতুল্লাহ এর স্মরণে একটি মহিলা মাদ্রাসা স্থাপন করা হয়েছে। ২০০২ সালে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন মল্লিক সোবহান গ্রামের মাওলানা মোহাম্মদ শামসুদ্দীন। তিনি পদুয়া আইনুল উলুম ও চুনতি মাদ্রাসা থেকে ফাজিল ও কামিল (হাদিস) পাস এবং ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল (ফেকাহ) বিষয়ে পাশ করেন। ১৯৯৪ সালে তিনি কলকাতায় মানিকতলায় হযরত ফতেহ আলী রহমতুল্লাহ এর মাজার জেয়ারত করেন। দেশে ফিরে এসে তার মনে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার কথা ভাবেন। তাঁর মা বেগম যামিলা খাতুন তাঁকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। মাওলানা শামসুদ্দীন গত ১৯ বছর ধরে পদুয়া সিকদার দীঘির পাড় জামে মসজিদে ইমামতি করেন। গ্রামবাসীরা তাঁকে একাজে সহযোগিতা করেন। মাওলানা শামসুদ্দীনের অক্লান্ত চেষ্টায়। আল্লাহর রহমত ও সাধারণ মানুষের সাহায্যে মাদ্রাসাটি চলছে। দাখিল মাদ্রাসা হিসেবে সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এ মাদ্রাসা থেকে ২০০৮ সালে ১৪ জন পরীক্ষার্থী দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে, সবাই পাশ করে এবং একজন এ প্লাস পায়। মাদ্রাসার নামকরণ প্রসঙ্গে তিনি জানান, 'কোলকাতা থেকে আসার পর মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার চিন্তাভাবনা করছিলাম। মসজিদে বসে ভাবছি কি নাম দেওয়া যায় হঠাৎ কে যেন আমাকে বলে দিলেন সুফী সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়াইসী রহমতুল্লাহ এর নাম। আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানাই। খুটা খালীর পীর সাহেব হাফেজ আবদুল হাই এর ভিত্তি স্থাপন করেন, পবিত্র কলেমা শাহাদাত অংকন করে একটা বিরাট পতাকা টাঙ্গিয়ে দেন। সুফী ফতেহ আলী ওয়াইসি দাখিল মহিলা মাদ্রাসা ভবন নির্মান সমাপ্তির পথে। পশ্চিমবঙ্গের হাফেজ মুহাম্মদ মুবারক আলী রহমানী সাহেবও আমার সাথে একমত পোষণ করেন যে, উপমহাদেশে হযরত ফতেহ আলীর নামে একাধিক মাদ্রাসা রয়েছে কিন্তু মহিলা মাদ্রাসা সম্ভবতঃ এই একটাই।

অতঃপর মল্লিক সোবহানের হাজী বাড়িতে—

আমরা মাওলানা শামসুদ্দীন সহযোগে এক কিলোমিটার দূরবর্তী হাজীপাড়ায় গিয়ে হাজী আবুল কাশেম চৌধুরীর সাথে সাক্ষাৎ করি। দু'ঘণ্টা ব্যাপী সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর পুর্বপুরুষদের সম্পর্কে বলেন। শিক্ষিত ও মর্জিত রুচির এই ভদ্রলোক ব্যবসা উপলক্ষে ১৯৫৫ থেকে ঢাকায় বসবাস করেন, ১৯৯০ সালে নতুন বাড়ি করেন ও পৈতৃক ফকির বাড়ী ছেড়ে এখানে বসবাস করছেন, জানান।

আলোচনার শুরুতে হাফেজ মুবারক আলী রহমানী সাহেব দীর্ঘ বক্তব্য উপস্থাপন করে কলকাতা থেকে ঢাকা এবং ঢাকা থেকে আমিরাবাদ আসার কারণ ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন উপযুক্ত এবং ঐতিহাসিক তথ্য উপাত্ত সহযোগে প্রমাণ করতে পারলে আমাদের মেনে নিতে কোন আপত্তি নেই যে, কুতুবুল ইরশাদ ও রসুলে নোমা পীর হযরত সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়াসীর জন্ম ভিটা এখানেই এবং তাঁর পিতা বা ভাইয়ের আওলাদ আবুল কাশেম চৌধুরী সাহেব। কিন্তু কোন উপযুক্ত প্রমাণ ব্যতীত কেউ বংশধর দাবী করার অপচেষ্টা চালালে কেউ তা মেনে নেবে না।

মল্লিক সোবহান গ্রাম চট্টগ্রাম কক্সবাজার সড়কের পূর্বে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত একটি গ্রাম। গ্রামের পূর্বে তেওয়ারী খিল পশ্চিমে ঘোনাপাড়া ও কক্সবাজার রোড, উত্তরে পদুয়া গ্রাম ও দক্ষিণে রাজঘাটা গ্রাম। মল্লিক সোবহান গ্রামের পূর্ব নাম মল্লিক ছোয়াং এখন ও কেউ কেউ এনামে ডাকেন লিখেন। আমিরাবাদ বাজার ও সদর ইউনিয়ন থেকে তিন কিমি উত্তরে এ গ্রাম অবস্থিত।

হাজী আবুল কাশেম চৌধুরী তাঁর পুর্বপুরুষ আশরাফ আলী পর্যন্ত চৌধুরী এবং তাঁর পিতা রমজান আলী পর্যন্ত সৈয়দ ছিলেন বলে দাবী করেন কিন্তু কোন প্রমাণ বা লিখিত কোন কাগজপত্র নেই জানান। বাল্যকালে তাঁর দাদী হাবিবা খাতুনের কাছে শুনেছেন তাঁদের কোন এক পুর্বপুরুষ বড় অলী ছিলেন ও ভারতে তাঁর মাজার রয়েছে।

হাজী আবুল কাশেম ১৯৫৫ সাল থেকে দীর্ঘদিন ঢাকায় ছিলেন। ১৯৯০ সালের পর গ্রামে এই বাড়ি তৈরি করেন। কয়েক বছর পর গারাঙ্গিয়ার পীর সাহেবের খলিফা জনাব মহিউদ্দীন ১০-১২ জন লোক নিয়ে আসেন ও রাতে মেহমান হন। কিছুদিন পর আসেন সুরেশ্বরের পীর সাহেব নূরে আখতার সাহেব। এরপর

আসেন শর্ষীর্নার পীর সাহেব। তাঁর যাওয়ার পর আসেন কলকাতা থেকে ডঃ সেখ আহমদ আলী। তাঁরা সকলেই তাঁকে বলেন, হযরত সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়াইসির জন্ম এই বাড়িতে। তিনি সৈয়দ বংশের লোক ছিলেন। কিন্তু আপনি সৈয়দ লিখেন না কেন?

হাজী আবুল কাশেম চৌধুরী তাঁদের বিনীতভাবে জানান "আমার দাদার আগ পর্যন্ত সৈয়দ বংশ ছিল এসব শোনা যায়। আমি কোন তথ্য প্রমাণ দিতে পারবো না। পরবর্তীতে আমার দাদা জমিদারী নাভ করে চৌধুরী লিখতে থাকেন। এরপর আমরা চৌধুরী লিখি।"

আবুল কাশেম চৌধুরী জানান, পীর মাশায়েখদের/মন্তব্য ও জানার আগ্রহ দেখে তিনি কিছুটা মনোকষ্ট পান। কলকাতা থেকে আগত ড. সেখ আহমদ আলীকে বলেই ফেলেন, আপনাদের এত মুরিদান, পীর মাশায়েখ মানুষ আপনারা, আপনার মন কি বলে? আমার কাছে জানতে চান কেন? এসময় তিনি চেয়ার থেকে উঠতে গিয়ে প্রচণ্ড আঘাত পান। আল্লাহ্ ভাল জানেন, কেন এমন হল। আমি তাঁদের সবাইকে বলেছি, আপনারা বলছেন শাহ সুফী ফতেহ আলী ওয়াইসীর জন্মভিটা এটি, আমার জন্য খুব ভাল খবর। আমি আমার সাধ্যমত এজন্য খেদমত করে যাব। আমার পরবর্তী বংশধরদেরও বলে যাব। কিন্তু এর মধ্যে ব্যবসার বা লাভবান হওয়ার কোন নিয়ত নেই আমার। ওনার ওছিলায় দান-ছদ্‌গা খাওয়ার কোন ইচ্ছে আমার নেই বরং আমার সাধ্যমত আল্লাহর রাস্তায় খরচ করবো। ওনারা সবাই বলে যান, এই বাড়িতেই হযরত ফতেহ আলি জন্মেছেন।"

একটি পর্যালোচনা ঃ

এই হল কুতুবুল ইরশাদ হযরত শাহসুফী সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়াইসী রহমতুল্লাহ জন্মস্থান সম্পর্কিত আমাদের সরেজমিনে সংগৃহীত তথ্য বিবরণ। মল্লিক সোবহান গ্রামের হাজী পাড়া নিবাসী (ফকির বাড়ি বলে কথিত) হাজী আবুল কাসেম চৌধুরী দাদার আমল থেকে এলাকার গণ্যমান্য ও ধনাঢ্য ব্যক্তি। পুর্বপুরুষ সূত্রে এবং নিজ ব্যবসায়িক সূত্রে তিনি অর্থ বিত্তের মালিক। এই ব্যক্তি নিশ্চিতরূপে জানেন না বা কোন রকম তথ্য প্রমাণ ও নেই যে তাঁর দাদার পিতা অর্থাৎ' রমজান আলী পর্যন্ত সৈয়দ বংশ ছিলেন এবং হযরত শাহসূফী ফতেহ আলী রহমতুল্লাহ এই

বংশে একই বাড়িতে জন্মেছেন। এসব ১২-১৩ বছর বয়সে দাদীর কাছে শুনছেন। ও ১৯৯০ সালের পর পরিণত বয়সে এসে বাইরের কিছু লোকদের কাছে জেনেছেন এই ব্যাপারে তাঁর বিশেষ কোন উচ্চাগ্রহ বা আতিশায্য নেই। নেই কোন দালিলিক প্রমণ বা নেই ন্যূনতম তথ্য প্রমাণ।

পক্ষান্তরে সৈয়দ মহল্লার সৈয়দ বাড়ির লোকেরা বংশ পরম্পরায় সৈয়দ, আরবী ফার্সী শিক্ষায় শিক্ষিত, ধর্মীয় প্রচার-প্রাচরণা ও মানব সেবায় বিভিন্ন মসজিদে ইমামতি, মক্তব, মাদ্রাসায় শিক্ষকতা বিপন্ন অসহায় মানুষদের দোয়া তাবিজ দিয়ে সেবাশশ্রসা এবং আশেপাশের দশ বিশ মাইল দূর পর্যন্ত তাঁদের অনুরাগী ভক্তদের কাছে যুগযুগ ধরে প্রভাব পরিচিতির মাঝে অতি সম্মান জনক আসনে তাঁদের অবস্থান। প্রাচীন কাল থেকে সৈয়দ পরিবারের অলি বুজুর্গদের আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ এবং রোগ-শোক বিপদ-আপদে বিপন্ন মানুষদের মুশকিল আছানে অবদান রেখে চলেছেন। আজো তাঁদের কেরামতি লোকমুখে শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত হয়।

সৈয়দ বংশের লোকেরা সমাজে বিশেষ সম্মানের অধিকারী। এই বংশের লোকেরা সম্মান জনক পেশা শিক্ষকতা, পীরগিরি, মসজিদে ইমামতি করেই জীবন যাপন কাটান। কোন ব্যবসা বাণিজ্য চাষাবাদ বা দান খয়রাত গ্রহণ করতে পারেন না। যতই অভাবী হোন না কেন সৈয়দ খান্দানের লোকেরা ফেতরা জাকাত, ছদ্‌কা খাওয়া নিষিদ্ধ এমনকি কারো কাছে হাত পাততে পারেন না। হতে পারে আমিরাবাদের সৈয়দ মহল্লার সৈয়দ বংশের লোকেরা আর্থিকভাবে দুর্বল কিন্তু মর্যাদা সম্মানের দিক দিয়ে উচ্চ আসনের অধিকারী। আর্থিকভাবে কেউ যদি সাহায্য করতে চান গোপনেই করবেন তাহলে এই খান্দানের ইজ্জত বজায় থাকবে। সেই সাহায্যের কথা যদি লিখে প্রচার করে দেওয়া হয় তা হবে খুবই অন্যায় ও উদ্দেশ্য মূলক। সৈয়দ মহল্লার সৈয়দ বংশের একটি বংশ তালিকা নিম্নরূপ করা যেতে পারে—

সৈয়দ গাজী ওসমান হযরত সৈয়দ এব্রাহিম আল মাদানী রহমতুল্লাহ উভরে যে কোন একজন ইরাকের বাগদাদ শরীফ থেকে সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আফগানিস্তান হয়ে দিল্লীর মোঘল সম্রাট শাহজাহানের দরবারে আসেন। পরবর্তীতে সেখান থেকে চট্টগ্রামের আমিরাবাদের সৈয়দ মহল্লায় বসতি স্থাপন করেন। এই

বংশের একজনের নাম সৈয়দ সুনুতুল্লাহ রহমাতুল্লাহ।

সৈয়দ সুনুতুল্লাহ রহমাতুল্লাহ (মৃত্যু আনুমানিক-১৮৩০খ্রীঃ)

সৈয়দ মাওলানা রাঘাউল্লাহ রহমাতুল্লাহ (মৃত্যু আনুমানিক-১৮৫০ খ্রীঃ)

১। পীরজাদা সৈয়দ মাওলানা আবদুল হাই (আনুঃ ১৮৩৩-১৯৩০),
পীরজাদা সৈয়দ হাফেজ শফিউল্লাহ (বাল্যকালে মৃত্যু) ও
পীরজাদা সৈয়দ মৌলবি আবদুল হক (রেঙ্গুনে মৃত্যু)।

পীরজাদা সৈয়দ মাওলানা আবদুল হাই

১। সৈয়দ মৌলবি আবদুল আজিম (দুই ছেলে, দুই মেয়ে)।

২। সৈয়দ হাফেজ আবদুল আলিম (চার ছেলে, চার মেয়ে)।

৩। সৈয়দ আবদুল রাজ্জাক (চার ছেলে, চার মেয়ে)।

৪। সৈয়দ নুরুল কবির (৭৬) (চার ছেলে, এক মেয়ে)।

৫। সৈয়দা আয়েশা খাতুন)।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, কুতুবুল ইরশাদ হযরত সৈয়দ সুফী ফতেহ আলী ওয়াইসী রহমাতুল্লাহ সম্পর্কে এ যাবত লিখিত বই ও স্মৃতি চারণ মূলক লেখা সমূহ তাঁরই পবিত্র জবান থেকে শুনে তাঁর মুরীদ খলিফা ও সমকালীন আলেম ওলামাগণ বর্ণনা করেছেন এটা ধারণা করা খুবই স্বাভাবিক এবং যা ইতিহাসের আলোকে বিচার বিশ্লেষণের আওতায় পড়ে অর্থাৎ যুক্তি তথ্য নির্ভর বলে গ্রহণযোগ্য। হযরত ওয়াইসি রহমাতুল্লাহ নিজে আরবী ফারসী বাংলায় বিশেষ পারদর্শি ছিলেন এবং তাঁর বংশধরগণ মুরিদ খলিফাগণ ও সুশিক্ষিত ছিলেন। অতএব উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি সরকারি উচ্চপদে এবং ১৮৬৮ পর্যন্ত পলিটিক্যাল পেনসন অফিসের সুপারিনটেন্ডেন্ট পদে চাকরিরত ছিলেন। তিনি ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর কলকাতায় বন্দী অযোধ্যোর নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ এর একান্ত সচিব পদেও কর্মরত ছিলেন। তৎকালীন সময়ে কলকাতা সহ সমগ্র ভারতবর্ষে রাজনৈতিক সামাজিক পরিমণ্ডলে তিনি সুপরিচিত ও সর্বজন

শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। রাষ্ট্রীয়, প্রশাসনিক ও আইন আদালত সম্পর্কিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সাথেও তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মহিশূরের টিপুসুলতান পরিবারেও তিনি শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তেমন একজন ব্যক্তিত্বের জন্মস্থান, বংশধর ইত্যাদি নিয়ে ফয়সালা নিশ্চিত হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। তাই এটা বলতে কোন দ্বিধা থাকতে পারে না যে, আমিরবাদের সৈয়দ মহল্লায় মর্যাদাশীন সৈয়দ বংশে তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা। হতে পারে এখানকার সৈয়দ বংশের লোকেরা নিজেদের অসচেতনা, আর্থিক দৈন্যতা এবং হয়তো বা সত্যিকার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সৈয়দ বংশের লতিকাটি হেফাজত করতে পারেননি। যা প্রত্যেক সৈয়দ বংশ সংরক্ষণ করে থাকেন।

সৈয়দ মহল্লায় এই সৈয়দ বংশের বর্তমান মুরুব্বী সৈয়দ নুরুল কবির (৭৬) সহ অনেকেই বলেন, বংশ লতিকাটি ৩০-৪০ বছর আগে চুরি হয়ে গেছে। গ্রামবাসীদের মধ্যে মসজিদে দেখা হওয়া মোহাম্মদ ইদ্রিস (৫৬) সহ বেশ ক'জন বলেছেন, তাঁরা ছোট বেলায় সৈয়দ বংশের লতিকাটি দেখেছেন, পরবর্তীতে শুনেছেন এটি হারিয়ে গেছে বা চুরি হয়েছে।

আমাদের সৈয়দ মহল্লায় অবস্থানকালে এবং পরবর্তীতে ঢাকা ফেরার পর জনৈক সৈয়দ শডিফউল্লাহ পিতা মৃত সৈয়দ তৈয়ব উল্লাহ বললেন এই সাজরা নামায় তাঁর পরিবারের নিকট সংরক্ষিত আছে। কিন্তু তিনি তা দেখাতে পারেননি, না মূল কপি না ফটোকপি কোনটাই।

নিবন্ধ লেখক ঃ চট্টগ্রামের অধিবাসী। সুফী সাধকদের জীবনী ভিত্তিক একাধিক গ্রন্থ প্রণেতা। ইতিহাস গবেষক। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের সুফী সাধক বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিতব্য।

তথ্যসূত্র ঃ—

১। সীরাতে ওয়সী মুহাঃ মুবারক আলী রহমানী, পশ্চিমবঙ্গ, ২৮মার্চ ২০০৭।
২। চট্টগ্রামের সুফী সাধক আহমদ মমতাজ, ঢাকা। জানুয়ারী ২০০৪।
৩। দিওয়ানের ওয়াইসী- বঙ্গানুবাদ আলহাজ্ব শাহ সুফী সৈয়দ মুহাম্মদ জানে আলম।

প্রকাশক- আলহাজ্ব শাহসুফী সৈয়্যেদ নূরে আখতার হোসাইন আহমদী নূরী, নড়িয়া শরিয়তপুর, ৬ডিসেম্বর-২০০১
৪।সুফী সম্রাট হযরত ওয়সী (রহঃ) -ডঃ সেখ আহমদ আলী, কোলকাতা ডিসেম্বর ২০০৭।
৫। ফুরফুরা শরীফের ইতিবৃত্ত- মোঃ মোবারক আলী রহমানী, ইফাবা, ঢাকা।
৬। শানে ওয়াইসী- আহমদুল ইসলাম চৌধুরী, চট্টগ্রাম। সেপ্টেম্বর ২০০৫।
৭। ফুরফুরা শরীফের পীর, বিস্তারিত জীবন- আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) ঢাকা। ডিসেম্বর ১৯৯৭।
৮। বাংলা পিডিয়া-১০ খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।
৯। চট্টগ্রামে ইসলাম- ড. আবদুল করিম, সেপ্টেম্বর-১৯৭০।
১০। আজিমপুর দায়রা শরীফ-সাইয়্যেদ আহমদুল্লাহ, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ।
১১।ইসলাম প্রসঙ্গ-ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, মাওলা ব্রাদার্স, এপ্রিল ২০০০।
১২।সাক্ষাৎকার ও আলোচনা- সৈয়দ আবদুস সালাম (এডভোকেট), সৈয়দা সেতারা বেগম, বিচারপতি জোবায়ের রহমান চৌধুরী, হাফেজ মুহাঃ মুবারক আলী রহমানী, কাজী মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, সৈয়দ নুরুল কবির, সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম, মাওলানা মোহাম্মদ শামসুদ্দীন, হাজী আবুল কাশেম চৌধুরী, আহমদুল ইসলাম চৌধুরী।

পরিশিষ্ট-৪

পুস্তক পর্য্যালোচনা

হযরত সূফী সাইয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়সী রহমাতুল্লাহ এর জীবনের কিছু ঘটনার সন, তারিখ ও বিষয়বস্তু নিয়ে ইদানিং মতভেদ দেখা যাচ্ছে। আমরা সে সব বিষয়ে কিঞ্চিত আলোচনা করতে বাধ্য হচ্ছি, সত্যের খাতিরে। বিচার বিবেচনার দ্বায়িত্ব সম্মানীত পাঠকবৃন্দের।

'হজরত ওয়সীর (রাঃ) জীবন-ইতিহাস

ডক্টর আহমদ আলী। প্রথম সংস্করণ ৬ই ডিসেম্বর-২০০৪

(বাংলা ২০শে অগ্রহায়ণ ১৪১১)

শানে ওয়াইসী

রাসুলনোমা হযরত সূফী সাইয়েদ ফতেহ আলী ওয়াইসী রহমাতুল্লাহ

লেখক- আহমদুল ইসলাম চৌধুরী

১লা সেপ্টেম্বর-২০০৫ ইংরেজী

১৭ই ভাদ্র-১৪১২ বাংলা

'হজরত ওয়সীর (রঃ) জীবন ইতিহাস

১৮০০-১৮০৬-১৮৮৬

ডঃ সেখ আহমদ আলী

দ্বিতীয় সংস্করণ ৬ই ডিসেম্বর ২০১২। ২০শে অগ্রহায়ণ ১৪১৯

'শানে ওয়সী পুস্তকের লেখক বাংলাদেশের চট্টগ্রামের অধিবাসী। 'হজরত ওয়সীর রহমাতুল্লাহ জীবন ইতিহাস' পুস্তকের লেখক পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার অধিবাসী। উভয় লেখক কেউই হযরত ওয়সী রহমাতুল্লাহ এর সমকালীন নন।

বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্য সমাহারের মধ্য দিয়েই বিচার বুদ্ধির যাচাই বাছাই এর মাধ্যমে সুচিন্তিত মতামত পাঠকের খিদমতে পরিবেশন করাই লেখকের কাম্য। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা মহানুভবতা ও আদর্শ লেখকের প্রকৃষ্ট পরিচয়। কেতাব চোর লেখকদের অশেষ দোষ।

উল্লেখিত পুস্তকগুলী পাঠ করলে সহজেই প্রতীয়মান হবে এবং পাঠকেরই সচ্ছ মনের আয়নায় প্রকৃত তথ্য উদ্ভাসিত হবে।

শানে ওয়ইসীর লেখক জনাব চৌধুরী সাহেব চট্টগ্রামের বুনিয়াদি পরিবারের সন্তান, এমন কি *'মল্লিক সোবহান' অঞ্চলে নিজ পৈত্রিক বাসস্থান। তিনি বেশ কিছু অসত্য তথ্য ছেপেছেন।*

হযরত ওয়সী পীর রহমাতুল্লাহ এর জন্মস্থান আমিরাবাদ সৈয়দ মহল্লার স্থানে 'মল্লিক সোবহান, ফকির বাড়ী' লিখেছেন। শানে ওয়াইসী ৩০-৩৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

পক্ষান্তরে—

'হজরত ওয়সীর (রাঃ) জীবন ইতিহাস পুস্তকে লিখছেন—

"১৮২১ সালে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী রহমাতুল্লাহ সাথী হিসাবে হজরত মাওলানা আবদুল হাই এর নাম দেখতে পাই। ইনি হজরত ওয়সীর উপরের বংশধর রাগাউল্লাহর পুত্র হচ্ছে। প্রগুক্ত-১৯৭পৃষ্ঠা ২য় সংস্করণ ১৩৬ পৃষ্ঠা।

তিনি আরও লিখেছেন-

"হজরত ওয়সী রহমাতুল্লাহ উর্দ্ধতম বংশধর (সাইয়্যেদ) রাগাউললাহ রহমাতুল্লাহ হলেন— হজরত ইব্রাহীম আলমাদানীর বংশধর। হজরত আলমাদানীর মাজার শরীফ উসমানের দীঘির পাড়ে, আর তার বংশধরেরা বসবাস করছেন আমিরাবাদের সৈয়দ মহল্লায়' সাতকানিয়ায়। আমিরাবাদ ইউনিয়ন এখনও বিদ্যমান। এরশাদ আমলের উপজেলা লোহা গাড়ার অন্তর্গত।" হায়াতে ওয়সী ৬৪ পৃষ্ঠা ৩য় সংস্করণ।

"তাঁর পিতামহ দিল্লী থেকে চট্টগ্রামে চলে আসেন। এখানেই তাঁর পিতা হযরত ওয়ারেস আলী জন্ম গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ ১৮০০/০৬ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামের আমিরাবাজারে (আমিরাবাদ) অন্তর্গত সাতকানিয়া গ্রামে সৈয়দ পাড়া মহল্লায় (বর্তমান বাংলাদেশ) হজরত সুফী ফতেহ আলী ওয়সী ভূমিষ্ট হন।" হজরত ওয়সীর রহমাতুল্লাহ জীবন ইতিহাস-২৫ পৃষ্ঠা।

আমরা জনাব চৌধুরী সাহেবের সাথে মতান্তরগুলো আলোচনার জন্য ২০০৭ সালে তাঁর চট্টগ্রামের বাসায় দাওয়াত গ্রহণ করে ও রোজভিলার মসজিদে আলোচনা করি। কিন্তু সে সময় তিনি নিজ সিদ্ধান্তে অবিচল থাকায় আলোচনা ফলপ্রসু হয়নি।—রহমানী।

"শানে ওয়াইসী উল্লিখিত তাঁর জন্মস্থান 'মল্লিক সোবহান' ফকির বাড়ীর দাবীর যৌতিকতার আর অবশিষ্ট রইল কি?

শানে ওয়াইসীর লেখক জনাব চৌধুরী সাহেব ভ্রমাত্মক মত জনাব আবুল কাসেম চৌধুরী সাহেবের তথ্যে শানে ওয়াইসী ৩৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—

"এক নজরে জানতে গেলে—

হযরত সাইয়্যেদ হারেস আলী রহমাতুল্লাহ এর

পুত্র হযরত সাইয়্যেদ ওয়ারেশ আলী রহমাতুল্লাহ।

স্ত্রী হযরত সাইয়্যেদা সায়িদা খাতুন রহমাতুল্লাহ

সন্তান ঃ

১। হযরত সাইয়েদ সালেহা খাতুন রহমাতুল্লাহ

২। সাইয়্যেদ আশরফ আলীর পিতা।

৩। হযরত সাইয়্যেদ সালেহ আলী রহমাতুল্লাহ

৪। হযরত সাইয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়াইসী রহমাতুল্লাহ

শানে ওয়াইসীর লেখক জনাব চৌধুরী সাহেব নতুন ভূয়া তথ্য পেশ করেছেন। জনাব কাসেম চৌধুরী সাহেবের দাবী, তার দাদা সাইয়্যেদ আশরাফ আলী রহমাতুল্লাহ হচ্ছেন সাইয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়সী রহমাতুল্লাহ এর ভ্রাতুষ্পুত্র। ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম দিতে পারলেন কিন্তু তাঁর পিতার নাম দিতে পারলেন না। হযরত ওয়সী রহমাতুল্লাহ চার ভাই বোন বলছেন, কিন্তু ভাইয়্যের নাম দিতে পারলেন না কেন?

অদ্যবধি কোন প্রাচীন জীবনীগ্রন্থে হযরত ওয়সী রহমাতুল্লাহ এর চার ভাই বোনের কথা লেখা পাইনি, সর্বত্র ৩ ভাই বোন (২ ভাই, এক বোন) পাই।

হজরত ওয়সী রহমাতুল্লাহ জীবন ইতিহাস পুস্তকের ১৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন— "হজরত সূফী ফতেহ আলী ওয়সী (রাঃ) দুই ভ্রাতা ও এক ভগিনী ছিলেন।"

জনাব আবুল কাসেম চৌধুরী সাহেব কখনই দাবী করেননি যে তিনারা হযরত ওয়সী রহমাতুল্লাহ এর আওলাদ এবং সে তথ্য দিতেও অপারগ। আসলে

আলহাজ্জ আবুল কাসেম চৌধুরী সরল প্রকৃতির ভাল মনের মানুষ। নিজস্বী না থাকায় তাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করছেন। আর তিনি ইতিপূর্বে মল্লিক সোবহান গ্রামে ছিলেন না, হালে এখানে এসে নতুন বাড়ী করে বসবাস করছেন। পুত্র জনাব নজমুল হাসান চৌধুরী।

শানে ওয়াইসী পুস্তকের ৯০ পৃষ্ঠা জনাব চৌধুরী সাহেব হযরত সূফী সাইয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়সী রহমাতুল্লাহ এর পুত্রের নাম *''হযরত সাইয়্যেদ গোলাম মোস্তাফা আলী''*— লিখেছেন, কিন্তু প্রাচীন সমস্ত জীবনী গ্রন্থে তাঁর নাম 'হযরত সাইয়্যেদ মোস্তাফা আলী' লিখিত আছে। এমন কি হযরত ওয়সী প্রণীত 'দিওয়ানে ওয়সী' ফার্সি মূল গ্রন্থে মোস্তফা আলী নাম লেখা আছে। *

শানে ওয়াইসী পুস্তকের ১১৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—

ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ রহমাতুল্লাহ প্রসঙ্গে বলেন—*''তবে তিনি কিছুদিন কোলকাতা আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন বলে জানতে পারা যায়।''*

এ তথ্য অসত্য। চৌধুরী সাহেব কোথা থেকে জানতে পেরেছেন তা লেখেননি। বিখ্যাত ভাষাচার্য্য ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ রহমাতুল্লাহ এর মত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মনিষীদের বিষয়ে উদ্ধৃতি দিয়ে লিখলে খুবই ভালো হয়। বস্তুতঃ তিনি (ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ) কোন সময় মাদ্রাসা আলীয়া কোলকাতার অধ্যক্ষ ছিলেন না।

বাস্তবে ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ রহমাতুল্লাহএর ঢাকায় আগমনের অনেক পরে পশ্চিমবঙ্গে আর এক ডঃ শহীদুল্লাহ নামের ব্যক্তি কোলকাতা আলীয়া মাদ্রাসার (কিছুদিন নয়) অধ্যক্ষ ছিলেন।, ১৯৮১-১৯৯৭ প্রায় ১৭ বছর ইনি ছিলেন হুগলি জেলার ভগবতীপুরের বাসিন্দা। সম্প্রতি ১৬/৭/২০১৭ ইন্তেকাল করেন। অপর জনও ফুরফুরা শরীফের হযরত মুফতী আবু জাফর সিদ্দিকী রহমাতুল্লাহ এর খলীফা। আলোচ্য জন ২৪ পরগণা জেলার হাড়োয়া

---

* হযরত ওয়সী রহমাতুল্লাহ ৯০ পৃষ্ঠায় 'সৈয়দ' অতি উচ্চ মর্যাদা এ বংশের। চৌধুরী হয়ে হযরত ওয়সীর বংশধর পরিচয়ের বিস্তারিত তথ্য পরিশিষ্ট—৩ দেখা যেতে পারে।

থানার পিয়ারা গ্রামের বাসেন্দা সুম্মা ঢাকা এবং ইনি ফুরফুরা শরীফের মোজাদ্দেদে যামান, আলা হযরত পীর আবুবকর সিদ্দিকী রহমাতুল্লাহ এর খলিফা। লেখক নাম বিভ্রাটে হযরত ওয়সী রহমাতুল্লাহ এর জীবনীর অনেক ঘটনা নয়কে, রটনা করেছেন, তদ্রূপ ইনি তিনি নন।

শানে ওয়াইসীপুস্তকের ৯৬ পৃষ্ঠা—

লেখক পুনাশী শরীফের অবস্থান বর্ণনায় পুনাশিস্থ রেলষ্টেশন *'জাহমতপুর বাহরান'* লিখেছেন, কিন্তু রেলওয়ে ষ্টেশনের নাম— "ঝামট পুর বহরান। ছাপার ভুল হলে ৫/৬ স্থানে একই বানান দেখতে পাই। বাংলার উচ্চারণ হবে— 'ঝামটপুর বহরান।

জনাব মাওলানা আহমদ আলী সুরেশ্বরী প্রসঙ্গে—

শানে ওয়সী পুস্তকের ১২২ পৃষ্ঠায় চৌধুরী সাহেব লিখেছেন—

....*'তিনি দীর্ঘ ২০ বছর (১৮৯২-১৯১২) কোলকাতা আলীয়া মাদ্রাসার হেড মাওলানা পদে আসীন ছিলেন।"*

জঘন্য মিথ্যাচার। ইতিহাস বিকৃতির নামান্তর। ঐ যে নাম বিভ্রাট। ভাবতে অবাক লাগে ফরিদপুরের মৌলভী আহমদ আলী প্রসঙ্গে। সুরেশ্বরের বেশরা পীর সাহেব ও একই কথা লিখেছেন, হযরত ওয়সী রহমাতুল্লাহ জীবন ইতিহাস পুস্তকেও অনুরূপ কথা লেখা আছে।

প্রচলিত কথায় আছে না, হরিণ বাঘের ভয়ে লুকায়, ঝোপ জঙ্গলে নিজের মাথা টুকু লুকিয়ে মনে করে কেউ দেখতে পাবে না, নিজের সব শরীর বাহিরে থাকে।

মাদ্রাসা আলীয়া একটি ঐতিহাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। জন্মলগ্ন থেকে রেকর্ড মৌজুদ। মাওলানা আব্দুস সাত্তার সাহেবের গবেষণা লব্ধ পুস্তক 'তারিখে মাদ্রাসা আলীয়া' (উর্দ্দু) ১৭৮১-১৯৫৯) পর্যন্ত প্রিন্সিপাল ও হেড মাওলানা দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিদের নাম এবং কার্য্যকাল ও উল্লেখিত হয়েছে। তথায় ১৮৯২ -১৯১২ সাল পর্যন্ত হেড মাওলানার নাম 'হযরত মাওলানা আহমদ' উল্লেখ আছে। ডঃ মুজিবর রহমান সাহেব লেখেন-তার পিতা মাওলানা ওয়াজিহ (১৮০৩-১৮৬৪) বিহারী। শামসুল উলামা মাওলানা আহমদ বিহারী তার পিতাও মাদ্রাসা আলীয়ায় কর্মরত ছিলেন।

সুরেশ্বরীর আহমদ আলী সাহেব ঐ সময় হেড মাওলানা ছিলেন। বন্ধুবর চৌধুরী সাহেব প্রমাণ করতে পারবেন কি?

ভণ্ড পীর ফকিরদের এমন সব আজগুবী কাজ করিবার। হরিণের মত লুকিয়েছে, মনে করে কেউ দেখতে পাবে না। বসিহাটের সুবিখ্যাত পীর আল্লামা মুফতী মোহাম্মদ রুহুল আমীন রহমাতুল্লাহ, ফুরফুরা শরীফের সুবিখ্যাত পীর আল্লামা মুফতী আবু জাফর সিদ্দিকী প্রমুখ হযরতেরা ছিলেন শামসুলউলামা মাওলানা আহমদ রহমাতুল্লাহ এর ছাত্র। সুরেশ্বরের মৌলভী আহমদ আলী সম্বন্ধে হযরত পীর কেবলার বিস্তারিত জীবনী পুস্তকে তাকে বেদাতী দল ভূক্ত বলেছেন।

বাংলাদেশের অধুনা শরিয়ত পুর জেলার সুরেশ্বরের জান শরীফ ওরফে বাবা আহমদ আলী সাহেবের পিতার নাম মৌলভী মেহেরউল্লাহ। নাম ভিন্ন, পিতার নাম ভিন্ন, স্থান ভিন্ন। কিন্তু কর্মস্থল এক, পদ এক, প্রতিষ্ঠান এক, কার্য্যকাল এক।

শামসুলউলামা, মাওলানা আহমদ, পিতার নাম মাওলানা ওয়াজিহ। মাওলানা আহমদ আলী, পিতা মৌলভী মেহেরউল্লাহ। একজন বিহারী, অন্যজন বাঙ্গালী। একেই বলে পুকুর চুরি।

আরও প্রনিধান যোগ্য যে সুরেশ্বরের আহমদ আলীর তো তাঁর পিতৃ দত্ত নাম নয়। তার পিতা নাম রেখেছিল 'জান শরীফ'।

লাতায়েফে শাফিয়াহ পুস্তকটি মৌলভী আহমদ আলী সুরেশ্বরীর লেখা। তিনি উক্ত পুস্তকের ৭ পৃষ্ঠায় হযরত সূফী ফতেহ আলী ওয়সী রহমাতুল্লাহ এর কথা উল্লেখ করে বলেন—

"বেলায়েতে পরিপূর্ণ করে কুতুবুল ইরশাদের মর্তবা দান করে বললেন, বাবা জান শরীফ আজ থেকে তোমার নাম রাখলাম আহমদ আলী। কেননা আল্লাহপাক তোমাকে এ নাম প্রদান করেছেন। তাই আমি এই নামেই তোমাকে সম্বোধন করব।" প্রগুক্ত-৭পৃষ্ঠা।

মৌলভী মেহেরউল্লাহ রহমাতুল্লাহ দুই পুত্র সন্তান। তিনি সন্তানের নাম রাখেন- জান শরীফ ও প্রাণ শরীফ। জন্ম থেকে বিদ্যালয়ে। সমাজে সবার কাছে বাপ মায়ের দেওয়া 'জান শরীফ' নামেই পরিচিত হওয়া স্বাভাবিক। বর্ণনা ক্রমে তার 'আহমদ আলী' 'নামের জন্ম' তার পীর হযরত সাইয়্যেদ

ফতেহ আলী ওয়সী রহমাতুল্লাহ এর মুখ থেকে, শেষ বয়সেই হবে।

ইতিপূর্বে তিনি তো কোলকাতা মাদ্রাসা আলীয়ায় ভর্ত্তি হয়ে পড়াশুনা করেছেন (শানে ওয়াইসী-১১২ পৃষ্ঠা) বস্তুত, তিনি ও মাদ্রাসার ছাত্র হিসাবে পিতৃ দত্ত নাম জান শরীফ নামে। কাজেই জান শরীফ নামের ছাত্রই পাশ করেছে। কাজে কাজেই যদি তিনি মাদ্রাসার শিক্ষকতা করেন, কিম্বা হেড মাওলানা হন, তা হলেও তো 'জান শরীফ' নামেই হবেন।

পীরের দেওয়া আহমদ আলী নামে কোন সনদ বা সার্টিফিকেট থাকতেই পারে না। থাকবেতো জান শরীফ নামে। তা হলে আহমদ আলী নামে ২০ বছর হেড মাওলানা পদে থাকতেই পারে না। জান শরীফ নামে হলেও তো সম্ভব হতো। কিন্তু সেখানেও বাদ সেধেছে কার্য্যকাল-১৮৯২-১৯১২ এ সময় যে হযরত শামসুলউলামা আহমদ সাহেবের কার্য্যকাল। জান শরীফের জালিয়াতি জাহির হতে আরও কিছু বাকী আছে কি?

চৌধুরী সাহেবকে নিয়ে করুণা হয়। শানে ওয়াইসীর গ্রন্থকার তথা কথিতদের পাল্লায় পড়ে নিজের বিবেককে বিসর্জন দিয়েছেন। হাদিস পাকে এসেছে যারা বেদাতীদের প্রচ্ছয় দিল, দ্বীন ধ্বংসের মুলে তাহারাই। শুধু তাই নয়— শোনা কথাকে যাচাই না করে বলাও মিথ্যার নামান্তর।

'লাতায়েফে শাফিয়াহ'— *

"হযরত সুরেশ্বরী কিবলা রহমাতুল্লাহ 'দ্বায়রায়ে আহমদিয়া নামে একটি দ্বায়েরা শরীফ স্থাপন করেছেন। এ দ্বায়েরা শরীফের অভ্যান্তরে একটি কোঠায় পাঁচটি আসন সংরক্ষিত আছে। প্রাগুক্ত-৯ পৃষ্ঠা।

হযরত সুরেশ্বরী কিবলা বাংলা এবং উর্দ্দু ভাষায় বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বাবা সুরেশ্বরী কিবলা প্রায় রাতের অন্ধকারে কোনরূপ বাতি ছাড়াই তার গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি লিখে যেতেন। কাগজের উপর কলম চালনার খশ খশ শব্দ শুনে অন্যেরা তা বুঝতে পারতেন।

প্রাগুক্ত-৯পৃষ্ঠা।

---

*'লাতাইফে শাফিয়াহ' হযরত মাওলানা জান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী (রাঃ) প্রণীত। প্রকাশক সাইয়্যেদ নূরে ইকবাল শাহ শরিফী আল সুরেশ্বরী। দরবারে সুলতানুল আওলীয়া সুরেশ্বর দায়েরা শরীফ। প্রকাশ- ২০মাঘ ১৪১৬ বাং। ফেব্রুয়ারী ২০১০ ইং।

আমাদের বক্তব্য এই যে তিনি বা তিনারা কে কি বুজর্গী জাহির করছেন করুন। হযরত সুফী ফতেহ আলী ওয়সী রহমাতুল্লাহ এর নাম ব্যবহার করে শরিয়ত বিরোধী কার্য্য কলাম কখনই সমর্থন যোগ্য নয়।

দায়েরা প্রদক্ষিণ করা, গায়েবী আশা প্রাপ্তি, হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী রহমাতুল্লাহ কে জঘণ্য ভাষায় আক্রমণ করা। পীরের কবরের মাটি নিয়ে নকল কবর করে তা প্রদক্ষিণ (তাওয়াফ) করা জনাব আহমাদুল ইসলাম চৌধুরী সাহেব সহ হাক্কানী পীর মাশায়েখগণ কি সমর্থন করতে পারেন? আমরা ফুরফুরা শরীফের সিলসিলার মানুষরা কখনই সমর্থণ করতে পারি না।

'লাতায়েফে শাফিয়াহ পুস্তকে সুরেশ্বরী মৌলভী আহমদ আলী সাহেব আরও লিখেছেন—

"১৯ শে মাঘ মাগরিবের নামাযের ঠিক পর পরই পাঁচটি পবিত্র গায়েবী 'আষা মোবারক বের করা হয়।

হযরত সুরেশ্বরী হযরত পাঁচটি পবিত্র গায়েবী আষা মোবারক তার মুর্শিদ কিবলার মাজার শরীফ থেকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। পাঁচটি আষা মোবারকের মধ্যে স্বর্ণমুকুট পরিশোধিত সর্ব বৃহৎ আষাটি বিশ্বনবী হযরত রাসুলে করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয়টি হযরত মুসা (আঃ) তৃতীয় আষা হযরত বড় পীর সাহেব (রহঃ) চতুর্থ আষাটি হযরত খাজা বাবা গরীব নেওয়াজ রহমাতুল্লাহ এবং পঞ্চম আষাটি হযরত মোজাদ্দেদ আলফে সানী রহমাতুল্লাহ তরফ থেকে পেয়েছিলেন। প্রাগুক্ত ৮।৯ পৃষ্ঠা।

ইতিপূর্বে বিনা সনদে এমন উদ্ভট দাবী কেউ করেছেন বলে জানা নেই। এমন ধোকা থেকে আল্লাহ সকলকে হেফাজত করুন।

ডঃ শেখ আহমদ আলী প্রণীত

হযরত ওয়সী (রাঃ) জীবন ইতিহাস

হযরত সূফী ওয়সী পীর রহমাতুল্লাহ এর জীবন চরিত সম্বন্ধে বিভ্রান্তির নেপথ্য খলনায়ক তথা কথিত এ গবেষক। হযরত ওয়সীর সূফী মতাদর্শকে সঠিক মূল্যায়ণ করতে অপরাগ হয়েছেন। **কুতবুল ইরসাদ রাসুলনোমা ও শাহসুফী** পদমর্যাদার অপব্যবহার করেছেন।

ডঃ আহমদ আলী কৃত হযরত ওয়সী (রাঃ) ইতিহাস পুস্তক পুস্তকটি ১৮পৃষ্ঠায় লেখেন, *তিনি পীর ভাই হযরত সুফী গোলাম কাদেরের অনুরোধে হাওড়া জেলার মুনশিরহাটের ধসা পানাউল্লাহ মাদ্রাসায় কিছু দিনের জন্য আধ্যাত্মিক বিষয়ক শিক্ষকতা করেন। তিনি হাদীস, ফেকা প্রভৃতি বিষয় ছাড়া অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থ শিক্ষা দিতেন।'*

পক্ষান্তরে -হযরত মাওলানা জয়নুল আবেদীন আখতারী কৃত হায়াতে ওয়সী গ্রন্থে লিখছেন "আরও অধিক জ্ঞান লাভের জন্য কোলকাতা আগমন করিয়া হুগলী জেলার দানবীর মোহাম্মদ মহসিন মাদ্রাসায় ও হাওড়া জেলার মুন্সির হাটের অন্তর্গত ধসা মাদ্রাসায় অধ্যায়ণ করিয়া প্রচুর জ্ঞানার্জন করেন।" হায়াতে ওয়সী ৩য় সংস্কর-১৪পৃষ্ঠা।

শিষ্য বলছেন — ধসা মাদ্রাসায় অধ্যাত্মিক বিষয়ক শিক্ষকতা করেন। পক্ষান্তরে গুরু বলছেন— ধসা মাদ্রাসায় পড়াশোনা করতেন।

ডঃ আহমদ আলী ওয়সী স্মরণীকায় লিখেছেন- *'হযরত ওয়সী পীর সালার (মুর্শিদাবাদ) ষ্টেশন থেকে আসার পথে হযরত মাওঃ আহমদ আলী সুরেশ্বরীর বুকে মাথা রেখে ইন্তেকাল করেন।'*

পক্ষান্তরে মাওঃ আখতারী সাহেব লিখছেন—

হযরত ওয়সী ফুরফুরার পীর কেবলার কোলে মাথা রেখে নসিবপুর ষ্টেশন (হুগলী জেলা) থেকে আসার পথে ইন্তেকাল করেন। হায়াতে ওয়সী -৬৪ পৃষ্ঠা।

তথা কথিত গবেষকের ভূয়া তথ্যের প্রমাণ মাওলানা জয়নুল আবেদীন আখতারীই যথেষ্ট।

শেখ আহমদ আলী লিখেছেন—

"হযরত সূফী ফতেহ আলী ওয়সী ওয়াকফ আইন করেছিলেন। টিপু সুলতান মসজিদের ওয়াকফ নামা তারই লেখা। কাজী আঈন তারই সময় হয়েছিল। আইন আকারে ওয়াকফ সম্পত্তি তিনি ও তাঁর বংশধররা ওয়াকফ করে গেছেন। তাঁর মাজার যেখানে আছে জায়গা ১৮৮৮ সালে ২২শে নভেম্বর তাঁর বংশের দলিল আছে। আরও অনেক দলিল আছে। কোলকাতা প্রিন্সেপ ষ্টেট দুটি মসজিদ ও পার্ক হযরত সূফী ফতেহ আলী ওয়সীর ওয়াকফ সম্পত্তি।

গোলতালবের পিছনে এমদাদ আলী ওয়াকফ ষ্ট্রীট মোক্কার আলী ওয়াকফ ষ্টেট হযরত সূফী ফতেহ আলী (রহ) এর দান।

হাওড়া মুন্সীরহাট ধসা, ফুরফুরায় বহু সম্পত্তি সূফী ফতেহ আলী ওয়সীর বংশের ওয়াকফ সম্পত্তি আছে। মুর্শিদাবাদ, পুনাশী, শাহপুর, নদীয়া, ২৪পরগণা, হুগলী মেদেনীপুর, কোলকাতায় তো বহু সম্পত্তি আছে।"— জীবন ইতিহাস-২।১৪পৃষ্ঠা।

"তাপসী হুসনেআরা বিভক্ত ভারতবর্ষের একমাত্র উত্তরাধিকারী। ইনি আমাদের সালার কোর্ট থেকে কোলকাতা মানিকতলার ২৪।১, মুনশীপাড়া লেন, দরবার শরীফের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ সহ সংলগ্ন পাঁচটি জেলার বহু সম্পত্তি দেখভাল করার জন্য পাওয়ার অফ এটর্নী দলিল করে দিয়েছেন মুর্শিদাবাদ সালার কোর্ট থেকে। প্রাগুক্ত দ্বিতীয় খণ্ড-৯৭ পৃষ্ঠা।

ডঃ আহমদ আলী গবেষণায় বিষয় সম্পদের ভূয়া ফিরিস্তি দিয়ে কী সূফী ওয়সীর চরিত্র মহিমার বিকাশ হলো? আশ্চার্য্য ব্যাপার ২০১৩ সালে পাওয়ার অফ এটর্নী পেয়ে এতদিনে এক ছটাকও সম্পত্তি উর্দ্ধার হলো না। উর্দ্ধার তো দূরের কথা, কোথায় কোন মৌজার কত খতিয়ানে কোন কোন দাগে কত সম্পত্তি তারও হদিস দিতে পারেনি। এমন কি খোদ মানিকতলার মুনশী পাড়া লেন মাজার শরীফ থেকেও উধাও। সূফী ওয়সী রহমাতুল্লাহ কি সারাজীবন ধন, সম্পত্তি বিষয় বৈভব করেই কাটিয়ে গেছেন? সূফী আদর্শের বিপরীত কি না?

সেখ আহমদ আলীর ঐ পর অবান্তর ও অবাস্তব লেখার জবাব জনাব চৌধুরী সাহেবের পুস্তক থেকে দিচ্ছে।

শানে ওয়াইসী ৬৭ পৃষ্ঠায় জনাব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী লিখেছেন— "তিনি তাঁর বেতনের উপর্জিত টাকার অধিকাংশ মানুষকে খাওয়ানা সহ পরোপকারে ব্যয় করতেন।"

"তাঁর কাছে যে হারে গরীব দরিদ্রের পাশাপাশি ধনী, নবাব, বড় বড় ব্যবসায়ীরা ছোহবত রাখতেন, সে হারে তিনি ইচ্ছা করলে যথেষ্ট অর্থ সম্পদের অধিকারী হতে পারতেন, কিন্তু এই দুনিয়া বিমুখ মহান আল্লাহর ওলী ও আশেকে রসুল দুনিয়াবী লোভ লালসা, ধন সম্পদের প্রতি আকর্ষণকে পদদলিত করে গেছেন।" শানে ওয়াইসী -৭১ পৃষ্ঠা।

"তিনি ইচ্ছা করলে কোলকাতা নগরীতে বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ করতে পারতেন, কিন্তু তা তিনি করেননি। তিনি দুনিয়াতে কোন সহায় সম্পদ রেখে যাননি। শুধুমাত্র পূণ্যবতী স্ত্রীর পৈতৃক সহায়তায় মুর্শিদাবাদের পুনাশিতে ছোট্ট একটি বাড়ী। একটি পুকুর ও এক খণ্ড জমি বাদে। ঐ সব কিছু তাঁর স্ত্রীর পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত বলা চলে।" শানে ওয়াইসী-৭২পৃষ্ঠা।

"চাকুরী করে অগাধ অর্থ উপার্জন করেও দুনিয়ার বুকে বিশেষ কিছুই সম্পত্তি রেখে যাননি। কলকাতার বুকে একটি সম্পত্তি ও খরিদ করেননি। শানে ওয়াইসী-৭৯।৮০ পৃষ্ঠা।

আমি রহমানী সীরাতে ওয়সী গ্রন্থে হযরত সূফী ফতেহ আলী ওয়সী রহমাতুল্লাহ সূফী চরিত্রের উল্লেখিত চিত্র অঙ্কন করার প্রয়াস পেয়েছি।

ডঃ আহমদ আলী ঐ ধন সম্পত্তির লম্বা ফিরিস্তি বাহুল্য। বস্তুর সারশূন্য ছাড়া কি আর বলবেন? সূধী সমাজ তাকে কি বলবেন? পক্ষান্তরে শানে ওয়াইসীর চৌধুরীর সাহেবকে সাধুবাদ জানাই। সূফী চরিত্রের এ মহান শান টুকু জানানোর জন্য।

সূফী সম্প্রদায়ের চরিত্র, নির্মল, সচ্ছ (সুফী সাফা) দুনিয়া বিমুখ আখেরাত মুখী, নির্লোভ, দয়ার্দহৃদয়। তারাই শিখেয়েছেন আমাদেরকে ইয়া রব্বি আন্‌তা মক্‌সুদী, তরাকতুদ্দুনিয়া অল আখেরাতে লাক, অতমিম্ আলাইয়া নিয়মাতাকা অরযুকনী অসুলাকাত্তাম্মাহ।

"সিপাহী বিদ্রোহের মূল রূপকার লণ্ডনে গোল টেবিল মিটিংএ দেশের অত্যাচারিত বৃটিশ রাজশক্তি দেশের মানুষের কাছে যে ওয়াদা করেছিল তা না মানার জন্য নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের প্রেরিত দলের মূল নেতৃত্ব হিসাবে লণ্ডনে গোল টেবিলে অংশ গ্রহণ।"

-হযরত ওয়সীর জীবন ইতিহাস-২।১৩ পৃষ্ঠা।

এমন উদ্ভট কাল্পনিক কত কথা যে বিনা প্রমাণে সেখ আহমদ আলী ওয়সী পীরের জীবনীতে লিখেছেন, তার ইয়াত্তা নেই। লণ্ডনের দুটি গোল টেবিলে মিটিং সন তারিখ হযরত ওয়সী পীরের জীবন সনের মধ্যেই মিলে না।

ওয়ায়েন হেসটিংস এর সময় কাল-১৭৭২-১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দ।

লণ্ডনে গোলটেবিলে ১৯৩০, ১৯৩১, ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ। আর হযরত সূফী ফতেহ আলী ওয়সী রহমাতুল্লাহ সময়কাল ১৮২৫-১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। এবার সূধী

মণ্ডলী মূল্যায়ণ করুন, হযরত সূফী ওয়সী রহমাতুল্লাহ উল্লিখিত ঘটনার কতখানী সম্পৃক্ত ছিলেন? আদৌ নয়।

উপসংহার ঃ-

বই পুস্তক লিখতে গেলে তথ্যগত বা ঐতিহাসিক ঘটনাবলী উল্লেখের সময় সন-তারিখ ও সমকালীন বিশ্বস্থ পত্র-পত্রিকা এবং পুস্তকের রেফারেন্স অবশ্যই আবশ্যক। **জানা যায়, শোনা যায়, মনে হয় প্রভৃতি শব্দ দিয়ে স্থীর সিদ্ধান্তে আসা যায় না। আর তাকে গবেষক বলা যায় না।**

অধিকাংশ পীর ওলিদের জীবনী পুস্তকে একটু বাড়াবাড়ি নজরে পড়ে, কিন্তু অতি বাড়াবাড়ি কখনই বাঞ্চনীয় নয়। অতিরঞ্জিত কিছু লিখলে সম্মানের থেকে অসম্মানই হয়ে থাকে বেশী।

বাংলা আসামের মুসলিম জনসাধারণ ও বুদ্ধিজীবি মানুষেরা ভালোভাবেই জানেন যে হযরত কুতবুল ইরশাদ, রাসুল নোমাপীর, সুফী সাইয়্যেদ ফতেহ আলী ওয়সী রহমাতুল্লাহ এর খ্যতনামা খলীফা শাহসূফী পীর আবুবকর সিদ্দিকী রহমাতুল্লাহ ছিলেন আমিরুশ শরিয়ত মোজাদ্দেদে যামান পদমর্যাদার বুযর্গ।

সেই মাহন বুযর্গ সম্বন্ধে ড. সেখ আহমদ আলী সম্পাদিত পত্রিকায় লিখেছেন— "ওয়সী পীরের মাজার শরীফ ফুরফুরার পীর আবু বাকার ঢোল বাজাচ্ছেন।" (ভক্তের স্বপ্ন বর্ণনা এমনি বহু শরিয়ত বিরোধী লেখা কি সিলসিলার কোন জ্ঞানী মানুষ মানতে পারে?

আমরা সেই আমিরুশ শরিয়তের দৃষ্টিতে ওয়সী জীবন চরিত পর্য্যালোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি, এতে যদি কারও মনে ব্যাথা লাগে কিঞ্চিৎ, নাচার। আমরা দুনিয়ার তামাম হক সিলসিলাকে সম্মান করি কিন্তু বিদয়াতী বেশরা, ভণ্ড মুখোশধারীদের মুখোশ উন্মোচন করা দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে করি।

সম্মানীত পাঠক-পাঠিকা মুক্ত মনে সীরাতে ওয়সী পাঠ করলেই আমাদের স্বদ্বইচ্ছার পরিচয় পাবেন ইনশা আল্লাহ। আহ্নকার—রহমানী।

।। তাম্মাতবিল খাইর।।